Orient Binding Works
BINDERS AND PRINTERS
100 BAITAKHANA RD.
CALCUTTA—9

কবিতা

★

সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসু

★

একাদশ বর্ষ

আশ্বিন ১৩৫২—আষাঢ় ১৩৫৩

বার্ষিক সূচীপত্র

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

অন্নদাশঙ্কর রায়
আর্টের মূল্য (প্রবন্ধ) ৫২
মুখ্য আর গৌণ („) ১১১

অবন্তী সান্যাল
সঞ্চারী ৭৯

অমল চট্টোপাধ্যায়
একটি কালো মেঘের স্মরণে ৭৬

অমলেন্দু বসু
সমালোচনা ৫৭

অমিতা দেবী
পয়লা বৈশাখ ২৭

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হুয়াই-নানের নর্তকী (অনুবাদ) ৩৯
করোটি („) ৮৩
নিরাশাবাদী („) ২৪৩

অমিয় চক্রবর্তী
শেষের কবিতা'র লাবণ্য (প্রবন্ধ) ২০৭
দুই তীর ২২০

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
বিরহ ১৯৪

অরুণকুমার সরকার
ভ্রমর ৮০

অরুণাচল বসু
উপাখ্যান ২৩০

অশনি গুপ্ত
স্মারক ৩৮

আদিত্য ওহদেদার
রহস্য ৭৮
ডেলি প্যাসেঞ্জার ১৯০

আরতি রায়
মিস মিত্র ১৭
আক্ষেপ ১৮
বসুধা ২৪৭

আলেক্স আরনসন
পল ভালেরি (প্রবন্ধ) ৯৯

আহসান হাবীব
কাশ্মিরী মেয়েটি ৮

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কোনো নির্জন মুহূর্তে ৮২

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
বসন্তের একটি দিন ৩৯
দ্বিতীয় প্রকৃতি ৮৭

জগন্নাথ চক্রবর্তী
একদা তুমি প্রিয়ে ১৯৬
সেদিন ও এদিন ১৯৭

জগন্নাথ বিশ্বাস
বাঁক ১৯২

জীবনানন্দ দাশ
মকরসংক্রান্তির রাতে ১১

জ্যোতির্মালা দেবী
সাবিত্রী ৩৩
স্ফটিক মৃণাল ৮৮

নরেশ গুহ
সমালোচনা ২০৫, ২৬৩
প্রার্থনা ২২৬

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
প্রথম প্রেমের কবিতা ২৪৪

পরিমল রায়
সমালোচনা ২৬১

প্রভাকর সেন
সনেট ১৯১

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
চক্রবাক ২৪১

বরুণ দেব
একটি হারানো ছবি ২৪৯

বিকাশ দাশ
পুনর্জন্ম ৬৯

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
নীল চোখ ২৪৮

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
অপ্রস্তুত ১৬
অবতামসী, আবার রাত্রি ২৫০

বিষ্ণু দে
আইসায়ার খেদ ৪

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখী ২৮

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রেম-পাথর ২৩৬

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খোয়াই ৭৫
অসিতপর্ণা ২২৮

বীরেন্দ্র মল্লিক
ভোরে ৩৬

বুদ্ধদেব বসু
ব্যর্থ ১৩
দুই পূর্ণিমা ৯১
কার্তিকের কবিতা ৯৪
শীতসন্ধ্যার গান ৯৮
প্রৌঢ় প্রেম ১৮৬
ফাল্গুনের গুঞ্জন ১৮৯
'শেষের কবিতা'র লাবণ্য (প্রবন্ধ) ২১৫
প্রতিবিম্ব ২৫৩
বৈশাখী পূর্ণিমা ২৫৭

বু. ব.
সমালোচনা ২৫৮

মণীন্দ্র রায়
সন্ধ্যা ২০

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী
নির্ভয় ২৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পত্রগুচ্ছ ১
কথিকা ১৩৭

লীলাময় রায়
সাত ভাই চম্পা ৬
মরা হাতী লাখ টাকা ৮১

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অকাল-বর্ষা ২১

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়
পরিচয় ৭৭
আশা ২৩৩

সত্যশান্তি ঘোষাল
জীবনায়ন ২৫

সত্যেন্দ্র সরকার
ভীরু ২৪২

সম্পাদক
দেমেত্রিয়স কাপেতানাকিস (প্রবন্ধ) ৪২
এলিঅট ও কিপলিং („) ৪৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা („) ১০৪
রবীন্দ্রনাথের ছোটো কবিতা („) ১১৬
বাংলা ছন্দ („) ১৩৯
গেব্রিএলা মিস্ত্রাল („) ১৯৮
নবীনচন্দ্র সেন („) ২০৮
সমালোচনা ৫৮, ১২৯
সম্পাদকীয় ৬১, ১৩৫
এডওঅর্ড টমসন (প্রবন্ধ) ২৭০

সলিল আচার্য
কোনো সৈনিককে ২৩৪

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
অভাগ্য ২৯

সিদ্ধেশ্বর সেন
অনুরণন ১০

সুকান্ত ভট্টাচার্য
ব্যর্থতা ২৩১

সুধাংশু রায়
প্রশ্ন ২৩৫

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
শাশ্বত পুরুষ নারী ৬৩

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভুল ২৩৭
পৃথিবীকে ২৩৮

হরিধন বসু
শকুন্তলার মৃত্যু ৭২

হেমচন্দ্র বাগচী
মনগহনী ২২২

কবিতা

একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] আশ্বিন, ১৩৫২ [ক্রমিক সংখ্যা ৪১

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

৫৯

আমার তহবিল প্রায় খালি হ'য়ে এসেছে আবার ভর্তি করবার মতো শরীরের অবস্থা আমার নয়। একটা ছোটো কবিতা অগোচরে ছিল সেটা তোমাকে পাঠাই।

কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণত বাংলা কাগজে সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয়—তোমার লেখার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না। তোমার প্রবন্ধে আমার প্রশংসার কথা পেলুম সেটা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে উপভোগের বিষয়। কিন্তু এর মূল্য হচ্ছে তোমার রচনার মূল্যে। নিশিকান্ত ও অমিয়র কবিতার যে ব্যাখ্যা করেছ সে বিশেষ উপাদেয় হয়েছে। একটা খবর তোমার জানা দরকার, বিচিত্রায় টুকরি বলে যে সব টুকরো বেরিয়েছিল অল্প কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলোই আমার লেখা। নিশিকান্তর লেখাকে অন্যায় করে আমি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলুম। বোধ হয় সেই জন্যেই ওগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। আমাদের যুগল নামে বের করলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না। সাহিত্যে মাঝে মাঝে এ-রকম রচনাসমবায় ঘটেছে। ইতি ২২।৩।৪০

৫২

টুকরি সম্বন্ধে তোমাকে লেখবার পরে আমার সন্দেহ উপস্থিত হোলো। কেননা জরাগ্রস্ত মনের স্মৃতিবিভ্রমে তথ্য হয়ে ওঠে মরীচিকা, ধারণার যাথার্থ্য থাকে না। পুরোনো খাতাপত্র খুলে দেখলুম, টুকরির লেখার মধ্যে আমার নিজের রচনা অল্প দু' চারটে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু তাদের বিশেষ মূল্য নেই। নিশিকান্তর লেখাগুলো আমি নির্দয়ভাবে সংশোধন করেছিলুম—একেবারেই ভালো করিনি। সেগুলি তার মূলের বিশুদ্ধ মূল্যেই রক্ষণীয়। তোমাকে ভুল বলেছিলাম বলেই এ চিঠিখানা আবার লিখতে হোলো।

"কবিতা"য় প্রকাশিত আমার কবিতাটির মধ্যে একটি ছাপার ভুল প্রবেশ করেছে—"পরুষ" শব্দ রূপান্তরিত হয়েছে "পুরুষ" শব্দে। দুইয়ের মধ্যে সাধারণত অদলবদল চলতে পারে, কিন্তু সর্বত্র নয়। ইতি ২৮।৩।৪০

৫৩

Gouripur Lodge
KALIMPONG

তোমাদের কবিতায় চোখের বালির সমালোচনার শেষ অংশে যে মন্তব্য দিয়েছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। মাসিক পত্রে অনেক সময়ে লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সস্তা দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক আসে। এই দুষ্কর্ম করেছি, কিন্তু তাতে ফল পাইনি, পাঠকরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল। এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। কামাক্ষীর শেষ বইটা[তে] দুঃসাধ্য রকমের দুর্বোধ দেখে তার লেখা সম্বন্ধে প্রশংসা প্রত্যাহরণ করেছিলুম কিন্তু তারপরে মাসিক পত্রে তার কয়েকটি লেখা পড়ে দেখলুম সে সরল, আধুনিকতার ফ্যাশন প্রবেশ করে তাদের

অস্বাভাবিক রকমের মোচড় দেয় নি, তাদের টেরা চোখে দেখতে হয় নি, আমার মতো তিনকুল খোওয়ানো মানুষকেও কবুল করতে হোলো ভালো লেগেছে—এ কথা শুনলে নতুন বাজারে তার লেখার দর কমে যাবার আশঙ্কা আছে তা হোক তবু বিদঘুটে মালের খদ্দেরের ফরমাসে সে আপন সহজ শক্তিকে খোওয়ায় না যেন, সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। একটা জিনিষ দেখে খুশি হলুম, যদিও তুমি মাস্টারি করচ তবু তোমার লেখায় পাণ্ডিতি ঢুকে তাকে ক্লাস পড়ানোর তলায় কাৎ করে ফেলে নি। ইতি ২৪শে জুন, ১৯৪০

আইসায়ার খেদ

বিষ্ণু দে

And he looked for judgment, but behold oppression,
For righteousness, but behold a cry.

বয়েস হয়েছে ঢের, পেনসনই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি‚সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিই নি, সান্ত্বনা তাতে যে টুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন্ নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠ্‌তি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করি নি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে' ফেলি নিকো থিয়েটারী লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহী বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন্ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ।

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে' একান্ত অসহ
যোগের সে আন্দোলনে হাঁকিমের রূঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে' পথ চলি, চৌরঙ্গীর ফুরাল সম্মোহ।

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল পেন্‌সনের ঘর।
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম ? বাংলার গ্রাম ও সহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!

কি জানি, বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোটজন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবী পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে ; দেখি নয়নে ভাস্কর
তার নীল নদী বয় দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

সাত ভাই চম্পা

লীলাময় রায়

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক

চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাসগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী।
গবরমেণ্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব
এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন "যাও সাহেব।"
জেলখানাতে বন্দী এঁরা, এঁরাই আবার মিনিস্টর
ফাঁসিকাঠে এঁরাই ঝোলেন, এঁরাই নাকি গুপ্তচর।

সি এফ এফ চ্যাটারজী
এম এম এম মুকারজী······
জমিদারের পিসতুতো ভাই মহাজনের মাসতুতো
এঁরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতো।
মিল মালিকের প্রিয় শ্যালক মজুমদারের ভগ্নীপৎ
মজুর দলে এঁরাই আবার রক্তরাঙা অগ্নিবৎ।

চটি ফট ফট চটরস্কী
মুখ মক মক মুখরস্কী······
চোরা বাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এঁরাই তবু সম্পাদকী কাঁদুনী গান "হায় রে হায়।"
এঁরাই নীলাম করেন জমি, এঁরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা—গোরু মেরে জুতো দান।

চটি ফট ফট চাটুয্যে
মুখ মক মক মুখুয্যে······
থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরই পরের দিন
কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের সেই লেনিন।
বর্তে যদি থাকতে পারো মর্ত্যে আরো কয়েক দিন
দেখবে তেনার জামাই দুটি কোলচাক আর ডেনিকিন।

চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী······

কাশ্মিরী মেয়েটি

আহসান হাবীব

কাশ্মিরী মেয়েটির কালো কালো চোখ।
ফরিদের ছোটো ছেলে সে-চোখের কিছুটা আলোক
চেয়েছিলো।

সাহস অসীম নয়
কেননা মেয়ের
অবিরাম হাত পাতা আঁখিজল ঢের
দেখেছে সে,
এমন কি মাঝে মাঝে দু-একটা ফুটো তামা
সেই হাতে রেখেছে সে।

কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরাটি লাল,
কাশ্মিরী মেয়েটির তনু গোলগাল।
ফরিদের ছোটো ছেলে নাম আমজাদ
তার ছিলো সাধ
খেলবে ম্যাজিক সেই ঘাগরাটি নিয়ে,
কাশ্মিরী মেয়েটিকে
পুরো এক পয়সার সিগারেট দিয়ে।

কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দুটি সাপের মতন,
কাশ্মিরী মেয়েটির দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো :
নখে তার বিষ—
মুখে বুলি নরম নরম :
বেইমান কুত্তা হায় তোম্‌!

কাশ্মিরী মেয়েটির নাজেহাল হাল।

পথের মোটর এক হোলো বানচাল।
ফিরে গেলো দিন
কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরা বিলীন,
হাসে তার চোখ

আমজাদ চেয়েছিলো কিছুটা আলোক।

অনুরণন

সিদ্ধেশ্বর সেন

আর ত কিছুই কিছুই কিছু নয় ;
জাদুকরী রঙের আকাশে ;
স্মরণের সায়াহ্নবেলায়,
ক্ষণেক সুরের রেশ ভাসে :

হরিণী-হাওয়ার মত তুমি,
চকিত চোখের ছায়া মেলে,
কাঁদায়ে মনের বনভূমি,
ঘুমের মেঘের মেয়ে এলে !

কখন আমার ভীরু সুরে,
তোমার আবেশ যায় ছুঁয়ে,
জীবনের প্রখর রোদ্দুরে
নীলাভ স্বপন পড়ে নুয়ে ;

নিবিড় নিমেষ কেঁপে-কেঁপে
প্রথম প্রেমের কথা কয় ;
আমার সকল আশা ব্যেপে
কী যেন বিধুর মনে হয় ;

আর ত কিছুই কিছু নয় !

মকরসংক্রান্তির রাতে

জীবনানন্দ দাশ

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মত যেন)

কে পাখি সূর্য্যের থেকে সূর্য্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড় বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কি এক গভীর সুসময় !
মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
পৃথিবীর—তবুও তা' পৃথিবীর নয় ;
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
পৃথিবীর, তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্ত্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন ;
ঘুম ভালো,—মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি ? বিচূর্ণ কি ? বিজয়ী কি ? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ ক'রে তবু
রাতের স্বাদের মত সপ্রতিভ ব'লে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে।

মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।
তেমনই জীবনপথে চ'লে যেতে হ'লে তবে আর
দ্বিধা নেই ;—পৃথিবী ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায় ;
পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মত এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লী কলকাতার নক্টার্নে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে যাবে না কি !—
সূর্য্যে আরো নব সূর্য্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

ব্যর্থ

বুদ্ধদেব বসু

আঁকিয়া দিলো রবির কর
মেঘের চেরা সিঁথি,
দেখিয়া মনে পড়িলো যেন
পুরোনো কোন স্মৃতি।
এমনি এক মেঘেলা দিন
সংসারের শাসনহীন,
ভবিষ্যৎ দেখা না যায়,
অতীত হ'লো হারা।
পড়িলো সাড়া পরানে-মনে ;
দুয়ারে দিনু নাড়া।

সেদিন মেঘে সোনার পাড়
রৌদ্র ভিজে-ভিজে,
গাছের প্রাণ মর্মরিয়া
কহিছে কথা কী-যে।
দুপুরে যেন বিকেল, আর
বিকেল হ'লো অন্ধকার,
সন্ধ্যাকাশে উচ্চ হাসে
সূর্য পেলো ছাড়া।
বিপুল ডাকে কাঁপিলো বুক ;
দুয়ারে দিনু নাড়া।

পরশময় অ-সম হাওয়া
মানে না দিক তিথি,
বেড়ায় বহি' বর্ষণের
চুম্বনের স্মৃতি।
আকাশে তারি স্বৈরাচার ;
কখনো ঘন মেঘের ভার,
আলোর বাঘ কখনো ছায়া-
হরিণে করে তাড়া।
আশার রথ রচিলো পথ ;
দুয়ারে দিনু নাড়া।

স্বর্গে আর মর্ত্যে যেন
বাঁধিয়া দিলো সেতু,
অচির-পরিবর্তনের
মত্ততার কেতু।
আলো-ছায়ার খেলার ঘরে
হঠাৎ ঝড় ঝাঁপায়ে পড়ে,
বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের খাঁড়া।
মুষলধারে সাহস এলো,
দুয়ারে দিনু নাড়া।

উঠিলো কেঁপে রুদ্ধ দ্বার
স্বপনে আনমনা,
মেঘের মৃদু মাদলে গেলো
প্রতিধ্বনি শোনা।
জোনাকিগুলি প্রহর জ্বালে
তন্দ্রা-ভরা ঝিল্লি-তালে,
মন্ত্র-পড়া অন্তরালে
নাহিকো কারো সাড়া।
আনতশিরে আসিনু ফিরে
দুয়ারে দিয়ে নাড়া।

অগ্রসৃত

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক অনেক দিন আগে, (আমায় বিশ্বাস যদি করো)
অনেক অনেক দিন আগে
ভবিষ্যের ভ্রূণ এক প্রতীক্ষা-প্রখর চোখে জাগে।
যে দিন আসে নি, তবু
নিশ্চিত আসিবে কভু
সরাসরি সম্মুখের ভাগে—
এখনো অনেক দিন আগে—

এখনো অনেক বাকি পথ—
যেথায় ঘর্ঘরে চক্র জীবনের তুঙ্গ মহারথ
বিচূর্ণিতে জরার দ্বৈরথ।
জীবনের স্তব যেথা শোনো নি তা'—সেই মহাগীত—
অধুনা-তিমির-তীরে আলোকের মধু মাঙ্গলিক!
বহু—বহু দূর সেই পথ,
আজও যেথা মৃত্যু-কাপালিক
শোনায় নি শূন্যগর্ভ শেষের শপথ।
সেই অতো—অতো পথ আগে
নতুন প্রাণের নটরাজ
নাচে নটনারায়ণ রাগে।
অনাচ্ছন্ত সেই মহাগান
গমকে গমকে গুরু প্রতিধ্বনিমান
মীড়ে মীড়ে নীড় মাগে তোমাদের কানের কুহরে—
কবি আমি শুনেছি সে গান, দেখো মোর শরীর শিহরে।

মিস মিত্র

আরতি রায়

আকাশে মেঘ নেই
পরিষ্কার নীল আকাশ হতে পারত
যদি মহানগরীর আকাশ না হোত।
কলের জলের শব্দ আসছে একটানা—
পাশের বাড়ির চৌবাচ্চা ভর্ত্তি হচ্ছে।
ঘর থেকে বেরিয়ে এল,
গোরোচনা গোরীই বটে—
তবে এ নামে তাকে সম্বোধন এখন করা হয় না,
কলেজে সবাই বলে মিস মিত্র।
ধুচুনিতে ক'রে চাল ধুয়ে নিয়ে আবার চ'লে গেল,
পায়ে নূপুরের শব্দ বেজে উঠল না,
কক্ষে ঘটও নেই।
কোথায় যমুনা ? এ তো পল্লীর পুকুরও নয়,
দৈর্ঘ্যে প্রস্থ্যে চার হাত চৌবাচ্চা
তারই পাশে দাঁড়িয়ে চাল ধুয়ে নিয়ে গেল
স্কটিশের দ্বিতীয় বার্ষিকের মিস মিত্র।
কিন্তু বারে বারে আমার মনে পড়ছে শুধু
বৈষ্ণব কবিতার ক'টা লাইন—
সজনী ও ধনী কি চাহ বাটে
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
বারে বারে মনে পড়ছে
ভালো গানের শেষ রেশটুকুর মত
কানের কাছে গুঞ্জন ক'রে ফিরছে
শুধু ওই ক'টা লাইন—
হৃদয় হারাইনি যদিও।

আক্ষেপ

আরতি রায়

ছবি আঁকতে শিখিনি
সময় বা সুযোগ হ'লে পারতুম কিনা
সে কথা অবান্তর।
তবু ছবি যে আঁকতে শিখিনি
সে কথাটা মনে হল আজই প্রথম।

পিতৃব্যের কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলাম
স্বর্গত পিতার গচ্ছিত ধন।
পিতৃব্য অমায়িক মানুষ,
দশজনে চেনে তাঁকে, মান্য করে,
অর্থের অভাব ব্যর্থ করেনি জীবন,
অত্যন্ত প্রাচুর্য অনর্থ ঘটায়নি,
যে-কোনো অর্থেই তাঁর জীবন সার্থক।
টাকা চাইলাম,
তৎক্ষণাৎ বের ক'রে দিলেন
কুশলপ্রশ্নও করলেন হাসিমুখে—
তবু ছবি আঁকতে শিখিনি।

এ কথা মনে হ'ল
সেই এক মুহূর্তের জন্য,
যে-মুহূর্তে
আমার কণ্ঠ থেকে
টাকার প্রার্থনা উৎসারিত হোল
সেই এক মুহূর্তের
বিক্ষুব্ধ বক্র দৃষ্টি

সংকোচনোন্মুখ ভ্রূর চেষ্টাকৃত সমতা
এক পলকের পরিবর্তিত রেখাপাত
আমি এঁকে দেখাতে পারি না,
আমি ছবি আঁকতে শিখিনি।

'তোমার কাকা সজ্জন ব্যক্তি, শ্রদ্ধেয়,
নিরাসক্ত পুরুষ,'
জনৈক রায় বাহাদুরের উক্তি স্বকর্ণে শুনলাম—

আমি ছবি আঁকতে শিখিনি।

সন্ধ্যা

মণীন্দ্র রায়

দুর্যোগের দিনশেষে গ্রাম্যপথে সন্ধ্যার লোহিত
গাছের পাতায়, ঘাসে, খ'ড়ো চালে, মানুষের মুখে
ক্ষণতরে রেখে যায় প্রাতঃসূর্য আশার সম্বিৎ।
যদিও দুস্তর রাত্রি কালিঢালা রয়েছে সম্মুখে
এ রক্তনিশান ক্রমে নেমে যাবে অন্ধ অস্তাচলে ;
আকাশে রাত্রির বন্যা ছেয়ে যাবে মৌন মগ্নতায়
মুখর হৃদয়, আর শ্যামারুণ দীপ্ত বনস্থলে ;
যদিও দুর্যোগশেষে ক্ষণস্থায়ী দিগন্ত আভায়
তামাটে মুখের শীর্ণ হাসি ডোবে ঊর্ধ্বে তুলে হাত
রাত্রির জোয়ারে ; আর, দিন কত দূরে তা কে জানে !
তবু এই সন্ধ্যাকাশে ক্ষণতরে শুনি পদপাত
আগন্তুক সে-দিনের, বেগরক্ত অদৃশ্য আহ্বানে।
বুঝি তাই মৃৎপ্রদীপে রক্তরশ্মি আশা জ্বেলে রাখা।
রাত্রিমুখী ঝোঁড়ো কাক ডালে ব'সে ঝাড়ে সিক্ত পাখা।

অকাল-বর্ষা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের নীল দেখা গেল এইবার !
মেঘেদের দল চমকে দাঁড়ালো, থমকে দাঁড়ালো স'রে,
দীপ্তি, তোমার ভাঙল কি ঘুম, হ'লো কি স্বপ্ন শেষ ?
কাছে এসো, দেখি, অকাল-বাদল তোমারে ছুঁয়েছে কিনা !

কাল সারারাত ঝড়ের দোলায় সে কী অবিরাম বৃষ্টি,
কাল সারারাত তন্দ্রার ঘোরে ঝমঝম ঝমঝম
একটানা গান বিরহী বরিষা গেয়ে গেল বার বার,
ফিরে-ফিরে আনে দমকা বাতাস
কৌতুক কভু, কভু আশ্বাস,
যৌতুক দিল আশ্লেষ-ঘন একটি নিবিড় রাত।
কী করি, কী করি, বলো ?
মরা নদী দেখি বন্যায় টলোমলো !

আমি ভুলব না কখনো সে কালো রাত,
আমি ভুলব না শীতের নিশীথ—ঝঞ্ঝায় এলোমেলো,
আমি ভুলব না কল্পনা-মাখা আঁখিপল্লব থির,
আমি ভুলব না রাত্রিশেষের অপরূপ বিস্ময় !

জানি কাল রাতে তুমি খুব কেঁদেছিলে,
কাল রাতে কোনো দুঃসহ স্মৃতি হেনে গেছে করাঘাত।
দীপ্তি, দুয়ার খোলো,
বারবার ব'লে গেলো,
অতীতের কোনো প্রেম-কঙ্কাল
ধনুটংকারে শঙ্কার ছায়া ফেলে গেল কী গভীর,
তোমার দেহের স্তব্ধ বীণায় নিষ্ঠুর ঝংকার !

ঘরের ওপারে আকাশের গায়ে দস্যু বিদ্যুতেরা
লুণ্ঠন করে মত্ত লীলায় রাতের অট্টালিকা,
আমাদের ঘরে তারই ঢেউ এসে লাগে
জানালায় ঝনঝন
ঝঞ্ঝায় শনশন—
প্রেত-উল্লাসে মাতাল দানব দাপাদাপি ক'রে গেল !

দীপ্তি, মনে কি পড়ে,
কী নিবিড় ঘুম, কী নিবিড় ঝড়, কী নিবিড় ক্রন্দন !
আঁখির তলায় কাজল-পরানো রাত,
আর রেখে গেল দুই চোখ ভ'রে ফেনিল তন্দ্রা-ঘোর ;—
হায়রে অকাল-ঝড়,
এমনি ভয়ংকর !

নির্ভয়

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

অন্ধকার বনভূমি ছবির মতন,
নীরব নিগূঢ় শান্তি নিস্তল, গভীর,
দূর পাহাড়ের চূড়া অটল, গম্ভীর,
নিথর নদীর তীর নিশীথ নির্জন।

মধুবর্ণ চাঁদ এলো মধুর মিনতি,
রজনীগন্ধার মাল্য, জ্যোৎস্নার চন্দন !
সুপ্তির অঞ্চল-ছায়ে শিশির-শয়ন,
একটি স্বপ্নের ফুল স্থির, শান্তজ্যোতি।

ধীরে ধীরে মুছে গেছে স্বপ্নের সোনালি,
ধীরে ধীরে ভুলে গেছি কী আমার নাম,
ভুলে গেছি ভয়, আশা, জীবন উদ্দাম।—
সন্ধ্যার আকাশ-পটে রঙের দীপালি।

দিগন্তে আরক্ত সূর্য এনেছ নিষ্ঠুর ;
পাখির গানের দিন, ব্যাকুল জীবন,
স্তম্ভিত অচল হিমে অধীর স্পন্দন,
তোমার রক্তিম ওষ্ঠ নির্দয় মধুর !

চিত্রিত ব্যাঘ্রের মতো বনের প্রদোষে
তীরগতি সূর্য ফেরে খুঁজিয়া শীকার—
সোনার নখরে কাটে দীপ্ত ক্ষুরধার
পলাতক অন্ধকারে নিদারুণ রোষে !

আমারে খুঁজিয়া ফেরে তোমার চরণ,
শঙ্কায় শিহরে প্রাণ নিভৃত বিবরে ;

উড়িছে তোমার কেশ আলোকের ঝড়ে,
আমারে করিবে দগ্ধ কীটের মতন ?

আমারে করিবে দীর্ণ তোমার কামনা
বিদ্যুৎ-শাণিত-গতি ব্যাঘ্রীর মতন,
গ্রাসিবে কি আলোক ঘূর্ণির আবর্তন,
তীক্ষ্ণজ্যোতি বর্ণময় জীবন-বাসনা ?

দূর পাহাড়ের শীর্ষে হিম রাশি রাশি
সূর্যের সোনার মতো পড়িতেছে ঝরি ;
শস্যের কনকশ্রীতে দিয়ে যায় ভরি
হেমন্তের করপুটে—অশ্রু, আলো, হাসি।

তোমার হৃদয় দোলে সমুদ্রের মতো,
তোমার আয়ত চোখে জয়ের স্বাক্ষর,
সুতীক্ষ্ণ দশনে কাটো তোমার অধর,
আমার অটুট সুপ্তি বিক্ষোভ-বিক্ষত।

সেথায় অকূল শান্তি শিশির-শীতল
আমি যে ছিলাম ঘুমে ঘুমের গভীরে ;
আমারে এনেছ রঙে, আলোকের ভিড়ে
পাখির গানের ঝড়ে উত্তাল, চঞ্চল !

অধীর রূপের স্রোতে কাঁপিছে হৃদয় !
আমারে ঘিরিয়া তুমি গভীর আগ্রহে,
চেয়ে আছি চোখে চোখে কী জানি কী মোহে,
আমার ভেঙেছে ঘুম, কেটে গেছে ভয় !

জীবনায়ন

সত্যশান্তি ঘোষাল

এ সত্তার প্রতি কোষে কি দাহন বিষাক্ত ক্ষুধার
সর্বব্যাপী ইথরের মত এ কী সাগর-সুধার
তরঙ্গ বিহ্বল ! যেন এক দিশাহারা অন্ধকার
রুদ্ধ করিয়াছে দ্বার ইন্দ্রিয়ের নিরুদ্ধ আত্মার
ক্রন্দনধ্বনিত নিশীথিনী। যেন উদার আকাশ
সুধাক্ষরা, অমিত পরান আর জীবনে আভাষ
সুন্দরের—স্বপ্ন শুধু।
জন্ম হ'ল আণুবীক্ষণিক
জননী জঠরে, জন্ম নিল নীহারিকা আকস্মিক
অণুর সংঘাতে মহাশূন্য মাঝে। অকল্পিত বেগে
অণু হল তনু দেহ। মায়াবীর জাদুস্পর্শ লেগে
পেল আঁখি নগ্ন নীল আকাশের মত, পেল শ্রুতি
মর্মরে কল্লোলে এক ধ্বনিময় জগতের দ্যুতি
চেতনা-উষায়। লোলুপ জিহ্বায় তার নিল স্বাদ
অনন্ত রসের পাত্রে মধু তিক্ত অপূর্ব প্রসাদ
বিচিত্র এ-ধরণীর। পেলো ঘ্রাণে মধু গন্ধ ভরা
জীবনের সুনিবিড় পরিচয়। সর্ব দেহ ঘিরে
পেলো স্পর্শে শিহরণে জীবনরসের উৎসটিরে
ফিরে বার বার।
অরণ্যের অন্ধকারে আঁখি মেলি
হেরিল সে ছায়াচ্ছন্ন ধরণীর বিষণ্ণ কুহেলি,
শ্বাপদহুংকার আর চকিতনয়না জননীর
কত মৃত্যু অপঘাত নিষ্ঠুরতা বন্ধ্যা প্রকৃতির

৪

অজস্র ধারায়। কহিল সে করজোড়ে, 'দেহ দান
নিশ্চিত জীবন।' সহস্র শতাব্দী হ'ল অবসান
আজিও গগনে হেরি ঘন মেঘ, অনিশ্চয়তায়
বিষণ্ণ আকাশ। অনবদ্য ধরণীর রূপ নাহি ভায়
নয়নেতে, সংগীত শ্রবণে নাই, শ্বাপদ হুংকার
শুনি ত্রাসে থরথর কম্পমান।
শাণিত প্রজ্ঞার
খড়্গে ছিন্ন হল বনানী আঁধার, প্রকৃতি কৃপণা
খুলে দিল সুধার ভাণ্ডার, তবু ক্ষুধা মিটিল না
বঞ্চিতা ধরার। আজিকে প্রহর হ'ল রুদ্ধ-শ্বাস
আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায়। চির মুক্তির আশ্বাস
রয়েছে বক্ষেতে তার। প্রলয়ের ঝঞ্ঝামত্ত বায়ু
নিশিশেষে ধরণীতে আনিবে নিশ্চিত পরমায়ু।

পয়লা বৈশাখ

অমিতা দেবী

সকালে উঠেই কেমন ভালো লাগছে
উৎসুখ হ'য়ে আছি, তুমি আসবে।
　　প্রথমে ভোরে উঠে
　　বসন্তের রঙিন বস্ত্র ত্যাগ করেছি
পরেছি পবিত্র বৈশাখী আকাশের নীলাম্বরী
নীল খোলের ধারে সোনালী পাড়
　　কেমন সুন্দর !
তারপর করেছি দেবতার পূজা।

　　পূজাশেষে প্রার্থনা জানিয়েছি
　　বলেছি করুণ মিনতির স্বরে
আমার সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে দিয়ো
আমার বুক ভরিয়ে দিয়ো,
　　সে যেন আসে
　　সুন্দর মানসরথে
　　ফুলের গন্ধের মত
　　　　চকিত অভিযানে।

সুখী

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখী ! আমি সুখী !
লভিয়াছি প্রত্যুষের রবির কিরণ ।
লভিয়াছি অন্তরের অগ্নিশিখাস্পর্শখানি, কতদিন প্রাত্যহিক ধ্যানাসনে বসি'।
পেয়েছি সবুজ আলো গোধূমের শীষে ।
দেখেছি ঘুমন্ত ক্ষেতে হেমন্তের আভা,
নীলাভ্রের নিঃসীম বিস্তার ।
কখনো বা চুপি চুপি কথা কয় পল্লীগ্রামে মোর ছোট ঘর,
জেগে ওঠে নব-নব সুখ,
শিশির-শীতল ঘাসে, পায়ে চলা আর্দ্রপথে, চলিবার সুখ ।
কখনো বা মনে হয় ভালোবাসিবার সুখ সবচেয়ে বড়ো,
সব বাধা উপেক্ষিয়া অভিসারে চলিবার সুখ-ঘন সুতীব্র বেদনা,
প্রিয়ের চুম্বনসুখ,
প্রিয়তম পুরুষের পদপ্রান্তে আত্মহারা আপনারে লুটাবার সুখ।
আরো আছে—দুঃখের আশ্চর্য সুখ,
আদর্শের জয়ধ্বজা বহিবার দারিদ্র্যবেদনা,
যে-বেদনা মহীয়ান কণ্টকমুকুটবিদ্ধ শিরে ।
রৌদ্রতপ্ত আলস্যের সুখ। একনিষ্ঠ তপস্বীর সুখ ।
সম্মোহিত গ্রন্থাগারে আপনারে স্বেচ্ছাবন্দী করিবার সুখ।
পবিত্র শিশুর দেহ বক্ষে নিয়ে দোলাবার সুখ ।
আপনার পরিপূর্ণ যৌবনের দেহের সুষমা
নগ্ন দর্পণের বুকে দেখিবার সুখ। সুখ! কত সুখ !
কত সুখে ভরা এই সুন্দরী পৃথিবী !
সুখী, আমি সুখী।

অভাগ্য

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দুর্য্যোগ নিশি পোহালে সূর্য্য উঠেছে আকাশ-পটে
সেই সূর্য্যের অপূর্ব্ব আলো পড়েছে কখনো চোখে ?
আলোকের স্নেহ উপচিয়া পড়ে ধরণীর দেহ তটে
শুনেছ কখনো কার সে মন্ত্র জাগায় সর্ব্ব লোকে ?

মেঘে ঢাকা ছিল স্তব্ধ আকাশ, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
ধরণী গণিছে রাতের প্রহর কখন প্রভাত হবে,
নিবু নিবু দীপ, কম্পিত শিখা জ্বলে তবু আশ্বাসে
যে প্রভাত এলে নীড়হারা পাখী জেগে ওঠে কলরবে ?

সেই সে প্রভাত আলোর ঝরণা যতদূর দেখা যায়
প্রাণের আবেগে ধ্যান-গুহা হতে যেন বাহিরিয়া আসে,
আঁধারের প্রাণী বাহিরে আসিয়া এ উহার পানে চায়
পূবালি হাওয়ায় চেতনা ফিরিছে সচকিত উচ্ছ্বাসে।

আলোর ছন্দে সূর্য্য শুনায় নব জীবনের গান
সবুজ পাতার শিরায় শিরায় জেগে ওঠে শিহরণ,
মনে হয় যেন পৃথিবী আজিকে করেছে প্রাতঃস্নান
মুছে গেছে গ্লানি দেহে জাগিয়াছে পুলক-সঞ্চরণ ।

সেই সে প্রভাত তোমার মনের আঁধার অন্তরালে
ফুটে ওঠেনিক সম্ভাবনার নূতন পাপড়িগুলি ?
নব কিশলয় মেলেনিক দল মনের শুষ্ক ডালে
ভগ্ন আশার নব মঞ্জরী বাতাসে ওঠেনি দুলি ?

তোমার নয়নে সূর্য্যের আলো দিল না তাহার শিখা
দীপ্ত দিবার ইঙ্গিত তব জীবনে দিল না ধরা,
দুখের রাত্রি একান্তে বসি লিখিল ভাগ্যলিখা
ইহ জনমের অদৃশ্য লিপি সে কি তমসায় ভরা ?

বসন্তের একটি দিন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী যে ভালো লাগে আজ সারা পৃথিবীরে।
কিছুদূরে পলাশের বন
বিবাহের পূর্ব্ব রাতে রাত্রি-জাগা কুমারীর মত
প্রত্যাশায় আবেশ-উন্মন,
অস্থির চেতনা এক দৃষ্টিহীন হৃদয়কে ঘিরে।
দূরে একেশিয়া গাছে
পত্রের মর্ম্মরধ্বনি
দিবস-রজনী ;
হাওয়া বয়, শূন্যে নীলাকাশে ওড়ে
লঘুপক্ষ বলাকার সারি,—
নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় নির্জ্জন প্রাঙ্গণে ;
দীর্ঘরাত্রি জাগরণে
প্রত্যাশাবিধুর দিনে কার চোখ ভারী ?

শীতের কুয়াশা ভেঙে যায়।
গতপত্র গাছের শাখায়
সবুজের স্রোত ফের,
আলোড়ন গাছে-গাছে, সুকোমল পাতায়-পাতায়।
আমারো এ-বিধুর পাখায়
লভি যেন নব বল ; কোনখানে কোন দূরদেশে
অলস স্বপ্নের হাত ধরে'
এইবার যাত্রা নিরুদ্দেশে ?
এখানে পথের।
দুইধারে উপবাসী ভিখারীর চোখে

অনেক প্রত্যাশা ;
দূর গম্বুজের চূড়া ঝলমল ক'রে ওঠে সূর্য্যের আলোকে।
অফিস-ফিরতি বাসে
জড়াজড়ি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে
উদ্বায়ু আয়ুর জোরে
নির্ব্বিঘ্নে এখনো ফিরি বেলাশেষে ঘরে ;
কখনো তাকিয়ে দেখিনি ত,
ক'টি তারা জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার আকাশে,
নরম সবুজ ঘাসে
কোথায় তৃণের দলে অন্তহীন প্রাণ
এখনো উদ্যত।
অস্থির ক্রোধের দাহ, অতৃপ্তি-যন্ত্রণা
রাত্রিদিন করে অন্যমনা ;
বৈশাখের দাবদাহে, শ্রাবণের অঝোর ধারায়,
যে-রোমাঞ্চ সুপ্ত রয় তার আবেদনে
জোয়ার জাগেনি ভীরু মনে ;
সবাই মেতেছি এক দৈনন্দিন লুব্ধ প্রয়োজনে।

এখনো তো দেখি পথে-পথে
জীবিকার রথে
জীবনের ঘূর্ণাবর্তে খাবি-খাওয়া অনেক সেনানী ;
কোথায় বসন্ত এলো
কোথায় যৌবন তার প্রেম ফিরে পেলো,
এ-সবের আমরা কী জানি !

সাবিত্রী

(শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু
বন্ধুবরেষু)

জ্যোতির্ম্মালা দেবী

সন্ধ্যার আরক্ত পদ্ম
আজো দেখা যায়,
আজো হাসে
সূর্যকলি
সবুজ শয্যায়।
ধরণীর কৃষ্ণ দেহ
কাঁপে থরোথরো,
ইঙ্গিত লুকায়
বাষ্পবেগ পুষ্পকের মতো।

এলো দেবত্রাণ····
হয়েছে সময় !
হে সাবিত্রী !
মানো নাই পরাজয়
পরম মৃত্যুরও কাছে।

এসেছিল যম—
তুমি
ভেঙেছিলে বনগৃহ-সংযমের দুরন্ত নিয়ম।
কেন ?
হায়,
মানব-স্বামী যে তব মৃত্যুরেই চায়
যদিও সে সত্যবান !

৫

তোমার জরায়ুগর্ভে
ছিল তার—
শুধু তার জীবনকুসুম;
যজ্ঞধূম-প্রেম দিয়ে,
দিয়ে ভালোবাসা
তুমি তারে দিয়েছিলে
দীর্ঘদীপ্ত জীবনের আশা।
মৃত্যু তবু চায়
বনতল-গহনের কৃষ্ণসর্পলুণ্ঠিত শয্যায়,
হতভাগ্য সত্যবান!

ধিক! ধিক!
আজো তুমি চাহো তারে?
হে সাবিত্রী,
তবু তুমি ডাকো তারে
"প্রিয়তম,"
জপো তারি নাম?
সর্বত্র প্রচার ক'রে স্বামীর মহিমা
তোমারি জীবন হলো
শুধু এক
সুদীর্ঘ প্রণাম?

কেন?
হায়,
সূর্য হতে এসেছিলে—তাই?
হে লক্ষ্মী সবিতা-সখি!

সত্যবান
পরিচয় তব
তবু নাহি পায়?

চেয়ে নিলে
এ কী বর!
"সহস্র তনয় দাও
সূর্যের সন্তান!"
তাই বুঝি ক্ষুদ্র দীপ
নিভে গেলো,
শব হলো সত্যবান?

তুমি শক্তি নিলে রমা,
হে সূর্যরমণী,
আপন পতির কাছে।
সত্যবান?
মৃত্যুর দুয়ার হ'তে
পিছু পিছু ফিরে আসে।
নাই গর্ভবেদনার আলজ্জ দহন,
আরক্ত প্রলয় নয়।
সূর্যের স্ফুরিত অগ্নি
তোমার স্বামীরে ঘেরি'
লক্ষ সত্য মঞ্জরীর
দিলো পরিচয়।

ভোরে

বীরেন্দ্র মল্লিক

সূর্য্য তখনো ওঠেনি,
আকাশে তখনো চাঁদের ফিকে জ্যোৎস্না,
গাছের আশেপাশে তখনো আধো-আঁধার,
অস্ফুট মিহি ডাক ভেসে আসছে পাখীদের।

হঠাৎ আজ এতো ভোরে নেমে এসেছি পথে,
নদীর বাঁধের ওপর চ'লে এসেছি
অনেক নিঃসাড় ঘুমন্ত পল্লীর মধ্যে দিয়ে।

প্রকৃতি আজ শান্ত স্তব্ধ,
সামনের এই নদীও আজ শান্ত স্তব্ধ ধীর।
জলে ওপারের আবছায়া প্রতিবিম্ব আঁকা—
যেন পটে আঁকা ছবি—
সমস্ত রেখাগুলি তার যেন কেঁদে কেঁদে বধির হ'য়ে গেছে।
ভাদ্রের এই মরা জ্যোৎস্নায়
সে যেন রয়েছে শুয়ে নিঃশব্দ ঘুমের আচ্ছন্নতায়।

অথচ আমি জানি এই নদী একদিন
চঞ্চল হ'য়ে ফেনিল স্বপিল হ'য়ে শতধারায় বেঁচে উঠে
সমস্ত গ্রাম ভাসিয়ে দিয়ে,
সমস্ত পথের চেতনাকে ডুবিয়ে দিয়ে
ছলোছলো তার বিষাণ-বাজানো স্রোতের পর স্রোতে
সব একাকার ক'রে দিয়েছিলো!

জানি, এই মরা নদীর মতো
আবার একদিন তুমি উঠবে জেগে
এমনি ক'রে আবার আমার হাতের মধ্যে তোমার
কোমল-শুভ্র ঠোঁট দুটি রেখে
কান্নার অজস্র ধারায় ফেটে পড়বে তুমি!

আর এও জানি
এই মরা নদীর মতো তুমি শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে এলে
তোমার বাঁধের উপর গিয়ে নির্ভয়ে বসবো
এমনি নির্জন ভোরে কোনো একদিন!

স্মারক

অশনি গুপ্ত

তোমাকে কবে দেখেছিলেম পড়িছে আজ মনে—
চকিত কোন সুরের মত ; কী কথা সেই ক্ষণে
বলিতে গিয়ে বলো নি তুমি ! সহসা মৃদু হাসি
দু'চোখে শুধু উঠিল জ্ব'লে, চকিতে গেলো ভাসি।
হারিয়ে গেলে মুখর ভিড়ে, তুমি তো জানো নাই
একক মন পলকহারা প্রথম জাগরণে—
তোমাকে কবে দেখেছিলেম পড়িছে আজ মনে।

তুমি তো গেলে হারিয়ে, যেন শরতে শাদা মেঘ
আকাশ-তলে ক্ষণ-বিলীন ; গভীরতর বেগ
এ মনে তবু দিয়েছো এনে, এখনো তার সাধা
প্রতিদিনের চারু কলায়, প্রতি কথায় বাঁধা
সেই তোমারি চকিত সুর ; তুমি তো জানো নাই
একক মন মুখর হ'লো প্রথম জাগরণে—
সেই তোমাকে দেখেছিলেম, পড়িছে আজো মনে।

হুয়াই-নানের নর্তকী

চাং-হুং (৭৮--১৩৯ খৃঃ)

সংগীতের ওই যন্ত্রগুলো সাজিয়ে রাখা হলো,
দেওয়া হলো দামী মদ ;
নাকাড়ায় পড়লো কাঠি,
বেজে উঠলো বাঁশি।
ছন্দ-তরঙ্গ উঠলো জেগে লাস্যে,
উলটাপালটা, অদ্ভুত।
মদ যারা খায়, তারা হলো মাতাল
সূর্য পড়লো পশ্চিমে ঢ'লে,
নর্তকীরা নাচের জন্য প্রায় প্রস্তুত।
মুখে তুলি টেনে
বদলে নিলে কাপড় ;
রেশমে পড়লো শরীর ঢাকা,
সূক্ষ্ম রেশম আর ফেনিয়ে-ওঠা রেশম
দুই মেশানো।
রেশমের পটি দিয়ে-দিয়ে নিলো নিজেদের সাজিয়ে।
নাকাড়ী বলে ফিসফিসিয়ে কথা—
নর্তকীরা দাঁড়ায় সারি দিয়ে।
অন্য তালে নাকাড়া জোরে বাজে
জোড়া-জোড়া দাঁড়ায় নর্তকীরা।
লুটিয়ে-পড়া আস্তিনে মুখগুলি ঢেকে
ধরে ওরা গলা খুলে গান।
গান বলছে :
পুরুষ পাখী পালিয়ে গেছে উড়ে
বধূ পাখী উড়ে বেড়ায় একা

অবাক হয়ে—
বাতাসে আজ পিছন দিকের মন-কেমনের টান
ইচ্ছে তো হয় বাড়ি ফিরে যেতে।

সরু কটি বেঁকিয়ে দিয়ে
ঢ'লে পড়ে দুইদিকে দুইজনা
খোঁপা পড়ে এলিয়ে
আবার আসে ঠিক জায়গায় স'রে।
ওদের রূপে পদ্মেরই লাল আভা
উঠছে ফুটে, ঠিকরে।
রূপসী-চোখের কটাক্ষে
কালো তারা উঠছে জ্ব'লে, বিদ্যুৎ।
আস্তে ভেসে আসে, কোমল, একের পরে এক
আবার নাচে কিন্তু আবার থামে।
ঘাঘরা উড়ছে যেন দোয়েল শ্যামা
লুটিয়ে-পড়া আস্তিন উঠছে
তুষার ঝড়—
জোড়া-জোড়া দাঁড়িয়ে এবার নাচ
বজ্রপাতের শব্দ যেন
মিলোয় দ্রুত বিদ্যুতেরই মত।
তারপরে আস্তে এবার,
এগিয়ে যেতে দেরি, দ্বিধা,
মাঝখানে থামা।
কিন্তু এবার মুখের ও-রং
আর ভুরুর কালো—
দুটোই গেছে ঝ'রে,
ফিরোজার শরীর নিজের রঙে রাঙা—

আলগা খোঁপার বন্ধনী আর
কালো চুলে অগোছালো ঢেউ।
গুচ্ছ অলক
চিরুনিতে আর আঙুলে সাজলো পরিপাটি
জড়িয়ে নিয়ে নরম রেশম
আবার শরীর ঘেরা, আগের পোশাক,
দাঁড়িয়ে জোড়া-জোড়া,
পুরোনো সেই ভঙ্গি দিয়ে
পুরোনো সেই গান।
সামনে, পিছনে, ভুলহীন গতি
ছায়া যেন আসে দেহের পর
সাতটি থালার উপর দিয়ে
নেচে চলে ওরা—
মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে গান।
গান তো নয়, বলাকার ওই
পাখারই গুঞ্জনে—
চোখ আর মন দুইই
আমার আনন্দময় শান্ত॥

মন্তব্য :—লেখক কবিতার গোড়ায় বলেছেন : 'এক আগন্তুক হুয়াই-নানে এই নাচ দেখে কবিতাটি লেখেন'—বলা বাহুল্য কবি নিজেই এই আগন্তুক। চীনা সাহিত্যে এই ধরনের কবিতাকে 'ফু' বলা হয়। এই ধাঁচের কবিতা লেখা বহুদিন চীনাতে বাতিল হয়ে গেছে, সেরকম ক্ষমতাশালী 'ফু' লিখিয়ের অভাব। চীনে থেকে এটি আংশিক অনুবাদ।

অনুবাদক—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদেশী সাহিত্য

দেমেত্রিয়স কাপেতানাকিস

দেমেত্রিয়স কাপেতানাকিস একজন আধুনিক গ্রীক কবি : দেড় বছর আগে লণ্ডনের এক হাসপাতালে বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। NEW WRITING AND DAYLIGHT-এর ১৯৪৪ শরৎ সংখ্যায় ইডিথ সিটওএল প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্যিক এবং একজন গ্রীক অধ্যাপক তাঁর কাব্য ও জীবন অবলম্বন ক'রে প্রবন্ধ লিখেছেন—তাছাড়া আধুনিক গ্রীক কবিতা সম্বন্ধে কাপেতানাকিস-এর নিজের একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। যে-গ্রীস পাশ্চাত্য সভ্যতার মাতা, সেই গ্রীসেরই আমরা খবর রাখি; আধুনিক সংস্কৃতি-জগতে গ্রীসের যে কোনো অস্তিত্ব আছে এমন জনরব কদাচ আমাদের কানে ওঠে। এই প্রবন্ধগুলি তাই ভালো লাগলো। অনেক যুদ্ধ, অনেক দুঃখ, অনেক রাজনৈতিক চক্রান্ত অতিক্রম ক'রে গ্রীস যে এখনো বেঁচে আছে, কাপেতানাকিস-এর জীবন ও কাব্যের ক্ষীণ পরিচয়পত্র থেকে এই কথাটাই সংগ্রহ করলাম।

এথেন্স, হাইডেলবার্গ, কেমব্রিজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এই তরুণ কবিকে লালন করে। ফরাশি, জর্মন ও রুশ সাহিত্যে তিনি মগ্ন ছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডে আসবার পর থেকে ইংরেজি সাহিত্য তাঁকে এমন ক'রে মুগ্ধ করলো যে তিনি অতি দ্রুত বেগে ইংরেজি ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে ইংরেজিতেই কবিতা লিখতে লাগলেন। জীবনের শেষ ক' বছর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ইংলণ্ডেই বসবাস করেছিলেন এবং ইংরেজিতেই লিখেছিলেন—NEW WRITING-এর সমালোচকেরা তাঁর ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, শ্রীমতী সিটওএলের মতে তাঁর মৃত্যুতে গ্রীক সাহিত্যের যতটা ক্ষতি হ'লো, ইংরেজি সাহিত্যেরও ঠিক

ততটাই। তাঁর ABEL কবিতাটি উদ্ধৃত ক'রে পঞ্চমুখে এঁরা প্রশংসা করেছেন—তার কারণ বোধহয় এই যে কাপেতানাকিস এলিঅটোত্তর ইংরেজ কবিদের সবগুলি মুদ্রাদোষ নিখুঁতভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, এবং সেই কারণেই ও-কবিতার মর্মে প্রবেশ করা সকলের পক্ষে সহজ হবে না—আমি তো চেষ্টা ক'রে ফিরে এলুম।

কিন্তু কাপেতানাকিস যে সত্যি প্রতিভাবান ছিলেন, আধুনিক গ্রীক কবিতা সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। 'কবিতা মানে ভাষা—ভাষার গভীরতম সত্তা-সার'—এ-কথা সত্যিকার কবি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। এক ভাষার কবিতা সম্বন্ধে অন্য ভাষায় আলোচনা করার দুরূহতা স্বীকার ক'রে নিয়েও আধুনিক গ্রীক কবিতার সঙ্গে ইংরেজ পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেবার যে-প্রয়াস তিনি করেছেন, তাতে তাঁর আপন কবিত্বশক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। গ্রীক কবিদের মৃত্যু-চেতনার কথা বলেছেন তিনি—মৃত্যুই গ্রীক কবিতার প্রধান বিষয়, এবং মৃত্যু সম্বন্ধে গ্রাক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে কয়েকটি সুন্দর কবিতার সুন্দর অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেছেন।

> হে পর্বত, হে প্রান্তর, কী সুখী তোমরা,
> তোমাদের নেই জরা,
> নেই মৃত্যু-ভয়।
> কোনোদিন পড়িবে না ধরা
> প্রত্যাশিত নিশ্চিত হত্যার হাতে।
> ফিরে-ফিরে পাবে শুধু বসন্ত প্রভাতে
> প্রান্তরে ফুলের মেলা, পর্বতের দেহে
> সবুজের খেলা।

এই কবিতাটির লেখকের নাম কাপেতানাকিস করেননি, কিন্তু এর পরের কবিতাটি যাঁর লেখা তাঁর নাম দিঅনিসিঅস সলমস—গ্রাসের জাতিক সংগীতের রচয়িতা তিনি, গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে বিবেচিত। তাই ব'লে তিনি যে শুধুই যুদ্ধের কিংবা দেশপ্রেমের

কবিতা লিখেছেন তা নয়, তাঁর কবিতায় যে সার্বভৌম সরসতাও আছে, নিচের কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

সুন্দরী চৈত্র নৃত্য করছেন
প্রেমের দেবতার সঙ্গে,
তার আনন্দ ব্যাপ্ত হ'লো বিশ্বে।
কী মধুর এই ছায়ার ঘনতা,
মনে হয় সুরভি শীতলতার সকল সম্পদ ওতে লুকোনো,
সেই ছায়ার গা থেকে
অশ্রুত অস্ফুট পাখীর গান ঝরছে।
ওদিকে স্বচ্ছ উজ্জ্বল জল
হাসতে-হাসতে চ'লে গেলো পৃথিবীর সুগন্ধি গোপন গহ্বরে,
চুরি ক'রে আনলো গভীরের সৌগন্ধ্য,
সেই সৌরভের উৎসের ঐশ্বর্য
সূর্যের পায়ের তলায় ছড়াতে-ছড়াতে
পাগলের মতো ছুটোছুটি করে জল
হাজার পাখির মতো গান ক'রে-ক'রে।
একটি প্রজাপতি শালুক-ফুলের বুকে শুয়ে
তার ঘুমটুকুকে সুগন্ধি ক'রে নিয়েছিলো,
এখন সে হ্রদের স্তব্ধ জলে
ছোট্ট একটি ছায়ার সঙ্গে খেলা করছে।
—তুমি তো দেখতে পাও অপ্সরীদের নৃত্য,
বলো তো কী দেখলে আজ রাত্রে?
—দেখলাম, এই রাত্রি অভাবনীয় বিস্ময়ে ভরা,
জাদুমন্ত্রে গড়া এই রাত্রি।

এইবার কাপেতানাকিস-এর নিজের একটি কবিতা উদ্ধৃত করি। কবিতাটির নাম 'Isles of Greece'—লর্ড বায়রনের 'Isles of Greece'-এর সঙ্গে কী বেদনার্দ্র এর প্রতিতুলনা!

সূর্য আমাদের প্রেমে পড়েনি,
না, সমুদ্রও না।

কী তীব্র সমুদ্র! ক্ষইয়ে দিলো জীবন।
তবু তো ওরা আমাদের গভীর অন্তরঙ্গ,
ওরা দু' জনেই দগ্ধ করবে
আমাদের দেহের শুকনো মাংস, আমাদের মাংসহীন কঙ্কাল।

দগ্ধ করবে কী দিয়ে?
জীবন্ত মৃত্যুর দুঃশীল রসনা দিয়ে,
অগ্নিময় পীন সর্পরাশি দিয়ে,
ঐ তো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে তার বিষাক্ত নিশ্বাস,
গ্রীসের বীণাতন্ত্রের উপকথায়
চিড় ধরিয়ে দিলে দেখতে-দেখতে।

ধুলোমাখা ডুমুর গাছটা চীৎকার ক'রে বলছে, 'বাঁচাও!'
দু' জন চাষা মিলে বধ করলো একটা সাপ,
এদিকে আমাদের পাষাণপুঞ্জ হৃদয়ে
মর্মর দেবতারা এতকাল নির্বাক থেকে-থেকে
এখন একে-একে ভেঙে যাচ্ছেন।

দীর্ঘ, দীর্ঘ যুগের অবসানে আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভালোবাসা
ঝ'রে পড়লো নির্বীজ জ্বরের উত্তাপে,
তাই তো আত্ম-ত্যাগী বীরত্বের দীপ্তিতে
আজ আমরা যত সুন্দর, এত সুন্দর কখনো ছিলাম না।

তবু যখন আগ্নেয় অশ্বদল
থামিয়ে দেয় রথ, আপোলোকে নামিয়ে দেয় জোর ক'রে,
অবশেষে আমাদের পাশেই বিশ্রামের আসন পেতে তিনি বলেন,
'এ-সৌন্দর্যের অর্থ নেই, মূল্য নেই।

এলিঅট ও কিপলিং

এলিঅট ও কিপলিং ! কিসে আর কিসে ! কোথায় এলিঅটের হিমশুভ্র মর্মরপ্রাসাদ, আর কোথায় কিপলিংএর উত্তপ্ত প্রগল্‌ভ কলরোল। কিন্তু এলিঅট শুধু তো কবি নন, বর্তমানে ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ সমালোচক তিনি ; যদিও শেলি সম্বন্ধে—সাধারণভাবে উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে—তিনি জন্মান্ধ, সতেরো ও আঠারো শতকের সাহিত্য তাঁর মনের আলোয় আজ উদ্ভাসিত। সুসংস্কৃত সমাজে যে-কবির আসন নেমে যাচ্ছে, কিংবা যে-কবি কখনো আসন পানইনি, সে-কবির সমর্থনে এলিঅট বিশেষভাবে সিদ্ধবাক্‌। কিছুদিন আগে কিপলিঙের কবিতার যে-সংকলনগ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছে, তার মুখবন্ধে এই অত্যন্ত বেশি জনপ্রিয় কবির পক্ষ নিয়ে আশ্চর্য ওকালতি করেছেন তিনি। অথচ সমস্ত লেখাটির মধ্যে একটু যেন কষ্টের গ্লানিমা এলিঅট কিছুতেই গোপন করতে পারেননি, বক্তৃতা করতে-করতে নিজেই হাঁপিয়ে পড়েছেন মাঝে-মাঝে। অবাক লাগে এইটে ভাবতে যে কিপলিঙের কবিতাও এমন মনোহররূপে পরিবেশিত হ'তে পারে—বলা বাহুল্য, কিপলিঙের কাব্য-কলার চাইতে এলিঅটের সমালোচনা-শিল্পেরই এটা কৃতিত্ব। এলিঅট এই কথা ব'লে আরম্ভ করেছেন যে যে-লেখক একই সঙ্গে কবি ও কল্পনাপ্রবণ গদ্যলেখক, তিনি কখনোই উভয় রূপকল্পে সমান উৎকর্ষে পৌঁছতে পারেন না—মেরেডিথ, হার্ডি, ডি. এইচ. লরেন্সের কবিতা ভালো, কিন্তু যদি তাঁরা শুধুই কবিতা লিখতেন তাহ'লে যত ভালো হ'তে পারতো, তত ভালো নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এলিঅট অজ্ঞ ; তাই তাঁর পক্ষে এমন লেখক কল্পনা করা সহজ নয় যিনি একাধারে গদ্য পদ্যের অধীশ্বর। কিপলিঙের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম—তাঁর পদ্য আর গদ্য-গল্প অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, গদ্য-পদ্য মেশানো একটি নতুন রূপকল্পের তিনি আবিষ্কর্তা, এবং দুটো দিক

একসঙ্গে না-দেখলে কিপলিঙের প্রতি সুবিচার করা যাবে না। কাব্য-সমালোচনার প্রসঙ্গে এলিঅট বার-বার কিপলিঙের গল্পের উল্লেখ করেছেন—স্পষ্ট ক'রে না-বললেও এই কথাটাই কখনো-কখনো ইঙ্গিত দেয় যে একই বক্তব্যকে কিপলিং যখন একবার পদ্যে, একবার গদ্য-গল্পে প্রকাশ করেছেন, তখন গল্পটাই বেশি ভালো হয়েছে। তাহ'লে আর হার্ডি মেরেডিথ লরেন্স থেকে তাঁকে আলাদা করা কেন ? তাঁদের রচনায় যদি কবিতা দমিত হ'য়ে গদ্য-গল্প বিকশিত হ'য়ে থাকে, কিপলিঙের গল্পও মাথা উঁচু করেছে পদ্যকে তলায় রেখে। কিপলিং যত ভালো গদ্যলেখক কবিও তত ভালো এ-কথাটি এলিঅট অনেক চেষ্টা ক'রেও পাঠককে বিশ্বাস করাতে পারেননি।

কিপলিঙের কবিতার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ এ-পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে, এলিঅট তার সবগুলোকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এমনভাবে যেন ঐ দোষগুলোই তাঁর গুণ। কিপলিং পদ্য-সাংবাদিক সে-কথা ঠিক, কিন্তু কোনো ঘটনার উপলক্ষ্যে ভালো পদ্য লিখতে পারাটা এলিঅটের মতে একটি 'অত্যন্ত বিরল গুণ'। এই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত—কবি হিশেবে তাঁর আসন আজ কোথায় ? কিপলিং ভারত-বিদ্বেষী—এই অব্যক্ত অভিযোগের উত্তরে এলিঅট বলেছেন যে কিপলিঙের ভারত-চেতনার দুটো স্তর আছে, এক শৈশবের, আর এক প্রথম যৌবনের। সতেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে-যুবক ভারতবর্ষে জীবিকা অর্জন করেছিলো, দিল্লি-শিমলার ঝাল-ঝাঁজ মেশানো রগ-চটা গল্পগুলো তার লেখা ('ও-বয়সে মানুষের পক্ষে ভালোবাসা সহজ নয়'), কিন্তু যে-শিশু ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে সেখানেই বড়ো হয়েছে, সে ভালোবেসেছে ঐ দেশকে, ঐ দেশের মানুষকে। সেই ভালোবাসার প্রমাণ এলিঅট KIM-এর ভারতীয় চরিত্রগুলিতে দেখতে পেয়েছেন—এ-বিষয়ে ভারতীয়রা এলিঅটের সঙ্গে একমত হবেন কিনা সন্দেহ—এবং এলিঅটের পক্ষেও প্রামাণিক মত দেয়া দুরূহ, কারণ তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই জানেন না।

এটা লক্ষ্য করবার যে এত বড়ো ইংরেজি সাহিত্যে প্রত্যক্ষ দেশ-প্রেমির কবিতা নেই বললেই চলে—যা আছে তা কবিতা হিশেবে নগণ্য—এমনকি, মহৎ কবিরাও যখনই ও-প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন তখনই সুর নেমে গেছে। এর উদাহরণ শেক্সপিয়রে HENRY V। এলিঅটের মতে পঞ্চম হেনরির 'embarrassing grandiloquence' সহ্য করা যায় শুধু এই কারণে যে ফরাশি সেনানী ইংরেজ সেনানীর চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। আসলে পরাধীন দুর্গত দেশে, কিংবা স্বাধীন দেশ অতর্কিতে আক্রান্ত হ'লেই দেশপ্রেমের কবিতা এমন হ'তে পারে, যাতে সব দেশের লোকেরাই তার মধ্যে নিজ-নিজ মাতৃভূমির প্রতিমূর্তি দেখতে পায়; বাংলা ভাষার স্বদেশী গান চিত্তদ্রবী, কিন্তু শক্তিশালী ইংরেজ যখন দেশপ্রেমের কবিতা লেখে, তাতে চোখ-রাঙানো দর্পিত ভাবটা কিছুতেই লুকোনো থাকে না। এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে কিপলিঙের কবিতা সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক, সাম্রাজ্য-প্রসারের তীব্র সুরায় তাঁর সমস্ত রচনা কলুষিত। এ-বিষয়ে এলিঅটের বক্তব্য এই যে কিপলিং কোনো রাজনীতিকের প্রচার-সচিবের কাজ করেননি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তিনি শুধু একটা ভাব ব'লে নয়, একটা বস্তু ব'লে অনুভব করেছিলেন, তার মধ্যে দেখেছিলেন মহিমা, সুগভীর দায়িত্ব-বোধ। তাহ'লে এ-কথাই বলতে হয় যে যে-সাম্রাজ্যের স্তব তিনি করেছিলেন সেটা তাঁর মনের একটা আদর্শ, কিন্তু আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের প্রভেদ কিপলিঙের চিরকম্পমান চিত্ততন্তুতে কখনো ধরা পড়েনি কেন, এ-প্রশ্ন এলিঅটের মনেই ওঠেনি, কারণ জাতিতে মার্কিন ও চরিত্রে ইংরেজ হ'য়ে সাম্রাজ্যের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই ধারণা অস্পষ্ট। LOOT, THE LADIES প্রভৃতি যে-সব কবিতা ইংরেজ সমালোচকের মতেই ঘৃণ্য ('wholly detestable'), সে-গুলিও এলিঅট সুনজরে দেখেছেন, তাতে তিনি ধনরত্ন নারীমাংসের প্রতি পেশাদার সৈনিকের বীভৎস লুব্ধতার সমর্থন দেখতে পাননি; তাতে তিনি দেখেছেন সামাজিক সুবিচারবোধ, গৃহবাসী সুখী

স্বদেশবাসী কর্তৃক অনাদৃত প্রবাসী সৈনিকের প্রতি করুণা। লুণ্ঠিতকে করুণা না-ক'রে লুণ্ঠনকারীকে যে করুণা করে, তার মনোবিকার এলিঅট দেখতে পাননি, কারণ কিপলিং বর্ণিত সৈনিক তাঁর কাছে সত্য, অপর পক্ষ ছায়াচ্ছন্ন। এক জায়গায় এলিঅট অবশ্য ক্ষীণস্বরে বলেছেন যে সাম্রাজ্যের 'দোষ' সম্বন্ধে কিপলিং সচেতন ছিলেন, ব্রিটিশ জাতির শ্রেষ্ঠতাতেও তিনি বিশ্বাস করতেন না, তবে শাসনকার্যে বৃটিশ যে অন্যান্য জাতির চাইতে প্রতিভাবান এবং তাদের মধ্যে দয়াশীল, নিঃস্বার্থ, অকলুষেয় শাসনদক্ষ মানুষের সংখ্যা বেশি, এটা তাঁর বিশ্বাস ছিলো। বিদেশে বৃটিশ শাসনের খবর যাঁরা রাখেন, এ-কথা শুনে কিপলিং সম্বন্ধে তাঁদের কী-ধারণা হবে, এলিঅটের পক্ষে তা ধারণা করাও অসম্ভব। কিপলিঙের যে-কালিমা অপনোদন করা তাঁর উদ্দেশ্য, সে-কালিমার প্রলেপ আরো গাঢ় ক'রেই তিনি মাখিয়ে দিয়েছেন এখানে। অজ্ঞতা থেকে যে-ভ্রান্তির জন্ম, মহা মনীষীও সব সময় তা এড়াতে পারেন না।

রাজনৈতিক কবিতা ব'লে কিছু হ'তে পারে কিনা, এ-প্রশ্ন এলিঅট তুলেছেন, যদিও তার স্পষ্ট জবাব দেননি। এ-সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনে দ্বন্দ্ব আছে, মনে হয়। ড্রাইডেনের তিনি ভক্ত, ড্রাইডেন রাজনৈতিক কবিতা লিখতেন, অতএব রাজনৈতিক কবিতা সম্ভব—তাঁর বক্তব্য অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়। ড্রাইডেন আর কিপলিং দু'জনেই বাগ্মিতার ভিতর দিয়ে কবিত্বে পৌঁচেছেন, তাঁদের কাছে প্রেরণার চাইতে প্রজ্ঞা বড়ো—সকলের জীবনের যেখানে তাঁরা অংশী, সেখানেই তাঁরা সরব, আর যেখানে সর্বজন থেকে ভিন্ন সেখানে অব্যক্ত। যে-সুখদুঃখ বিশেষভাবে নিজের সে-বিষয়ে তাঁরা কিছু বলেন না, যে-সুখদুঃখ অন্য সকলের সঙ্গে ভোগ করেন, তা নিয়ে কবিতায় বক্তৃতা করেন। কবিতা তাঁদের কাছে কখনোই নিজের মনে গুনগুন করবার নয়, আগাগোড়াই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে চীৎকার করবার। কবিতার এই আদর্শ অনেকের পক্ষেই স্বীকার করা সম্ভব হবে না। কবি যেখানে অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন সেখানেই তো তিনি কবি, আপন নিভৃত সুখদুঃখের

আন্দোলনকে সর্বজনীন ক'রে প্রকাশ করা, ব্যক্তিগতকে বিশ্বগত করতে পারা—এই শক্তিই তো কবিত্ব। র‍্যাশনের মোটা চাল খাচ্ছি, কিংবা কাপড় কিনতে পাচ্ছি না—এ-দুঃখ সকলের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে হয়, কবি নামের যিনি যোগ্য এ নিয়ে কবিতা লেখার কথা তাঁর মনেই হবে না,—কিন্তু যে-দুঃখের অনুভূতি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যা একলার, যা নির্জনের সেটাই অসামান্য, সেটা যত তুচ্ছ হোক, কিংবা কাল্পনিকই হোক, বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম হয় তা থেকেই।

কিন্তু এলিঅট সতর্ক; কিপলিং সম্বন্ধে কবি কিংবা কবিতা এ-সব কথা ব্যবহারই তিনি করেননি, তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন মহৎ পদ্য-লেখক—'a great writer of verse'। কিপলিঙে পরিবর্তন আছে, পরিণতি নেই; তাঁর কারুকলা চমৎকার কিন্তু ধ্বনির আন্তরিক সংগীত তিনি বুঝতেন না; মহৎ কবিতায় যে একটি অনিবার্যতা আছে,—প'ড়ে মনে হয় ঠিক এই কথাটি ঠিক এই ভাবে না-ব'লে কবির উপায় ছিলো না—সেটা কিপলিঙের রচনায় অনুপস্থিত। গদ্যে কি পদ্যে মহৎ লেখকের সমগ্র রচনাবলী একসঙ্গে দেখলে যে একটি সর্বব্যাপী বিরাট তাৎপর্য ধরা পড়ে—হেনরি জেমস যাকে বলতেন Figure in the Carpet, যা আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথে, এ-যুগের ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ইএটস-এ, কিপলিঙে তার সন্ধান করা বৃথা। এ-সমস্ত কথা এলিঅট প্রবন্ধের প্রথম অংশেই ব'লে নিয়েছেন—তারপর একে-একে কিপলিঙের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করবার চেষ্টা ক'রে, আপন বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী প্রশংসা ক'রে-ক'রে শেষ অংশে আবার বলেছেন যে শেষ পর্যন্তও কিপলিঙের 'পদ্য' 'কবিতা' হবার কোনো লক্ষণই দেখায়নি, ইংরেজি কবিতার form তিনি না-লিখলে যা থাকতো, তা-ই আছে, এবং যে-কারণে তাঁর পদ্য কবিতা হ'তে পারেনি, সেটা সংগীতবোধের অভাব—আমরা বলবো সুরের অভাব। অথচ কিপলিঙের কবিতা সম্বন্ধে এলিঅটের কোনো অভাববোধও নেই—কিপলিং কবিতা লিখতে

গিয়ে পদ্য লিখেছেন তা নয়, পদ্য লিখতেই চেয়েছেন, যা করতে চেয়েছেন তা করতে পেরেছেন খুব ভালো ক'রেই, তাঁর পদ্য যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, কবিতা দিয়ে তা হ'তো না, কবিতা লিখতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্টই হতেন তিনি। কিপলিঙের প্রতি যথাসম্ভব সুবিচার করেছেন এলিঅট, কিন্তু কবি ব'লে যে তাঁকে স্বীকার করেননি, এইটেই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য কথা। কিপলিং কবি হ'তে চেষ্টা করেননি, না-ক'রেই ভালো করেছেন, এটাই তো সব কথা নয়—সাহিত্যের চরম মূল্য-নিরূপণে এ-কথাটাও বিবেচ্য যে পদ্য-সাংবাদিকের চাইতে কবির আসন উঁচুতে কিনা। কবির প্রধান গুণ তাঁর সর্বজনীনতা, তাঁর চিরন্তনতা। কিন্তু কিপলিঙের ভাগ্যে যত ভালো সমালোচনাই জুটুক, তাঁর রচনার সমাদর সর্বদেশে কখনো হবে না—বাধা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অচেতন দুর্নীতি, বাধা তাঁর স্ল্যাঙ্গ-কণ্টকিত ইংরেজি। কিন্তু এলিঅট দুর্বলের পক্ষ নিতে ভালোবাসেন: আশা করা যায় অধুনা-অবহেলিত বায়রনকে তিনি অচিরে এমনি সুচারুরূপে নতুন ক'রে লোকচক্ষে তুলে ধরবেন।

আর্টের মূল্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি। যার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি, যে ছলে দিচ্ছি, যে উপলক্ষে দিচ্ছি তার নাম আর্ট। আর্টের মূল্য কী? আর্টের মূল্য কতক তার নিজের, কতক আমার।

যেমন একখানা চিঠির মূল্য। প্রিয়ার চিঠি প্রিয়ার মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু যদি প্রিয়ার চিঠি না হয়ে অপ্রিয়ার চিঠি হতো তা হলেও তার একটা মূল্য থাকত। চিঠি হিসাবে। সেটা তার নিজের মূল্য।

আর্টের মূল্য কতক তার নিজের। যেহেতু সে আর্ট। কতক আর্টিস্টের। যেহেতু তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এ ছাড়া আরো এক মূল্য আছে। বিষয়ের। বিষয়বস্তুর। চিঠি এলে প্রথমেই মনে জাগে, কে লিখেছে? তার পরে কথা ওঠে, কী লিখেছে? প্রিয়জনের চিঠিতে যদি কিছু নাও থাকে তবু তা মূল্যবান, কিন্তু কিছু থাকলে আরো মূল্যবান। জানতে ইচ্ছা করে কেমন আছে, কী করছে, কবে দেখা হবে? তেমনি প্রিয় লেখকের নতুন বই দেখলে পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে, কী বিষয়ে লেখা, বিষয়ের দিক থেকে মূল্যবান কি না। সাধারণত আমরা ধরে নিই, নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু শেষ করবার পর নিরাশ হয়ে বলি, কই, কী এমন ভালো। কিম্বা নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, ভালোই হয়েছে। কিম্বা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, আগের খানার চেয়েও ভালো।

আর্টের মূল্য তা হলে তিন দফা। এক, তার নিজের। দুই, তার রচয়িতার। তিন, তার বিষয়ের। লাইব্রেরীতে যখন এক রাশ বই হাতের কাছে পাই তখন আমরা একখানা টেনে নিই তার লেখকের নাম দেখে, যেমন রবীন্দ্রনাথের। একখানা পেড়ে নিই তার বিষয়ের আকর্ষণে, যেমন স্বপ্নের ফলাফল। এবং যদি সুরসিক হয়ে থাকি তো একখানা বইয়ের খোঁজ করি নিছক আর্টের খাতিরে। যেমন "বীরবলের হালখাতা।" সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক রচনা আছে যার আদি

অন্ত সুভাষিত। আমরা তাদের স্বাদ নিই লেখকের খাতিরে নয়, কারণ লেখক অনামা। বিষয়ের খাতিরে নয়, কারণ বিষয় মরচে ধরা। আর্টের খাতিরে। অর্থাৎ কে বলেছে তার জন্যে নয়, কী বলেছে তার জন্যে নয়, কেমন করে বলেছে তারই জন্যে।

সোনায় সোহাগা হয় যদি কেমন করে বলেছে'র সঙ্গে কী বলেছে'র সঙ্গম হয়। তার সঙ্গে যদি কে বলেছে যোগ দেয় তো ত্রিবেণী সঙ্গম। কিন্তু এ রকম সার্থক রচনা জগতে খুব বেশী নেই। সেইজন্যে শেক্‌স্‌পীয়ারের এত দর। আমাদের দেশে কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য এঁদের সব রচনা সমান সার্থক বা সমান অমূল্য নয়। কিন্তু কোন কোন রচনা সার্থক বা অমূল্য তা বিচার করা সহজ হয় যদি মনে রাখি কেমন করে বলেছেন, কী বলেছেন, কে বলেছেন।

কে বলেছেন, এর মধ্যে একটু কথা আছে। মলাটের উপর যদি লেখা না থাকে তো লেখকের নাম উদ্ধার করা শক্ত। ছেলেবেলায় এমন অনেক বই আমার চোখে পড়েছে যেগুলির মলাট ছেঁড়া ও ভিতরের কয়েক পৃষ্ঠা নেই। প্রাচীন পুঁথির যেখানে ভণিতা আছে সেখানে নাম পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে ভণিতার অভাব সেখানে লেখকের নাম অজ্ঞাত। ছবিতে স্বাক্ষর করার প্রথা সেকালে ছিল না, এ কালে সকলে মানেন না। মন্দির মসজিদের গায়ে রাজরাজড়ার নাম খোদাই থাকতে পারে, কারিগরের নাম থাকে না। ভাস্কর্য্যের কোনো কোনো স্থলে উৎকীর্ণ লিপি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাস্করের নাম নয়।

তা হলে কে বলেছেন বা এঁকেছেন বা গড়েছেন কেমন করে জানব? জানব মন দিয়ে পড়ে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে, সত্তা দিয়ে অনুভব করে। নাম হয়তো জানব না। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ নামটা একটা লেবেল ছাড়া কী! লেবেল উঠে গেলেও যে যার জিনিস চিনে নিতে পারে। তেমনি অজন্তার গুহাচিত্র দেখে চিনতে পারি, যদি যত্ন করি, কে কোনখানা এঁকেছেন। নাম জানিনে, কিন্তু যে কোনো নাম কল্পনা করতে পারি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপালেই হলো।

নীচে স্বাক্ষর না থাকলেও যে কোনো অর্ব্বাচীন দর্শক যামনী রায়ের ছবির সঙ্গে নন্দলাল বসুর ছবির তফাৎ ধরতে পারবে। নাম যদি না জানে তো কল্পনা করবে, এখানা পাঁচকড়ি বাবুর, ওখানা তিনকড়ি বাবুর। আমার নাম ও বুদ্ধদেববাবুর নাম যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলেও আমাদের লেখায় এমন কোনো গভীর পার্থক্য থাকবেই যার থেকে আন্দাজ হবে আমার নাম উদো, ওঁর নাম বুধো।

অত কথায় কাজ কী, শেক্‌স্‌পীয়ার যে বেকনের ছদ্মনাম, নাটকগুলি যে বেকনের কীর্ত্তি, এখনো এ ধারণা খাস ইংলণ্ড থেকে যায়নি। সুতরাং নিজ নামে লিখলেও নিস্তার নেই। বৌদ্ধরা হয়তো একদিন দাবী করবেন যে অন্নদাশঙ্কর হচ্ছে বুদ্ধদেবেরই অষ্টোত্তর শত নামের এক নাম। ভরসা এই যে বোদ্ধারা সে দাবী নাকচ করবেন।

কিন্তু যে কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই সেটা এই যে আর্টের ভিতরেই আর্টিস্টের সত্যিকার পরিচয় অদৃশ্য থাকে, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে আবিষ্কার করতে পারে। প্রিয়জন যদি টাইপরাইটারে চিঠি লেখেন ও নীচে নাম সই করতে ভুলে যান তা হলে কি আমরা ও চিঠি আর কারো চিঠি বলে ভুল করি? সে ক্ষেত্রে আমরা অভ্রান্ত। প্রত্যেকটি বাক্যের ও শব্দের যোজনায় প্রিয়জনের পরিচিত মুখ নতুন করে দেখতে পাই। তেমনি আর্টের বেলা। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা যদি অন্য কোনো নামে প্রচারিত হয় তা হলেও আমার চিনতে ভুল হবে না কে লিখেছেন। কবি তাঁর অদৃশ্য পরিচয় চির কালের মতো রেখে গেছেন তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখায়। হয়তো তাঁর নামটা লোকে ভুলে যাবে, বা ভুল করবে। বলবে ভানুসিংহ বা নিবারণ চক্রবর্ত্তী। কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে ভুল করতে পারে না, ভোলবার নয়।

আর্টকে মূল্যবান করে আর্টিস্টের প্রচ্ছন্ন পরিচয়। মহাশিল্পীরা সে পরিচয় আরো প্রচ্ছন্ন করেন, তাঁদের কাছে তাঁদের নিজেদের দাম কানা কড়ি। তাঁরা যা দিতে চান তাকেই দাম দেন সব চেয়ে বেশী। কী দিচ্ছেন তারই উপর এত জোর দেন যে কেমন করে দিচ্ছেন তাও

ভাবেন না। তাঁদের রচনায় আর্ট যদি থাকে তো অনিচ্ছাকৃত বা অযত্নসম্ভব। অথচ সে আর্ট সজ্ঞান শিল্পীর অসাধ্য। যাঁরা দু'বেলা 'আর্ট' 'আর্ট' করেন তাঁরাই যে সেরা আর্টিস্ট তা নয়। সেরা আর্টিস্টদের মুখে কথা নেই, তাঁরা ইজম আওড়ান না, তাঁদের একাগ্র অভিনিবেশ বিষয়ের উপর। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের ভিতরে যে আর্টিস্ট থাকে সে আর্টের প্রতিও তীব্র দৃষ্টি রাখে। তাঁরা যেমন তেমন করে লেখেন না, আঁকেন না, গড়েন না। কেমন করে লেখেন বা আঁকেন তা হয়তো তাঁদেরও অজ্ঞাত, কিন্তু আমরা যখন পড়ি বা দেখি তখন বুঝতে পারি সেটাও আছে এবং সেটাও দামী।

কেমন করে লিখব এটা অনেক সময় কী লিখব'র থেকে অভিন্ন। বিষয় অনুসারে লেখার ধরণ ধারণ বদলায়। প্রত্যেক বারেই ভেবে নিতে হয় কেমন করে লিখব, কেমন করে লিখলে ঠিক লেখাটি ওৎরাবে, ঠিক সুরটি বাজবে, ঠিক ছবিটি ফুটবে, ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হবে। যাঁরা ওস্তাদ লিখিয়ে তাঁদের অত ভাবতে হয় না, তাঁদের অজ্ঞাতসারে আর একজন ভাবে, সে তাঁদের ভিতরের আর্টিস্ট। তাঁরা তাঁদের সবটা মনোযোগ দেন বিষয়ের উপরে। কী লিখব'র উপরে। কেমন করে লিখব'র দিকে নজর আর একজনের। কিন্তু আমার ভিতরের মানুষ যদি না ভাবে তো আমাকেই ভাবতে হয়। তাতে আমার বিষয়-বিভোরতা ব্যাহত হয়। ধ্যানীর পক্ষে ধ্যানহানি প্রায় প্রাণহানির মতোই দুঃখকর। সেইজন্যে আমি আঙ্গিকের কথা একেবারেই মনে আনতে চাইনে। অথচ ওর প্রয়োজন মানি।

একটু বয়স হলে, হাত পাকলে, আত্মবিশ্বাস জন্মালে অন্যান্য সাধকের মতো শিল্পীরও স্মরণীয় শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন সাধকও তেমনি বিষয়ে মগ্ন। বিষয় অবশ্য ধনসম্পদ নয়। বিষয় হচ্ছে যা দেবার। যা না দিয়ে আমার নিষ্কৃতি নেই, যা দিতে আমি এসেছি। কে কী দিতে এসেছে তা অপরের অজানা, হয়তো তার নিজেরই না-জানা। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতার যেমন নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রত্যেক

লেখকেরও তেমনি। জীবনদেবতার নির্দ্দেশ। তিনিই প্রম্পট্ করেন। আমরা ইতস্তত পরীক্ষা করতে করতে যে যার বিষয় পেয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে যার তার ফরমাস খাটে না। তবে পরের ফরমাসও অনেক সময় সোনার কাটির কাজ করে। তার পরশ লেগে আমাদের ঘুম ভাঙে, আমরা আত্মস্থ হই, আপনাকে চিনি, আপনার পাঠ বুঝে নিই। পরের ফরমাস খাটতে গিয়ে ঘরের কাজ করি। যা দেবার তা প্রথমে জানি, তার পরে দিই।

তিন দফা মূল্যের কথা হলো। এবার কাঞ্চন মূল্য। কাঞ্চনমূল্য আর্টের নয়, কারণ আর্ট হচ্ছে বিশুদ্ধ দান। কাঞ্চনমূল্য ছাপা কাগজের, কাঞ্চনমূল্য বহুজনের শ্রমের। আর্টিস্ট তার পাওনাহিসাবে যেটুকু পায় সেটুকু যে কোনো শ্রমিকের পাওনা। কারো কম, কারো বেশী।

সমালোচনা

THE MOVING FINGER (Anthology of Essays in literary and aesthetic criticism by Indian writers)—Ed. V. N. Bhusan: Padma Publications, Bombay.

ভারতীয় লেখকরা ইংরেজি ভাষায় নানাধরনের যে সাহিত্য রচনা করেছেন তার চারটি সংকলন বেরোচ্ছে বোম্বায়ের পদ্ম পবলিকেশনস থেকে। সংকলনকর্তা বিজাপুর কলেজের অধ্যাপক ভি. এন. ভুষণ। প্রথম সংকলনগ্রন্থটি ছিল কবিতার; দ্বিতীয়টিতে আছে সাহিত্য আলোচনা। এর পরে বেরোবে ছোটোগল্প এবং নাটকের দুখানা সংকলন গ্রন্থ।

আলোচ্য গ্রন্থের গোড়াতে মুখপত্র ও ভূমিকা গোছের দুটি প্রবন্ধ আছে। তারপরে আছে বিভিন্ন লেখকের সতেরোটি প্রবন্ধ। প্রত্যেক লেখক সম্বন্ধে একটি ক'রে নাতিহ্রস্ব পরিচয়-বিজ্ঞপ্তি আছে,—এগুলো সম্পাদক মহাশয়ের নিজের লেখা, বাক্‌পুষ্পের অত্যধিক ছড়াছড়ি লক্ষ্য করলাম। সর্বশেষে একটি রচনাপঞ্জীতে বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। পঞ্জীটি অসম্পূর্ণ। গুটিকয়েক মূল্যবান গবেষণার উল্লেখ এতে নেই, যথা, জে. সি. ঘোষ সম্পাদিত টমাস অটওয়ের নাটক; অধ্যাপক তারকনাথ সেনের লেখা হ্যামলেট সম্বন্ধে প্রবন্ধ। এই অনুল্লেখের জন্য সম্পাদককে বেশি দায়ী করা যায় না। প্রথম পঞ্জীতে ত্রুটি সচরাচর থেকেই যায়, তাছাড়া, তিনি ভূমিকাতে বলেছেন যে বারংবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি লেখকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাননি। প্রাথমিক উদ্যমের দরুন যতখানি প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য তা দেবার পরেও বলতে হয় যে পঞ্জীসংগ্রহের মতো কঠিন কাজটি যাতে অতঃপর নির্দোষ হয় সে-বিষয়ে তিনি যেন অবহিত হন।

পঞ্জীটিতে আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতদের বালসুলভ খ্যাতিস্পৃহা লক্ষ্য করলাম। নতুবা নির্মলকুমার সিদ্ধান্তর মতো সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কেন একটি বেতার কথিকাকেও মৌলিক গবেষণা-পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করবেন, এবং অন্য কেউ-কেউ অপ্রকাশিত (সম্ভবত কোনোকালেই যা প্রকাশিত হবে না) নিবন্ধের উল্লেখ করবেন! অন্য কতকগুলো প্রবন্ধের নাম এবং প্রকাশস্থল লক্ষ্য করে' ধারণা হচ্ছে, এগুলো কলেজ ম্যাগাজিনে আদৃত নিতান্তই অমৌলিক রচনা। ইংরেজি সাহিত্য

৮

আলোচনায় ভারতীয়দের দান উপেক্ষণীয় নয় প্রমাণ করতে হ'লে আমাদের পাণ্ডিত্যের আদর্শ আরো উঁচু করতে হবে। যে সতেরোটি প্রবন্ধের সমাবেশ এই গ্রন্থে হয়েছে তার কয়েকটি পড়েও ঐ একই ধারণা হ'ল। কোনো কোনো প্রবন্ধকে post-graduate classএর ভালো ছেলের মামুলি টিউটরিয়েল প্রবন্ধের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দর প্রবন্ধ দুটিকে এই সমাবেশে জুড়ে দেয়াতে তাঁদের সম্মান বাড়েনি, যদিচ অন্য লেখকদের বেড়েছে।

ইংরেজি ভাষার—তথা, যে-কোনো বিদেশী ভাষার, মারফৎ মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করা আলেয়া-সন্ধানের মতোই নিরর্থক, বাঙালী অন্তত এ কথা বুঝেছে গত শতাব্দীতেই। তবে বিদেশী সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব এবং কতকাংশে কাম্য, কারণ এহেন আলোচনা-দ্বারা আমাদের নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা উজ্জ্বলতর হ'তে পারে। সংকলনগ্রন্থটিতে কয়েকটি বাস্তবিকই উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, সেগুলিকে জানবার সুযোগ দিয়েছেন বলে সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রশংসাভাজন।

অমলেন্দু বসু

১৩৫১-র সেরা কবিতা, গোপাল ভৌমিক সম্পাদিত।

বেঙ্গল পাব্লিশার্স। দু' টাকা।

চুয়াল্লিশ জন লেখকের ৪৪টি কবিতার সংগ্রহ। বাংলা ভাষায় যদি এক বছরে ৪৪টি 'সেরা' কবিতা লেখা হ'য়ে থাকে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কী হ'তে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এর মধ্যে অনেকগুলি 'সেরা' তো নয়ই, এমনকি কবিতাও নয়। বইটিতে নতুন লেখকের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়লো; তাঁদের আধো-আধো বাধো-বাধো রচনার স্থান সাময়িক পত্রে মাঝে-মাঝে হ'তে পারে, কিন্তু সংকলন-গ্রন্থে তাঁদের স্থান দিতে গেলে বইয়ের মর্যাদা নষ্ট হয়—এবং একটি দুটি ভালো কবিতা যদি বা থাকে—তাদের সম্মান রক্ষা হয় না। সত্যি যে-ক'টি ভালো কবিতা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি একত্র করতে পারলে তবেই এ-ধরনের সংকলন সার্থক হ'তে পারে। কিন্তু একজন কবির একটির বেশি কবিতা নেয়াই হবে না, এবং যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক লেখক নেয়া হবে, এইরকম প্রতিজ্ঞা করলে বইয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সম্পাদক আর-একটি ভুল করেছেন: কবিতার সন্ধান করেছেন শুধু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়, কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে কোনো কবি হয়তো সাময়িক পত্রে বেশি প্রকাশ না-ক'রে বই বের করেছেন—'১৩৫১ সালে গেছে বাংলা সাহিত্যে কবিতার দুর্ভিক্ষ'—এ-কথা বলবার আগে আরো বিশদভাবে খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো।

সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলার কবিরা যে আজ 'সমাজ-বিমুখতার মারাত্মক পথ ত্যাগ ক'রে সমাজমুখী' হ'য়ে উঠেছেন, এটা 'সুখের কথা'। 'সমাজবিমুখ' 'সমাজমুখী', এ-সব কথা অস্পষ্ট। যাই হোক, সম্পাদকের পরিভাষা ব্যবহার ক'রেই জিগেস করি যে আমাদের আধুনিক কবিরা যখন

'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দুর্বোধ সমাজবিমুখ' ছিলেন, তখন তাঁরা যা লিখেছেন তার সঙ্গে কি কোনো তুলনা হয় তাঁদের এখনকার 'সমাজমুখী' রচনার? দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই গ্রন্থেরই অন্তর্গত সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা দুটি প'ড়ে কি এ-কথা মনেও আনা সম্ভব যে এঁরাই 'কয়েকটি কবিতা' ও 'পদাতিকে'র লেখক? আর 'সমাজমুখিতা'র মন্ত্র নিয়ে যে-সব তরুণতররা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা ছন্দ ভাঙেন ছন্দ ঠিক রাখতে পারেন না ব'লে, মিল দেন না মিল জোগায় না ব'লে, কিষাণ-মজুরের কথা লেখেন রচনা ছাপাবার সুবিধে হবে ব'লে, আর কবিতা কেন লেখেন তাঁরাই জানেন। 'দেশের মাটি' 'নতুন জীবনাদর্শ' 'সমাজবোধ' ইত্যাদি কুকথার কুহেলিকায় এ-ধরনের অক্ষমতাকে সমর্থন করা ঠিক না: এটাই মারাত্মক।

বইটিতে বিষ্ণু দে-র বর্জন অমার্জনীয়।

অতসী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল পাব্লিশার্স। দেড় টাকা

আমি অনেক সময় অনুভব করেছি যে এক ধরনের ছোটোগল্প আছে, যা গল্পের আকারে ঠিক লেখা যায় না, গদ্য-কবিতা (কিংবা গদ্য-ভঙ্গির পদ্য) যার শ্রেষ্ঠ বাহন—শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, একমাত্র। 'পুনশ্চ' 'পরিশেষে'র রচনাগুলিতে যে-গল্পাংশ আছে তা গদ্য-গল্পে বলা যেতো না, 'কথা ও কাহিনীর' মতো বিচিত্র ছন্দোবন্ধনেও না, ঐ গল্প, ঐ বিষয় ঠিক ঐ রূপকল্পেরই প্রত্যাশায় ছিলো। গদ্য-কবিতার সার্থকতা এইখানেই। একই কবিতা গদ্যে এবং পদ্যে লেখা যায় না তা নয় (রবীন্দ্রনাথ নিজে তা করেছেন), কিন্তু মোটের উপর এ-কথাটাই স্বীকার্য যে গদ্যকবিতা পদ্যের একটা রকমফের মাত্র নয়, তা একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র রূপ, নিজস্ব নিয়মে পরিচালিত, এবং এক ধরনের ছোটো সুতীক্ষ্ণ গল্পের—সবচেয়ে বেশি আধুনিক জীবনের গল্পের—একমাত্র বাহন।

এই কথাটি সাবিত্রীবাবু যে উপলব্ধি করেছেন, 'অতসী' তার প্রমাণ। বইয়ের দশটি রচনার মধ্যে একটি ছাড়া সবই গদ্য-কবিতা, আর সব ক'টি কবিতাই গাঁথা হয়েছে এক-একটি কাহিনীর সূত্র নিয়ে। আধুনিক বাঙালি জীবনে বিবিধ সামাজিক অবিচার কবির বুকে বিঁধেছে, কবিতাগুলি সেই বেদনারই ব্যঞ্জনা। খুব ভালো লাগলো মেয়েদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ—বইটিতে যে-সব চরিত্রের আনাগোনা, তার মধ্যে মেয়েরাই স্পষ্ট ও সজীব। সাবিত্রীবাবু গদ্যের ছন্দকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হ'তে দেননি, ভাষায় যথোচিত শালীনতা রক্ষা করেছেন, কিন্তু 'সাথে' 'সদা' প্রভৃতি কয়েকটি 'শুধু পদ্যে ব্যবহৃত' কথা ব্যবহার ক'রে মাঝে-মাঝে তিনি সুরভঙ্গ করেছেন এ-কথা বলতেই হয়।

হিন্দু সংগীত। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। আট আনা।

৪৬ পৃষ্ঠার বইটি তিনটি প্রবন্ধে বিভক্ত: 'সংগীত পরিচয়', 'হিন্দু সংগীত' ও 'সুরের কথা'। প্রথমটির লেখক শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, অন্য দুটির শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, 'হিন্দুসংগীত' স্বনামে ও 'সুরের কথা' বীরবল ছদ্মনামে। ইন্দিরা দেবী বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীতের—অন্তত প্রথম যুগের রবীন্দ্র-

সংগীতের—সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার, সংগীতের—অন্যান্য শাখাতেও তাঁর অভিজ্ঞতা গভীর। 'সংগীত-পরিচয়' প্রবন্ধটি অ-দীক্ষিত সাধারণ লোকের জন্যই তিনি লিখেছেন, নিতান্ত প্রাথমিক কয়েকটি কথাতেই তাই আলোচনা আবদ্ধ—পাঠকের মন যখন বিষয়টি নিয়ে বেশ উৎসাহিত হ'য়ে উঠবে, ঠিক তখনই প্রবন্ধ শেষ হ'লো।, কিন্তু এই উৎসাহটুকু জাগিয়ে দেয়াই হয়তো ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যা-গ্রন্থমালার স্বল্প পরিসরে এর বেশি সম্ভবও না। প্রবন্ধটির প্রধান গুণ এই যে তা সহজেই পড়া যায়, পরিভাষার আড়ষ্টতা নেই, পাণ্ডিত্যের কণ্টক নেই, সমস্ত লেখাটির মধ্যে একটি সরল স্নিগ্ধতা প্রতিভাত হয়েছে। আশা করি ইন্দিরা দেবী সংগীত সম্বন্ধে আরো লিখবেন, এই প্রবন্ধ যার ভূমিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সংগীতের বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু বিশেষ অনুরক্ত, বিশেষত মার্গ সংগীতের। 'হিন্দুসংগীত' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'যদি এদেশে কোনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংগীত থাকে, আমার মতে সে হচ্ছে ঐ পূর্ব্বোক্ত মার্গ সংগীত।' এই সংগীতের বিবিধ লক্ষণ নিয়ে তিনি তাঁর আপন অতুলনীয় ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন—এবং বর্তমানে এ-সংগীত যে 'ঝিমিয়ে পড়েছে' তার কারণ, তাঁর মতে, 'শ্রোতাদের আলস্য ও গায়ক-বাদকদের ব্যায়াম।' তাই ব'লে 'ওস্তাদীর আফিং ছাড়াবার উদ্দেশে বিলাতী সংগীতের মদ ধরাবার' পক্ষপাতী তিনি নন। এ-প্রসঙ্গে এ-প্রশ্ন ওঠে যে মার্গসংগীত তো একটা স্থানু পদার্থ নয়, অন্যান্য শিল্পকলার মতো তারও পরিবর্তন ও বিবর্তনের ইতিহাস আছে নিশ্চয়ই—এবং আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সম্প্রতি চিত্রকলায় যে একটি নিত্য আন্দোলনের স্পন্দন লক্ষিত হয়, আমাদের মার্গসংগীতে কি তার কোনো আভাস এসেছে? যদি এসে থাকে সেটা কি দোষের? যদি না এসে থাকে, সেটা কি ভালো?

বীরবলের প্রবন্ধটিতে দেশী-বিলাতি সংগীতের প্রভেদ-নির্ণয় প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে বইটি সুসম্পূর্ণ হ'তো। আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রসিদ্ধতম যুগল সংগীত বিষয়ে আরো আলোচনা যদি করেন, তাতে আমাদের সাহিত্য ও সংগীত উভয়েরই লাভ।

প্রাপ্ত

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

এই খণ্ডে আছে: বীথিকা, শেষ রক্ষা, গল্পগুচ্ছ, জাপানযাত্রী, যাত্রী—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, জাভাযাত্রী পত্র। ৫৲, ৭৲, ৮৲ ও ১০৲।

প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা : অমিয়নাথ সান্যাল। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। ॥০

কীর্তন : খগেন্দ্রনাথ মিত্র। " " "

ভারতীয় সাধনার ঐক্য : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। " " "

The Book of Beneficent Grief & other Poems : Serapia Devi R. 1/8/-

ভারতের মুক্তিসাধক ; গোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৷৷০

সম্পাদকীয়

সরলা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা, স্বনামধন্যা সরলা দেবীর মৃত্যুতে বাংলা দেশের একটি যুগ যেন শেষ হ'লো। ঠাকুর-বংশের প্রতিভার যে-শিখা অন্তরে নিয়ে সরলা দেবী জন্মেছিলেন, ৭৩ বছরের জীবনে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি—সাহিত্যে, সংগীতে, সাংবাদিকতায়, দেশপ্রেমে, নারী-আন্দোলনে, জীবনের বিবিধ বিচিত্র ক্ষেত্রে নির্ভীক প্রাচুর্যে নিজেকে তিনি দান ক'রে গেলেন। তাঁর তরুণ প্রাণকে নানাদিকে উদ্বোধিত ও বিকশিত করবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ছিলো, পিতা জানকীনাথ ঘোষাল সে-যুগের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা, স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী পঞ্জাবের আর্য-সমাজের অন্যতম কর্মবীর, আর মাতুলালয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব তো ছিলোই। সতেরো বছর বয়সে বি. এ. পাশ করবার পর থেকেই সরলা দেবীর কর্ম-জীবন আরম্ভ হয়; স্বদেশী যুগের উদ্দীপনায় মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন, বারো বছর ধ'রে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করলেন (তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' লেখেন) জালিয়ানওয়ালা-বাগের খবর তিনিই রবীন্দ্রনাথকে জানান, এবং সে-সময়ে পণ্ডিত রামভুজের 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার পরিচালনায় তিনি ছিলেন স্বামীর দক্ষিণ হস্ত। বীরাষ্টমী উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের স্থাপন, রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে অ্যাম্বুলেন্স কোর পাঠাবার জন্য আন্দোলন—এ-সমস্ত ক'রেও তাঁর কর্মশক্তি আরো উদ্বৃত্ত থাকতো—মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিরন্তর ছিলো তাঁর চেষ্টা, কাব্যে ও সাহিত্যে ছিলো অক্লান্ত আগ্রহ, বাংলায় ইংরেজিতে অজস্র লিখেছেন, তাঁর 'অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণী' গানটি বাংলা স্বদেশী সংগীতের স্বর্ণ-ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন, শেষ জীবন পর্যন্ত স্বদেশের ও স্ত্রীজাতির কল্যাণে তাঁর উৎসাহ ছিলো সতেজ। এই মনস্বিনী বাংলা দেশকে যা দিয়ে গেলেন, তা চিরকাল বাংলা দেশের রইলো, কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত দীপক চৌধুরী যা হারালেন, তার কোনো সান্ত্বনা নেই, সে ক্ষতি তাঁর একলার।

ইন্দিরা দেবীকে সম্মান

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণ-পদকে সম্মানিত করা হয়েছে। এই পদক প্রত্যেক তিন বছর অন্তর বাংলা ভাষায় মৌল' রচনার জন্য মহিলাদের দেয়া হয়। মানকুমারী বসু, নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী ইতিপূর্বে এ-সম্মান লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদকগুলির মধ্যে কেমন একটা নীরক্ত পাংশুতা আছে, সাহিত্যিক সমাজে কোনো উৎসাহই এতে জাগে না। তবু ইন্দিরা দেবীর সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত হয়েছি, তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

পল ভালেরি

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাশি কবি পল ভালেরি-র ৭৪ বছর বয়সে প্যারিসে মৃত্যু হয়েছে। ১৯২৫-এ ফরাশি আকাদেমি বা অমর-মণ্ডলে আনাতোল ফ্রাঁসের শূন্য স্থানটিতে তিনি বৃত হন—সকলেই জানেন কোনো ফরাশি লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো সম্মান কিছু হ'তে পারে না। শাখা-সমুদ্রের ওপারে ইংলণ্ডেও তাঁর প্রভাব বিকীর্ণ হয়েছিলো, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের মতো ভালেরিকেও অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁদের সম্মান-সূচক ডক্টর উপাধি অর্পণ ক'রে। 'কবিতা'র আগামী সংখ্যায় এই কবির বিষয়ে একটি আলোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো।

'কবিতা'র নতুন বছর

'কবিতা'র একাদশ বর্ষ আরম্ভ হ'লো। এই উপলক্ষ্যে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, যাঁরা প্রথম বছর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক আছেন, আর নতুন যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন ও হচ্ছেন তাঁদেরও অভ্যর্থনা করি। এই সংখ্যার দৃশ্য রূপে ও আন্তরিক বস্তুতে কিছু নূতনত্ব লক্ষিত হবে—এখন থেকে সাধারণভাবে সাহিত্য-কলার ও বিশেষভাবে কাব্যকলার বিচিত্র বহুমুখী আলোচনা হবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনে পাঠকদের সহযোগ কামনা করি। 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো আলোচনা সম্বন্ধে কোনো কথা যদি তাঁদের মনে হয়, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যকলার যে-কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু যদি বক্তব্য থাকে, তাহ'লে সে-সব মন্তব্য যথাসাধ্য সুসংবদ্ধ সংক্ষিপ্তরূপে পত্রাকারে লিখে পাঠালে আমরা প্রকাশ করতে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকবো। যেখানে নানাদিক থেকে নানারকম আলোচনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের মনের নাড়িতে-নাড়িতে চিন্তার স্রোত স্বাধীন ও সতেজভাবে প্রবাহিত হ'তে পারে, 'কবিতা'র আতিথ্যে সেখানে কৃপণতা হবে না।

কবিতা

একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]   পৌষ, ১৩৫২   [ক্রমিক সংখ্যা ৪৮

শাশ্বত পুরুষ নারী

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অবশেষে চিনিলে তো মোরে,
আমিও তো চিনিনু তোমায়!
সেই কত শতাব্দীর আগে দোঁহে দেখা,
আবার সাক্ষাৎ আজি
বিংশ শতাব্দীর এই প্রখর আলোকে,
তবু তো চিনিলে মোরে—
আমি তব প্রধান কামনা!
তবুও তো চিনিনু তোমায়—
তুমি মোর শাশ্বত প্রেমদা তাই প্রথমা প্রেয়সী!

সেই কত শতাব্দীর আগে দোঁহে দেখা,
সেদিন পৃথিবী ছিল স্বপনে-লুলিত
আধ তন্দ্রাহারা আঁখি,
তুমিও তাহারি সাথে স্বপন-ললিতা
জেগেছিলে ধরাতলে—

স্বপ্নঘোরে ঘেরা ছিল তব তনু-লতা
সেই আধ ঘুমে সেই ঊষার কিনারে—
তুমি ছিলে উর্বশীর নিকট আত্মীয়া
স্বর্গ আর মর্ত্য-বিহারিণী
সেই দূর শতাব্দীর আধ ঘুমঘোরে।
ললিতা লুলিতা আর স্বপন-লালিতা
তুমি চ'লে যেতে সখি বাজায়ে শিঞ্জিনী
অলক্তকরাগরাঙা যুগল চরণে,
ছটি হাতে ঠিনিঠিনি কনক কঙ্কণ
কহিত সোহাগ ভরে কত কল-কথা (কিম্বা ছল-কথা যত)
মৃদু মধু অনুরাগে তরল স্পন্দনে,
শ্রোণি-ভারে দুলিত মেখলা, আহা, কটি বেড়ি' হাসিত কিঙ্কিণি,
আঁখির পল্লব ঘেরা উজ্জ্বল কজ্জলে,
কেশদামে সুরভিত ধূপের ধোঁয়ায়
অথবা দোদুল বেণী কুসুম-স্তবকে,
কেয়ূর কঙ্কণে পুন কানের কুন্তলে
তুমি ছিলে যেন সখি পটের প্রতিমা
সেই দূর শতাব্দীর আধ জাগরণে।
গৃহে গৃহে জ্বালি' দিতে তুমি সন্ধ্যাদীপ
গৃহের কল্যাণ লাগি' হে সর্ব-কল্যাণি।
অঙ্গনে তুলসী-তলে তুমি নিয়ে যেতে জ্বালি' সন্ধ্যার প্রদীপ
মঙ্গলে অহ্বান করি' হে নিত্যমঙ্গলা।
আধেক মানবী আর আধ স্বপ্নছবি
তুমি ছিলে সখি সেই দূর শতাব্দীর
আধ ঘুমঘোরে আর আধ-জাগরণে,
তবু চিনেছিনু তোমা—
তুমি মোর শাশ্বত প্রেমদা তাই প্রথমা প্রেয়সী,

তবু চিনেছিলে মোরে—আমি তব প্রধান কামনা,
জীবনের আমি তব প্রথমের আশা।
তারপর কতদিন কত কাল কত যুগ গত
আজি বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন প্রখর,
আধ-ঘুম-জাগরণ টুটে গেছে আজি ব্যস্ত কর্ম-কোলাহলে,
মুছে গেছে স্বপ্নলোক অলস সন্ধ্যার,
জ্যোৎস্না-যামিনী আর নাহি হাসে তেমন বিহ্বলা,
দিগন্তের পারে পারে নাহি ভাসে অপ্সরীর নূপুর-গুঞ্জন—
রূপকথা-লোক যেন নিয়েছে বিশ্রাম।
বিংশ শতাব্দীর এই বাস্তবের মাঝে
তুমিও এসেছ আজি নব বেশ পরি'
হে বহুবেশিনি!
তুমি আজি নাহি চলো নূপুরগুঞ্জনে সখি কটাক্ষে বিলোল,
পদযুগে লোহিত রঞ্জন,
তুমি না দোলাও আর দীর্ঘ বেণী পদযুগ-পরশ-প্রয়াসী
হে বব্-কুন্তলা!
শত ব্যস্ততার মাঝে তুমি আর নহ আজি গজেন্দ্র-গামিনী
হে নব কিশোরি!
পদযুগে বন্দী করি' চর্মে কিম্বা সাটিনে মখমলে
তুমি আজি দ্রুতগতি হে নব-চঞ্চলা!
(হায় কে জানিত আগে পশুচর্মে আছে ছন্দ গান!
হায় কে জানিত
রঙিন সাটিন কিম্বা কোমল মখমল
লজ্জা দেবে সরসী-কমলে!)
তুমি আজি ছবি নহ, নহ স্বপ্নময়ী;
তোমার কটাক্ষে আজি নাহি আর উর্বশীর স্বপ্নবিলাসিতা
তোমার চোখের দৃষ্টি সৃষ্টি নাহি করে আর স্বপ্ন-ব্যবধান।

তুমি এসে দাঁড়ায়েছ অতি সন্নিকটে আজি
সকল রহস্যাভাস দূরে পরিহরি',
তুমি আজি চলিয়াছ সাথে সাথে হাতে হাতে
মধ্যাহ্নের রাজপথে কর্কশ আলোকে—
তবু তো চিনিনু তোমা
তুমি মোর শাশ্বত প্রেমদা আর প্রথমা প্রেয়সী,
তবু তুমি আজি
কল্পনার সুখ মোর বাস্তবে আরাম !

তবুও এক-একবার মনে-মনে শুধাই তোমায়,
কভু কি পড়ে না মনে তব
তুমি ছিলে একদিন স্বপ্ননিবাসিনী
সঙ্গীতের মাঝে চির করিতে বিহার
উর্বশী-আত্মীয়া ?
মদালসা আঁখি আর লাস্যময় গতি
তুমি ছিলে একদিন সে-প্রথম বিস্ময়ের দিনে ?
নিঃশেষে কি ভুলিয়াছ—তুমি একদিন
ছন্দে-ছন্দে ভঙ্গে-ভঙ্গে চলে যেতে সখি
কনক-মঞ্জীর-ধ্বনি তুলিয়া তরল
শ্রোণিভারে দোলায়ে মেখলা ?
তোমার চরণ-চাপে ফুটিত প্রসূন,
তোমার আঁখির পাতে লুটিত দামিনী
দীর্ঘ-বেণী-দোলে তব করিত বিহার
'মিলনের আমন্ত্রণ নিত্য অনলস ?
দ্রবিত-হৃদয়া আর স্খলিত-চরণা

তুমি ছিলে যেন সখি লুলিত লতার মতো
সেই দূর শতাব্দীর প্রথম প্রণয়ে,
পূর্ণিমার স্ফীতবক্ষ বারিধির মতো
তুমি যেন ছিলে সখি অতীতে সে প্রথম মিলনে—
নিঃশেষে কি ভুলিয়াছ সে-সব কাহিনী ?
নিঃশেষে মুছিয়া সেই অতীতের পাতাগুলি হে বন্ধনহীনা
আজি তুমি আসিয়াছ ধরি' নব রূপ
হে বহুরূপিণি !
তবু ভোলো নাই—আমি তব প্রধান কামনা ;
তবু ভোলো নাই—
তুমি মোর শাশ্বত প্রেমদা তাই প্রথমা প্রেয়সী।
পুনর্বার আর কোনো অনাগত কালে
অন্য কোনো নব রূপ ধরি'আসি' উদিবে কল্যাণি !
তবু ভুলিবে না—
তুমি মোর শাশ্বত প্রেমদা আর প্রথমা প্রেয়সী,
তবু ভুলিবে না—আমি তব প্রধান কামনা,
সব চেয়ে আমি তব প্রথম আরাম !

তাই আজি নিঃসংশয়ে জানি ধ্রুব জানি
যুগে-যুগে মোদের মিলন—
এ-মিলন নহে শুধু দেহের কামনা,
নহে শুধু কাব্যের বিলাস,
কিম্বা নহে স্বপনের স্বর্ণ মায়ামৃগ
চির জীবনের এক ব্যর্থ মরুমায়া।

বহু ঊর্দ্ধলোকে, জানি, সত্য হ'য়ে আছে এই মিলনের রীতি
শাশ্বত প্রকৃতি আর অনাদি পুরুষে
যেথায় অচ্ছেদ্য মোরা আত্মার মিলনে
সেকালে একালে সর্বকালে।
আর ধ্রুব জানি
ওই চির-মিলনের যে পুলক জ্যোতি
তাহারি দু'এক রেখা ধরাতলে রূপ পায় :—
শরীরের কামনা-বিলাসে,
হৃদয়ের প্রেমের সঙ্গীতে,
মরমের স্বপন-রভসে !

পুনর্জন্ম

বিকাশ দাশ

নির্জন পল্লীর ধারে বেঁধেছিনু অনুরাগে স্বপ্ন-ঘেরা ঘর
মোর কাছে শাশ্বত সুন্দর !
আমার আঙিনাখানি,
দক্ষিণ-সাগর হ'তে পেয়ে কত কথাহীন বাণী
আপনি ভরিয়া যেত !
কত না পাখির সুর
দিবানিশি করিত মধুর,
কত না ফাল্গুন-প্রাতে পলাশের রাঙা শিহরণ—
অলস দুপুরে কত মৌমাছির প্রলাপগুঞ্জন,
কত না আশ্বিন
দূরান্তের নীলাকাশে আঁখি দুটি মেলিয়া রঙিন
প্রাণে দিত দোলা,
সে দুর্লভ চঞ্চলিত ক্ষণ
শরতের স্পর্শ-লাগা শিহরিত বন-উপবন।

কত সন্ধ্যা সচকিত চিরন্তন নাক্ষত্রিক গানে।
কত সুর বহি' আনে
উদাস সমীর
কাজল-দীঘির নীরে দোলা-লাগা চঞ্চল উর্ম্মির।
চাঁদ ওঠে, বাঁকা চাঁদ
শালবনে কানাকানি, কত কথা, কত না মর্ম্মর।
অনুরাগে বেঁধেছিনু ঘর,—
নির্জন পল্লীর ধারে ছায়াঘেরা শাশ্বত সুন্দর।

বেলাশেষে মোর খোলা বাতায়নে আসি,'
বাজাতেম বাঁশি।
সুরে ছন্দে স্বপ্নে গানে প্রাণে পেত অলস প্রহর।—
একদিন তারপর,
ঝিমানো মন্থর
মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত সরণিরে করিয়া শঙ্কিত
এল আচম্বিত
শাণিত ক্ষুধার প্রশ্ন মুখে নিয়ে বুভুক্ষু মিছিল।

অবশেষে,
পাখী হ'ল কণ্ঠহারা, সুর এল থেমে।
তোলে না মর্ম্মর কোনো বনসভা রাত্রে কি দুপুরে
উল্লাসী ফাল্গুন গেল দূরে।
ফসলের মাঠে শুনি বন্ধ্যা মৃত্তিকার
মর্ম্মভেদী রুদ্র হাহাকার!
রজনীর বাসর শয্যায়
চাঁদের কুমারী মেয়ে মুখ ঢাকে অক্ষম লজ্জায়।
করিতে পারে না গান, তুলিতে পারে না কোনো সুর
আগের মতন কারো হৃদয় কি করে ভরপূর?

হারাল ঝাউয়ের বন সেদিন মর্ম্মর,
ভেঙে গেল ঘর।
মানুষের অত্যাচার মানুষেরে করিল ভিখারী
মানুষ ঠেলিয়া দিল মানুষেরে পথে
ঘর ভেঙে দিল তার
নিবায়ে সেঁজুতিখানি গৃহদ্বারে আনিল আঁধার।
মুখ হ'তে কাড়ি' নিল গ্রাস,—

সেই গ্রাসে পরিপুষ্ট অত্যাচারী রচিল উল্লাস।
অট্টহাসে রঙ্গভরে মানুষের বস্ত্র নিল কাড়ি',
সকাতরে মৃত্যু ডাকে শঙ্কিত লুণ্ঠিত নরনারী।
তাই মোর পুরাতন গান হ'ল শেষ
কোনো স্বপ্ন, কোনো সুর প্রভাত-সন্ধ্যার
নাহি আর, নাহি আর।

আজ আমি শুধু দিন গুনি
বিধাতার রুদ্র রোষে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনি।
আমি শুধু অনাগত দিবসের স্বপ্ন দেখে যাই
মানুষের অত্যাচার ভস্মীভূত বিপ্লবী চিতায়!
পৃথিবীর পুনর্জন্ম হবে
দেখা দেবে ম্লান মুখে হাসি,
করে যাবে সচকিত গ্রামপথ রাখালিয়া বাঁশি।
তারপর,
পুনর্বার বাঁধি' মোর ঘর
ফাল্গুনে শুনিব বসি' বনানীর আনন্দ মর্ম্মর!

২

শকুন্তলার মৃত্যু

হরিধন বসু

উইমেন্স্‌ কলেজে পড়ো তুমি,
ট্রামে চ'ড়ে রোজ আসো যাও।
হাতে হয়তো কেবল
কঠিন মলাটে-বাঁধা খাতা।
কিম্বা, আরো একখানা
রোগা-গোছের ইংরিজি বই।
নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরো,
কালো চুলের লম্বা বেণী পিঠের 'পরে।
আর, তারই প্রান্তে ফুটে আছে
একটি ছোটো ফিতের গোলাপ ফুল।
পায়ে জুতো,
আর, কব্জিতে দু-গাছ
সোনার চুড়ি গড়াগড়ি যায়
কী আহ্লাদে!
খটমট ক'রে চলো,—
ঘুমের মত নরম কালো চোখে—
আলগোছে পথ ছুঁয়ে।
এখন তো আর ছোট্ট মেয়েটি নও!—
আজকে তুমি বিশ্ব-বিজয়িনী।

কলেজে-পড়া কতো তরুণ-অরুণ ছেলের উপর
তোমার গোপন দৃষ্টির আতর ছিটাও!
কী মতলবে,—তুমিই জানো।
তরুণ প্রাণের স্বর্ণ-খাঁচায়

বন্দী ক'রে হয়তো পুষতে চাও
রঙিন তোমার কামনা-পাখিটিকে।
নয়তো, তোমার বিশ্ববিজয়ী প্রবল হাওয়ার ঝড়ে
ভাসিয়ে দিলে নীল সাগরে—
স্বপ্ন-ঢেউরের দারুণ দোলায় ডুবিয়ে দিলে কাকে,—
দেখতে চাও।—নিঠুর তুমি!
আর, একদিন তুমিই বলেছিলে—
আমাকেই ভালোবাসো।
আমাকেই একান্ত ক'রে পেতে চেয়েছিলে!
লিখেছিলে—
'তোমার কামনা-স্বর্গে ঠাঁই পেতে চাই।'

তোমাকে সেদিন
ফিরায়ে দিইনি আমি।
তোমার সে-প্রার্থনার স্বর্ণপাত্রখানি
কামনার অমৃতে আমারি
পরিপূর্ণ হয়েছিল কানায়-কানায়।
সেই গর্বে, দুরন্ত নেশার সেই বিহ্বল জোছানায়
কতো-কিছু বলেছিলে তুমি।
মনে ক'রে দেখ আজ!

আজ তোমার সেই পাত্র গেছে ভেঙে
ভেঙেছ তুমিই।
সেই রাত্রি, সেই জ্যোছনা
প্রচণ্ড সূর্যের আগুন-ঝলকে
নিঃস্ব হ'য়ে গেছে।
আজ

তোমার শকুন্তলা গেছে মরে।
কিন্তু দুষ্মন্তের বিস্মৃতির সমুদ্রে নয়।
গ্রীষ্মের সূর্যভরা বাস্তবের বিপুল সমুদ্রে
আপন মূঢ়তার আপন ভীরুতার দড়ি কলসি নিয়ে
মরেছে তোমার শকুন্তলা।

দুষ্মন্ত সে আজো তার আশার আকাশে
বিশ্ব-সৃষ্টি-পরিমাণ ধৈর্য আর ভালোবাসা নিয়ে
ব'সে আছে কামনার স্বর্ণ-সিংহাসনে
হিমাদ্রির মতো।
সমুদ্র-বেলায়
এখনো দাঁড়ায়ে আছে নম্রনেত্র সেইখানে রেখে
যেথা সখী শকুন্তলা মৃত্যুর ওপার হতে
ভাসে আর হাসে!
একটি আকুল প্রশ্ন মন ভরা তার—
'তুমি কি আসবে না ফিরে?
—তুমি আর আসবে না, শকুন্তলা!'

খোয়াই

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের মতন আবছা পিছল,
শ্যাওলার বনে জোনাকি—
তেমনি তোমার জীবন;
তুমি তা জানো কি?

বহুদিন হতে বহু দূর পথ
পিছনে এসেছি ফেলে,
(ক্ষুব্ধ সাপের মতো,)
তাপস জীবন রয়েছে সামনে আঁকা;
বাঁকা আকাশের গালে
বন্ধুর মাঠ বন্ধুর মতো
আবির মাখায় যেন।

সূর্যের ঢেউ ধারালো তন্দ্রা
এনেছে শ্রান্ত মনে;
বিবসনা ঘন চাঁদের আলোর
আবছা আলিঙ্গনে
জীবনসন্ধ্যা বন্ধুর হোল—
জানো কি?

একটি কালো মেয়ের স্মরণে

অমল চট্টোপাধ্যায়

কাল যখন তাকে দেখলাম
মৃদুনীল বিদ্যুতের আলোয়
আমার শিরায় কই স্পন্দন ত জাগেনি
রক্ত-কণিকারা কই উৎসব ত করেনি
তবু—তবু আমি তাকে দেখলাম
একবার, দুবার, অনেকবার।

কালো সে, আমার চোখেও কালো
তাই কি রুপোর ঝুমকো অত মানিয়েছিল,
কমলা রঙের শাড়ির বিশেষ কোনো অর্থ আছে নাকি,
আর অযত্নে বাঁধা ঘাড়ের কাছে নুয়ে-পড়া খোঁপার ?
অত আস্তে কেন হেসেছিল
ফুটতে-না-ফুটতে মিলিয়ে যাওয়া হাসি !
চমক ভাঙল যখন বল্লে, 'আসি,
হঠাৎ মনে হ'ল কী যেন হারিয়ে গেল আমার,
তাই চুপ ক'রে আবার দেখলাম
একবার, দুবার, অনেকবার।

আমার চোখ এত রত্ন লুঠ করতে শিখলো কবে
চেংগিস খাঁর চেয়েও বেশি।
—আজ তাই ভাবছি।

পরিচয়

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

হৃদয় নিয়ে খেলেছি কত খেলা,
ও বেলা যারে বেসেছি ভালো ভুলেছি এই বেলা।
নিরখি যারে বলেছি সুখে অধর পরশিয়া,
জীবন মোর, মরণ মোর, সকল তুমি প্রিয়া।
ও-বেলা দেখে চিনিতে পারি নাই, বলেছি কে গো তুমি,
কত যে ঢেউ পরশে, মনে রাখে কি বেলাভূমি ?
ভাবিয়াছিনু এ-খেলা মোর চলিবে অবিরাম
জীবন নিয়ে জীবন দিয়ে হবে না দিতে দাম।
হঠাৎ ভুল ভাঙিল যবে দিলে না তুমি ধরা ;
পালালে, আমি খুঁজিয়া মরি তোমারে, মনোহরা !
বুঝিনু মনে যে-খেলা খেলি খেলা ত তাহা নয়
এনেছে তারা চকিতে শুধু তোমারি পরিচয়।
যাদের ভুলে গিয়েছি, তারা মূর্ত তব মাঝে
সবার ব্যথা আজিকে বুকে দ্বিগুণ হয়ে বাজে।

রহস্য

আদিত্য ওহদেদার

রেলিঙের মেলে-দেওয়া শাড়ি
চাহিছে আনিতে মনে
শিহরি' আবেশে
দেহের স্পর্শের স্বপ্ন।

হিরণ্ময় রোদ
প্রীতির আশ্লেষে বাঁধি' জড়ায়েছে তারে :
যেন সবে-বিয়ে-হওয়া বধূর গলাটি—
জড়ায়ে কুমারী সখী
জানিতে চাহিছে কী সে রহস্যের কথা॥

সঞ্চারী

অবন্তী সান্যাল

এ পথে শুধু অন্ধকার ও পথে শুধু ভয়।
হে পথ, তবু কঠিন কিনারায়
হৃদয় রাখি, মরণে করি জয়।

এ পথে মুখ ছায়ায় ঢাকা ও পথে চোখে জল।
বেপথুমান করুণ ইসারায়
কখনো কাঁপি, কখনো করি ভয়,
হে পথ, তবু কঠিন কিনারায়
আলোছায়ায় তোমার পরিচয়।

গলিত প্রেম অন্ধকারে নীরবে শুধু ঝরে,
এ বুকে ঝড়—কাজল টলোমলো।
হে পথ, তবু বলো :
জীবনে আর মরণে জয় কোথায় বরাভয় ?

এ পথে শুধু অন্ধকার ও পথে শুধু ভয়।

ভ্রমর

অরুণকুমার সরকার

জরায়ু-কারায় ভীরু ভ্রূণ-শিশু কাঁদে
চপল ভ্রমর যেন সে পড়েছে ফাঁদে
আলোক তৃষায় এ কী সকরুণ আর্তনাদ-এ !

এ কী আনন্দ, এ কী মধু শিহরণে
দ্রাবক বিষের প্রতিক্রিয়ায় মনে
আগুন লেগেছে স্নায়ুলতাঘেরা বনে !

মনের আঁধারে হে ভীরু প্রথম ছন্দ
অধীর তোমার গুঞ্জন করো বন্ধ
এখনো তোমার দেহে যে সবুজ গন্ধ !

এখানে জীবন হিসাব ক'রে যে চলে
ভাব ও ভাষার সুনিপুণ কৌশলে
চপল, তোমায় বাঁধবে কে শৃঙ্খলে !

তবু নিশিদিন কাঁদছে সে বারে-বারে
আলোকতৃষায় অতল অন্ধকারে
অবোধ শিশুর এ কী এ-প্রয়াস অনধিকারে !

মরা হাতী লাখ টাকা

লীলাময় রায়

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতী
একবার হরি হরি বল্
হাতী যারা মারল তারা কাঁপল রাতারাতি
যত লক্ষ্মীপেঁচার দল।
হাতীর শোকে কাঁদল যারা চাপড়ে বুকের ছাতি
একবার হরি হরি বল্
চোখের জলের ছাপা বেচে কিনল জিনিসপাতি
যত সারস্বতের দল।
হাতীর জন্যে হন্যে হয়ে করেন মাতামাতি
একবার হরি হরি বল্
নির্ব্বাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতী
যত গণপতির দল।
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতীর খ্যাতি
একবার হরি হরি বল্।
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতীর জাতি
যত বেঁচে মরার দল।

কোনো নির্জন মুহূর্তে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এ-অশান্ত হৃদয়ের স্পন্দন শুনেছি বহুদিন
ভুলে-যাওয়া গানগুলি তুলে নিলো সময়-বিলীন
তোমার আরক্ত মন।
নির্জনতা দিয়ে
নির্জন প্রাসাদ গড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
কার পদধ্বনি শুনি।
মৃত্যুর মতন বয়ে যায়
অন্ধকারে কালো স্রোত দূরান্তরে অশনি-ঝঞ্ঝায়।

হে অশান্ত মন! তোমার চূড়ায়
স্বাতী নক্ষত্রের নির্জন শ্বেতাভা।
কোন প্রজাপতি
বসন্তের বনগন্ধে দক্ষিণের রঙীন উৎসবে
হয়তো পৌঁছবে,
একটি ফুলের রেণু বয়ে,
মুহূর্তে সমস্ত দিক রোমাঞ্চিত হবে গান গেয়ে!
মেঘের ছায়ার মতো ছেয়ে যাবে
তুষার শ্বেতাভা মুছে যে-মুখ চেয়েছো খুঁজে পাবে।

করোটি

চাং হুং (৭৮—১৩৯ খৃঃ)

আমি চাং পিং জু *
পৃথিবীর নয় দিক, আট দেশ
সব আমার দেখা, সূর্যের অভিযান,
তারাদের কক্ষে আবর্ত্তন, ড্রাগনের ঝম্পন
আর ফিনিক্সের আকাশে ওড়া।
আমি গেছি দক্ষিণে,
পেরিয়েছি ছি-ইয়ের রৌদ্রদগ্ধ লাল মরুভূমি,
গেছি উত্তরে
ঠেলে উঠেছি তুষার-পঙ্কিল ইউ-সিয়াং।
পশ্চিমে অন্ধকারে অন্ধ উপত্যকা
মেই-কু, সেখানেও গেছি আমি,
পুবে গেছি ফু-সাংএ
সূর্য্যের জন্মস্থান, তুঁত গাছ নুয়ে হেলে আছে।

ঋতু আসে, ঋতু যায়, হেমন্তশেষে
ভোরের অল্প হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ।

লাগামে টান দিতে রথের মোড় ফেরে
ডাইনে বাঁয়ে চাঁদ ঘুরে চলে ইচ্ছামতো।
বেড়াতে বেড়াতে ঘোড়া চলে
উঁচু আলের উপর দিয়ে অনেক দূর,
কখনো আস্তে কখনো জোরে।

* এঁর আর একটি নাম চুয়াং জু। প্রসিদ্ধ তাওবাদী দার্শনিক। অধ্যাপক জাইলস এঁর লেখা অনুবাদ করেছেন।

উঠে আসে উঁচু একটা ঢিপির উপরে
সেখানে রাস্তার পাশে দেখি
গড়াচ্ছে কার মাথার খুলি,
পাঁকের প্রলেপে, বিবর্ণ, কালো কুয়াসায় ঢাকা।
তাই ব্যথার বেদনায় শুধালেম ;
"যৌবনে অনশনে মৃত্যুভাগ্য ছিল কি তোমার ?
এখানেই ঢেলেছো কি শেষ নিশ্বাস ?
এসেছো কি জোয়ারে ঐ খানে ভেসে ?
জ্ঞানী না কি গণ্ডমূর্খ, পুরুষ না মেয়ে ?"
অনুভব করলুম নেমে এলো এক মহান্ আত্মা,
শুনতে পেলেম স্বর্গীয় স্বর, দেখলেম না কায়া,—
"চীনেতে তখন স্যুংদের ছোট্ট রাজত্ব
চুয়াং পরিবারে আমি, চৌ, জন্ম নিলেম।
আমার মন চলে যেতো পরপারের পাথার ছাড়িয়ে,
কিন্তু মোক্ষ লাভ আমার হয়নি,
শেষে জীবনের শেষে এসে
পেয়েছি স্থান
রহস্য-আঁধার এই পাতালে ;
কেন আজ ডাকলে আমাকে ?"
জবাব দিলেম
"উউএর পবিত্র পাহাড়ে-পাহাড়ে
আমি তোমার জন্যে
জানাবো প্রার্থনা দেবতার কাছে
স্বর্গে ও মর্ত্যে।
ফিরে পাবে নব অঙ্গ ;
উত্তরের পেই-পান ফিরে দেবে কান
দক্ষিণের নানলি দেবে এনে চোখ

পুব থেকে তুং-চন্ পা ফিরিয়ে দেবে
পাবে পশ্চিমে সী-খুনের কাছে উদর।
পাবে ফিরে পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয়, বোধনের ছয় শক্তি,
এ-সব ফিরে পেতে কি চাও আবার ?"
করোটি উত্তর করে :
"সায় দিতে পারলেম না তোমার কথায়।
মৃত্যু বিশ্রাম, জীবন দাসত্ব
শীতে কি নদীর জমা জল
বসন্তের স্রোতের চেয়ে ভালো ?
জীবনের যত গর্ব,
পালকের চেয়ে, ধুলোর চেয়েও কি হালকা নয় ?
সম্রাটের জ্বলন্ত মহিমা তাও ওড়ে হাওয়ার আগে।
মহর্ষি ছাও আর সু একেই তো করেছিলেন ঘৃণা,
পো ছং পালিয়েছিলেন।
আমি তো মিলিয়ে গেছি
যা ধর্ম, যা সত্য তাই আজ নিয়েছে আমাকে।
লি চু আমাকে দেখতে পাবে না,
জু ইয়ে শুনতে পাবে না,
ইয়াও সুন এরা আমাকে খাতির করবে না আর,
চিয়ে বা চৌ দু'জনেরই শাস্তির বাইরে আমি,
বাঘ বা চিতা ছিঁড়তে পারবে না আমাকে
বর্শা তরোয়ালের খোঁচায় আমি জখম হবো না,
আমি এখন ইন আর ইয়াংএ ভাসছি
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, প্রকৃতিই এখন আমার স্বভাব,
স্রষ্টা নিজে এখন আমার বাবা, আমার মা,
আকাশ আমার বিছানা, মাটি আমার বালিশ,
বজ্র আর বিদ্যুৎ আমার ডঙ্কা আর পাখা,

সূর্য্য চন্দ্র আমার প্রদীপ, আমার বাতি
আমার পাহাড়ি ঝরনা হচ্ছে মেঘ আর আকাশগঙ্গা,
আকাশের তারা আমার মণিমুক্তা।
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছি আমি।
বাসনা নেই, লিপ্সা নেই,
ধুয়ে আমাকে সাফ করতে পারবে না
নোংরা করে ময়লা করতে পারবে না আমাকে
আমি কোথাও যাই না তবু ঠিক পৌঁছই,
ব্যস্ত নই, তবু দ্রুত।"

কথা শেষ, স্তব্ধ শব্দ।
মায়াবী আলো স'রে যায়, নিবে যায়।
কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, তাই চেয়ে থাকি।
সঙ্গে যে ছিলো তাকে বলি
রেশমি রুমালে অস্থিগুলি জড়িয়ে নিতে।
কালো ধুলার ওয়াড়-ঢাকা
রাস্তার ধারে চোখের জল ফেলি
জোলো-সুরা উৎসর্গ করে।

অনুবাদক—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় প্রকৃতি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অনেক রোগের পরে শয্যাপ্রান্তে আজ বসে' আছি।
নির্জন মধ্যাহ্নবেলা, সোনালী শীতের রৌদ্র ঘরে,
দুইটি চড়ুই এসে সেই রৌদ্রে দেখি খেলা করে,
দোয়েল অলস সুরে ডালে বসে' ডাকে কাছাকাছি।
হাতের বইটা রেখে দেখি চেয়ে বাতায়ন-পথে
যতোদূর চোখে যায় আদিগন্ত আকাশের নীল।
লঘুপক্ষ ডানা মেলে শূন্যে-শূন্যে ওড়ে শঙ্খচিল।
একটি অলস সুর উচ্চারিত জীবনের রথে।

ভালো লাগে এইরূপ, বিচিত্রিত মুহূর্ত এখানে
সহজ সরল রূপে হৃদয়কে করেছে চকিত।
বাহিরের পৃথিবীকে কেউ যদি আজ মুছে দিত!
পাখীর স্তিমিত ডাক আনে তন্দ্রা জ্বরতপ্ত প্রাণে,
নির্জন মধ্যাহ্নে আজ মনে পড়ে পুরাতন স্মৃতি।
ক্লান্ত শয্যা 'পরে বসে' জেগে ওঠে দ্বিতীয় প্রকৃতি॥

স্ফটিক মৃণাল

জ্যোতির্মালা দেবী

স্ফটিক মৃণালতলে স্বপন দেখেছি।
স্বপন দেখেছি
আমি তার বৃন্তশিশু,
আমার ভবিষ্য স্বর্গে সৌর মন্দাকিনী
কুলুকুলু গান গেয়ে যায়,
সে গান শুনিতে পারো
স্ফটিক মৃণালে চিনি।

আমি বাণী,
সূর্যসেনা আমারি একটি নাম···
আসি না ভূতল-তলে রশ্মি একাকিনী।
দ্বিদল মৃদঙ্গ বাজে
আশ্চর্য কোরকে
আমার সঙ্গীতলোকে
পুষ্প-উপবনে,
আমি তারে চিনি।

ফুলের মেঘেরা
রাঙা বলাকার মতো
মোরে ছিন্ন ক'রে ছুটে যায়,
কবিপদ্মদলে
অশনি গর্জন করে—
সে-তর্জন শুধু পরিহাস।

চেয়ে দেখো···
পরিচ্ছিন্ন পতাকার পথ
পুষ্পবলাকারা খেলা করে সেই পথে
সুন্দর পদ্মের রথে।
সুমধুর
বৃন্তচ্যুত
স্বরূপ···সুন্দর!
লাবণ্যলতার মতো কোমল স্বাক্ষর
মৃত্তিকাতে রেখে যাই,
বজ্র তবু আমি।

দিগন্তে দেখেছ, কবি, স্ফুরিত আগুন?
রক্তগোলাপের দীপে সফেন আগুন!
উন্মত্ত কটাক্ষ করে
বিসারিত করে
মৃৎপাত্রে,
বিস্ফারিত করে আকাশে-আকাশে
শিখার চিকুর—
স্ফটিকের মৃণাললাঞ্ছন!

সূর্য কবে প্রেমের সঙ্গমে
পঙ্কগর্ভে রেখেছিল
একবিন্দু উত্তপ্ত কাঞ্চন।

উদ্যত করি' সে
অনন্ত অগ্নির দোল
পুষ্পদণ্ড শিশুর শোষণে
হাহাকার করে যে অসীমে!···

আমি কার ফুলশিশু ?
আমি তারে চিনি—
মাতা মোর সূর্যের ফণিনী।

আমি বাণী।
কবিকে বহন করি,
গাহন করি যে
দিগন্তস্থুরের দীপ্ত দীপকলীলায়।
ছায়াঘনমেঘতলে যায়,
দাঁড় বেয়ে যায়
আমার বায়ুর তরী,
ফুলেরা প্রহরী।

সূর্যচন্দ্র ঘণ্টা যে বাজায়
মন্দির কাঁপায়
ভেঙে যায় স্ফটিক মৃণাল ;
মুখখানি নত রেখে
ভূতলে নয়ন এঁকে
অম্বরফণিনী
জন্ম দিলো জবার প্রবাল।

দুই পূর্ণিমা

বুদ্ধদেব বসু

জানি না কেন সে-কথা মনে পড়ে।
শ্রাবণ-রাতে প্লাবন এলো
পূর্ণিমার ঝড়ে।
ঝরিছে আলো আকাশে, যেন
মৌন সিনেমার
স্বপ্ন-নীল চন্দ্রালোকে
মগ্ন চারিধার।
মৃদু মেঘের লজ্জা ছিলো,
বাতাসে ছিলো মধু,
বক্ষে ছিলো লক্ষ যুগের বঁধু।
নয়ন ভরা অনিদ্রায়
শ্রবণ ভরা বাণী,
লিখেছিলাম আপন মনে
কবিতা একখানি।
ছিলো না দ্বিধা; ছিলো না বাধা,
ছিলো না আয়োজন,
সহজে খুশি হ'তে-না-জানা
সমালোচক মন।
আত্মহারা বেগে যেমন
ঝর্নাধারা ছোটে,
লেখনী-মুখে আখরগুলি
তেমনি দ্রুত ফোটে।

বয়েস ছিলো সতেরো সেই দিন,
ইচ্ছা দিয়ে শুধেছি নব-
যৌবনের ঋণ।
সুখের মোর ছিলো না শেষ,
দুঃখে ছিলো মধু,
বক্ষে ছিলো চিরকালের বঁধু।
তারি পরশ বিশাল নীল
নিশীথে যেন মেশে,
কবিতাখানি লিখেছিলাম
কত না ভালোবেসে।

কেন যে সেই কবিতা পড়ে মনে,
আশ্বিনের আকাশ হ'তে
শেফালি-বরিষনে।
আবেশহারা বাতাসে আর
আবেগহারা মেঘে
ঈষদলস সফলতার
শান্তি আছে লেগে।
মুহূর্তের মূর্ত রূপ
শিশির ঝ'রে যায়
সান্ত্বনার তন্দ্রা এনে
মনের নিরালায়।
প্রৌঢ় এই পূর্ণিমার
স্তব্ধ অবসরে
জানি না কেন সে-কথা মনে পড়ে

কবে যে সেই কবিতা হ'লো
ধূলিতে অবনতা,
ভুলিতে তবু পারিনি তার
অসীম মদিরতা।
কী-কথা সব লিখেছিলাম
কে আর মনে করে,
লিখেছিলাম, এ-কথাটাই
হৃদয় আছে ভ'রে।
কবিতা গিয়ে রহিলো জেগে
কবিতা-লেখা রাত,
আনন্দিত অনিদ্রার
উদার ছায়াপাত।
বয়েস এলো চল্লিশের কাছে,
সতেরোতর সে-রাত্রি যেন
এখনো বেঁচে আছে।
এখনো সেই অতল নীল
পূর্ণিমার নেশা
বক্ষে মোর দিতেছে দোল,
রক্তে আছে মেশা।
স্মরণে তার আশ্বিনের
শান্ত সমীরণে
আবার এই কবিতাখানি
লিখিনু সযতনে।

কার্তিকের কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

গ্রীষ্মপ্রেমিক্, বর্ষাবিলাসী আমি
দীর্ঘসূত্রী দিবস আমার প্রিয়,
তবু এ-নবীন-হেমন্তদিন যেন
মাঝে-মাঝে মোর মনে হয় রমণীয়।

দক্ষিণায়ন ক্লান্ত তপনে একটু-একটু ক'রে
কাছে টেনে নেয় রোজ,
শীতের সঙ্গে কার্তিক তার
অনতিব্যক্ত আত্মীয়তার
চিহ্নগুলির দিনে-দিনে করে খোঁজ,
সহসা শিহরি' কৃশ দু'পহরে
উত্তর বায় বার্তা বিতরে,
'নেই, দেরি নেই আর।'

আবার কখনো সান্ধ্য আকাশে
ক্ষীণ বৈশাখী মায়া,
কখনো মেঘের মেদুর ধূসরে
যেন শ্রাবণের ছায়া।
এই তো সেদিন বৈশাখ ছিলো
দীপ্ত রেখায় আঁকা,
মনে হয় যেন মুখ ফেরালেই
পাবো শ্রাবণের দেখা।

আসলে এখনো মনে-মনে আমি
ছিনু গ্রীষ্মের দেশে,
সহসা শিশির-পরশে বাতাস
ব'লে চ'লে গেলো ভেসে—
'নেই, নেই আর নেই।'
ভাবতে পারি না একটি বছর
গেলো এত সহজেই।

গ্রীষ্মের লাগি' নিশ্বাস ফেলি আমি,
এখনো সে কত দূর!
কবে যে আবার আর্দ্র আঁধারে
ভরা ভাদ্রের ঝরঝরধারে
সব রূপ হবে সুর!
মনে-মনে আমি তারি দিন গনি—
বেঁচে থাকা তবু ব্যর্থ হয়নি,
শান্ত প্রবীণ হেমন্তদিন
তাও লাগে সুমধুর।

যদিও আপন কুলায়ের টানে
বাঁধা হৃদয়ের পাখি,
অতিথেয়তায় প্রবাস কখনো
তবু সুখী হয় নাকি?

৫

সেই মতো এই ছোটো-হ'য়ে-আসা দিন
তারো কাছে মোর কিছু যেন হ'লো ঋণ,
কিছু আলো, কিছু আকাশ, কিছুটা রোদ।
—এই কবিতায় হবে কি সে-ঋণ শোধ ?

শীতের সঙ্গে জীবনের শত্রুতা,
মৃত্যুর সখা সে যে,
তবু তো শীতের প্রথম দূতের দল
সোনালি-সুনীলে সেজে
নেচে-নেচে এলো, যেন কত রমণীয়।

ঋতুর ক্রান্তি মনের ক্লান্তি মেজে
সারা পৃথিবীরে আবার করে যে প্রিয়,
বারে-বারে একই নতুনে রচনা,
তবু সে-নতুন পুরোনো হয় না,
ফিরে-ফিরে যেন আরো বেশি ভালো লাগে
কিছু সুর, কিছু পরশ, কিছু বা দৃশ্য,
হোক শীত, হোক বর্ষা, হোক সে গ্রীষ্ম।

হায়রে ! মানুষ করেছে ফন্দি
প্রকৃতির হবে প্রতিদ্বন্দ্বী,
কেড়েছে শক্তি, শেখে নাই তার ছন্দ।
মানবভাগ্য-আবর্তনের
যে-কোনো সূক্ষ্ম ক্রান্তিক্ষণের
হৃৎ-বিদারণ আজো কী দারুণ দ্বন্দ্ব !

প্রকৃতির কোলে যে-নতুন আসে
তারি ছোঁওয়া লেগে বিশ্ব বিকাশে,
এমনকি, পীত শীতের আভাসে
　　খানিক ঝরায় সুধা,
আর মানুষের ইতিহাস-পটে,
নতুনের রেখা যদি কিছু ফোটে,
অমনি ভীষণ বিস্ফোরণের
অমিত শোণিত নিঃসরণের
মূঢ় ক্রূরতা বিশ্বে ছড়ায়
　　নরক, মড়ক, ক্ষুধা।

শীতসন্ধ্যার গান

বুদ্ধদেব বসু

মিলালো দিনের আলো
মুছিলো রঙের রেখা,
শীতের এ-ক্লান্ত আকাশ
আঁধারে রিক্ত একা।
কুয়াশায় কুণ্ঠিত সে,
হতাশায় গুণ্ঠিত সে,
শীতের এ-শূন্য আকাশ
তবু নয় সঙ্গহারা,
আছে তার সন্ধ্যাতারা।

ফুরালো বসন্তদিন
কাননে পাখির মেলা,
আমার এ-শূন্য প্রাণে
নেই আর ফুলের খেলা।
সজ্জায় তার দীনতা,
লজ্জায় তার হীনতা,
তবু এ-রিক্ত হৃদয়
কারো না সঙ্গ যাচে,
আছে তার স্বপ্ন আছে।

বিদেশী সাহিত্য

পল ভালেরি

এই 'অগ্রগামী অধঃপাতে'র যুগে (টি. এস. এলিয়টের ভাষা ধার ক'রে বলছি) কবির মৃত্যু কে-ই বা লক্ষ্য করবে, বিশেষত সে-কবি যদি হন সেই মহাজনদের অন্যতম, সভ্যতার মূল্যবোধ যাঁদের গচ্ছিত ধন, যাঁর সংবেদন স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে আবদ্ধ, মন যাঁদের সুসংস্কৃত আর সৌন্দর্যচেতনা সুশিক্ষিত। গত তিরিশ বছর ধ'রে পল ভালেরি ছিলেন ফরাশি কাব্যের একটি ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। সে-ঐতিহ্যের পটভূমিকায় ছিলো একটি মহৎ সভ্যতা—রাসীন আর পাস্কেল, রুসো আর বোদলেআরের সভ্যতা—আর তার লক্ষ্য ছিলো সে-সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান সময়ের অরাজক বিশৃঙ্খলার প্রতিতুলনা। এ-যুগে কোনো কবির পক্ষে সভ্যতার মূল্যবোধের পক্ষপাতী হওয়া একটি সুবৃহৎ বাধা, বিশেষত তিনি যদি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য ব্যবহার করেন জটিল প্রতীক, আর প্রয়োগ করেন সাধারণের অনধিগম্য ভাষা।

এ-কথা সত্য যে আজকালকার প্রতীকী কাব্যের জটিল না-হ'য়ে উপায় নেই। কেননা প্রতীকী কাব্য যে-আন্তরিক সত্যকে প্রকাশ করে, বহির্বিশ্বের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। প্রথমটিতে আছে সত্তার অখণ্ডতার পুনরঙ্গীকার, আর দ্বিতীয়টি এমন কোনো-কিছুকেই স্বীকার করে না যা কার্যকরী উপায়ে জড়বস্তুর উপর মানুষের প্রভুত্বের সহায়ক নয়। বোদলেআরের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে ফরাশি প্রতীকী কাব্য এই অসংগতিকেই প্রকাশ ক'রে আসছে; কবিচৈতন্যের সঙ্গে সমসাময়িক সমাজের বস্তুসর্বস্বতার অসংগতি; একদিকে কবি-সত্তায় হৃদয়াবেগ আর

মনীষার অখণ্ডতা, অন্যদিকে সেই 'অগ্রগতি', যা অধঃপাতের নামান্তর। বোদলেআর, ভেআরলেন, র‍্যাঁবো, মালার্মে আর ভালেরির যা সমস্যা, টি. এস. এলিঅট আর তাঁর অনুগামীদের সমস্যাও তা-ই; তবে এ-দুয়ে প্রভেদ এই যে এলিঅটের 'Waste Land'-প্রতীকতা ফরাশি প্রতীকীদের অজ্ঞাত বললেই চলে।

এই প্রভেদ ভালো ক'রে মনে রাখলে ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশের সমসাময়িক অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা ও ফরাশি কবিতার মৌল পার্থক্য বোঝা যাবে সহজে। এলিঅট নিজেই বলেছেন যে তাঁর কাব্যের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন দু'জন ফরাশি কবির কাছে—লাফ়ুর্জ আর করবিএর, আর এ-দু'জনের প্রতীকতা সুচিন্তিত, উৎপ্রেক্ষাবহুল ও মনস্তাত্ত্বিক—এক কথায়, এঁদের প্রতীক-পথে যাত্রা করলে সোজা পৌঁছনো যায় প্রুফ্রক-কবিতাগুচ্ছে, তারপর 'Waste Land'-এ। পক্ষান্তরে, বোদলেআর, ভেআরলেন, র‍্যাঁবো, ভালেরির প্রতীকতাকে বহির্বিশ্বের ঘটনা—এলিয়টের, এমনকি ডনের, 'objective correlative'—নিরূপিত করেনি; তাকে রূপ দিয়েছে সভ্যতার সেই সব মূল্যবোধ, যা ব্যবহারের ঐতিহ্যগত আদর্শের সমর্থক, অবিকৃত অভঙ্গুর চিন্তাবিন্যাসের প্রজনক। এই কারণে লাফূর্জ ও করবিএর ব্যতীত ফরাশি কবিদল কাব্যের ক্লাসিক রূপকল্পকেই ব্যবহার করতে পেরেছেন, এবং সেই সঙ্গে আঁকতে পেরেছেন এমন অভিজ্ঞতা, এমন অন্তর্বিরোধের ছবি, প্রাচীন সাহিত্যে কখনো যার ছায়ামাত্র পড়েনি।

বোদলেআরের আত্ম-বিশ্লেষণী কবিতার 'বীভৎস' রস ভালেরির কবিতায় নেই, ভেআরলেনের সুতীব্র স্মৃতিদাহ বা র‍্যাঁবোর সাহসিক চিত্ররূপ তাঁর রচনায় অন্বেষণ করা বৃথা। নূতন ধ্বনিরূপ, আর ধ্বনিরূপের নব-নব বিন্যাসরচনার অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি বরং মালার্মের নিকটতম। যে-গহ্বর, যে-শূন্যতা (বোদলেআরের *gouffre* ও *neant*) বোদলেআরের প্রত্যেকটি কবিতার পরিব্যাপ্ত সত্য,

ভালেরিতে তা ভবিষ্যৎবাণীতে রূপান্তরিত; ভেআরলেন আর রিল্‌কেতে যে-যন্ত্রণাবোধ মূলত ব্যক্তিগত, বিষয়ীতে আবদ্ধ, ভালেরিতে তা বিষয়মুখী, প্রায় যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। এ-কথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে উনিশ শতকের এই সব কবিদের জীবনীশক্তি ভালেরির রচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত; তাঁদের কাব্যে তখনো স্থান ছিলো উচ্ছ্বাসের, প্রার্থনার, বাগ্মিতার, দুঃসাহসিক চিত্ররূপের। ভালেরির কবিচৈতন্যে সে-সমস্তই পরিবর্তিত হ'লো, আবেগপ্রাবল্য আবার সম্ভ্রান্ত হ'লো তাঁর হাতে—যাকে বলে রেসপেকটেবল—তাঁর জীবনে, তাঁর কাব্যে সেই সব অশুভ জটিলতা সুদূরপরাহত, যা চিহ্নিত করেছে বোদলেআর, ভেআরলেন, র‍্যাঁবোর কাব্য ও জীবন।

ভালেরির এই সম্ভ্রান্তভাব, এই 'রেসপেকটেবিলিটি'র কথা ভাবলে স্বভাবতই মনে পড়ে ইংলণ্ডের টি. এস. এলিঅট, জর্মনির স্টেফান গেঅর্গকে। এই তিনজনের 'ক্লাসিসিজম'-এর মধ্যে (অন্য-কোনো কথার অভাব এটি ব্যবহার করছি) কিছুটা সাদৃশ্য আছে: ভাষার সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি নূতন চেতনা, ছন্দের ঐতিহ্যগত গঠনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে নূতন ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা-বিন্যাসের প্রয়াস, চিন্তাবস্তুতে ও চিত্ররূপে উৎসারিত দার্শনিক মন, বিষয়ে ও রূপকল্পে সরলতার সন্ধান। স্টেফান গেঅর্গ ও ভালেরি উভয়েই 'Waste Land'-এর সংকট পার হ'তে পেরেছিলেন, তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন সেইখানে, যেখানে এলিয়টের শেষ। এই কবিদ্বয়ের রচনায় এমন কিছুই নেই যার সঙ্গে পূর্ব-এলিঅটের ব্যর্থতা বা 'মেটাফিজিকল' মর্মপীড়ার তুলনা হ'তে পারে। স্টেফান গেঅর্গের *Siebente Ring* এবং ভালেরির *Le Cimetière Marin*-য় অভিজ্ঞতার যে-সমস্ত স্তর প্রকাশিত, তা পাওয়া যায় শুধু উত্তর-এলিঅটের কবিতাগুচ্ছে, বিশেষত *The Dry Salvages* ও *Little Gidding*-এ। বস্তুত, পূর্ব-এলিঅট, এবং এলিঅটের ফরাশি পূর্বগামী করবিএর ও লাফূর্জ-এর কবিতার লক্ষণ আবেগের যে-উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা, গেঅর্গ ও ভালেরি তা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের

ভাষাব্যবহারের সচেতন শুদ্ধতায় এবং এই সনির্বন্ধ ঘোষণায় যে শিল্পকলার লক্ষ্য সৌন্দর্যবোধের 'বিশুদ্ধ' আনন্দ।

রিলকে বা ইএটস-এর সঙ্গে তুলনা না-ক'রে ভালেরিকে যে আমরা স্টেফান গেওর্গ-এর সঙ্গে তুলনা করলাম, প্রুফ্রক বা ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড-এর এলিঅটের সঙ্গে না-ক'রে বরং *The Four Quartets*-এর এলিঅটের সঙ্গে, এর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন মূল্যবোধও আছে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যে-কোনো মহৎ আধুনিক কবির সংবেদন সুসংস্কৃত সমাজের ক্ষুদ্র উচ্চ চূড়ায় সীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য, ভালেরির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কোনো অর্থেই গণ-কবি নন তিনি। কবিতাকে কাব্যকলা হ'তে হবে, 'আর্ট' হ'তে হবে, গণ-কণ্ঠের উন্নত সংস্করণ নয়, এই ধারণা দৃঢ় ছিলো তাঁর। সমসাময়িক ফরাশি কবিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সচেতন শিল্পী; চব্বিশ স্তবকের কবিতা *Cimetière Marin* শেষ করতে তাঁর বহু বৎসর লেগেছিলো। এ থেকেই বোঝা যাবে, ফ্রান্সের অন্য যে-কোনো বড়ো কবির তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ এমন অত্যল্প কেন।

ভাষার শুদ্ধতা, চিত্ররূপ ও চিন্তাবিন্যাসের স্থৈর্য, প্রাচীনদের সুগভীর, প্রায় নিশ্চল প্রতীকতা—এ-সব যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা ভালেরির ভক্ত হবেন সহজেই। তাঁর কবিতা প'ড়ে উপভোগ করতে হ'লে পাণ্ডিত্য নিষ্প্রয়োজন। তাঁর উৎপ্রেক্ষা কখনোই সুদূর নয়, পাঠককে কখনোই বিদ্বান টীকাকারের মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না। কিন্তু পাঠকের কান আর মন দুই-ই প্রস্তুত থাকা চাই। সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিভঙ্গের সুরে সুর মেলাতে হবে, গ্রহণ করতে হবে সেই চিন্তাকে, যা গভীর কিন্তু দুঃসাহসী নয়, সেই চিত্ররূপকে, যা আনন্দ দেয় কিন্তু চেতনাকে উত্তেজিত করে না, অংশ নিতে হবে সভ্যতার মূল্যবোধের পুনরঙ্গীকারে, যে-মূল্যবোধ থেকে আসে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব, জীবন-রীতিতে মানবিক মমতা।

কোনো-কোনো পাঠক ভালেরির সংসর্গে কোনো উত্তাপই পাবেন না।

রিলকে, ভেআরলেন কি জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্স-এর মতো তিনি আমাদের অন্তরের গভীরতম বেদনাবোধ জাগ্রত করেন না, কি আমাদের সমস্ত পার্থিব দ্বন্দ্বের বামাচারী ব্যর্থতা উপলব্ধি করান না। তাঁর সমস্ত কবিতায় সমভাবে একটি প্রশান্তি বিরাজমান। এই প্রশান্তি—যার উৎস একটি সুগভীর বোধশক্তি, একটি অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা—আমাদের এই 'অগ্রগামী অধঃপাতে'র যুগে তারও যে স্থান আছে, এ-কথা ভাবতে ভালোই লাগে।

আলেক্স আরনসন

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

'কালের পুতুলে'র কোনো-কোনো আলোচনা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়নি এ-কথা সবচেয়ে বেশি জানি আমি, আর সে-দুঃখ সবচেয়ে বেশি আমার। কিন্তু প্রতিকারের সময় আর নেই। বিষ্ণু দে আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে রচনা দুটি অর্ধ-মনস্ক হয়েছে, বইয়ের প্রুফ দেখতে-দেখতে এ-চিন্তা আমার মনকে পীড়া দিয়েছে বার-বার। বিষ্ণু দে সম্বন্ধে গত ক' বছরে নানা দিক থেকে নানা রকমের আলোচনা হয়েছে ব'লে তাঁর প্রসঙ্গে আমি যে ভালো ক'রে বলতে পারিনি সেজন্য নিজেকে তবু ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিত্তহারী কবিতাগুলি নিয়ে কোনো ভালো আলোচনাই এ-পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি, এবং আমি নিজেও যে তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারলাম না, এ-দুঃখ আমার অনপনেয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার 'মনের কথা মনের মতো ক'রে' আবার বলবো, এ-রকম একটা ইচ্ছা নিয়ে খেলা করেছি অনেকদিন, কিন্তু জীবনে আর হয়তো সময় হবে না, তাই এখানেই ব'লে রাখি যে 'প্রগতিশীল' দল যদিও 'ক্রন্দসী'রই বেশি সুখ্যাতি করেছিলেন, এবং আমিও 'ক্রন্দসী'কে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশি পরিণত বলেছি, তবু এ-কথাই সত্য যে 'অর্কেস্ট্রা' একটি আশ্চর্য বই, কতগুলি বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে 'ক্রন্দসী'র গুরুগৌরবের লঘুকরণে আমি ইচ্ছুক, কিংবা এও নয় যে সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা বইয়ের মধ্যে 'অর্কেস্ট্রা'কেই আমি শ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করছি—যদিও এই শেষের প্রস্তাবে আমার লেখনীর লুব্ধতা অনস্বীকার্য। সে-লোভ আমি যদি সংবরণ ক'রে থাকি তা এই কারণে যে শিল্পকলার আলোচনায় শ্রেষ্ঠ কথাটা কখনোই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয় না; কোনটা ভালো তা বলা যায়, কিন্তু কোনটা

* বুদ্ধদেব বসুর প্রকাশিতব্য সমালোচনা-গ্রন্থ 'কালের পুতুলে'র অংশ।

কোনটার চেয়ে বেশি ভালো তার অনুভূতি নির্ভর করে মনের ভিন্ন-ভিন্ন গড়ন, একই মনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঝোঁক, এমনকি ঋতু-বৈচিত্র্যের প্রভাবের উপর—তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির পারস্পরিক তুলনার প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, কেননা 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' 'উত্তরফাল্গুনী', এ-তিনখানা আসলে একখানাই বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়, তিনটি বইয়ের ভিতর দিয়ে একটি কথাই তিনি বলেছেন। যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত এক কথা বলেছেন, সে-অর্থে নয়, যে-অর্থে হার্ডি তাঁর সমগ্র রচনাবলীর ভিতর দিয়ে একটি কথাই বলেছেন, সে-অর্থে। সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা বই যেন তিনটি যন্ত্র, স্বতন্ত্র, কিন্তু সমতন্ত্রী, স্বর তাদের আলাদা কিন্তু সুর এক, ভঙ্গি তাদের বিচিত্র কিন্তু বিষয়, যাকে বলে থীম, সেটা অভিন্ন।

যে-কথা বিশেষভাবে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য, সেটি সবচেয়ে অখণ্ড-রূপে, সবচেয়ে প্রচণ্ড তেজে প্রকাশ পেয়েছে 'অর্কেস্ট্রা'য়, তাই এ-বইটিকে শ্রেষ্ঠ না-ব'লেও বলতে পারি তাঁর বিশিষ্টতম। নাম-কবিতাটির উচ্চাশা সিদ্ধ হয়নি, কিন্তু সমস্ত বইটির হয়েছে—সমস্ত বইটির মধ্যে এমন একটি ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে, ভিন্ন-ভিন্ন কবিতা-গুলি রসের দিক থেকে এমন পরস্পর-সংলগ্ন যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কবিতাগুলি একত্র হ'য়ে একটি কবিতার মতো, এবং সেই কবিতা একটি পংক্তির মতো হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। 'অর্কেস্ট্রা'তে কবি একটি প্রেমের সংগীতের উচ্চতান তুলেছেন: অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণবের লালিত্য-লালিত বাংলা কাব্যে সে-প্রেম ভাবের দিক থেকে বিস্ময়কর, পারিপার্শ্বিকেও ঐতিহ্যবিরোধী। নায়িকা বিদেশিনী, তরুণী, নায়ক ভোগক্লান্ত রস-তৃষ্ণার্ত যুবা কিন্তু তরুণ নয়, প্রেমের সংঘটনস্থল বিদেশ, আর তার স্মরণের লীলাভূমি সপ্তসিন্ধুপরপারে, কবির মাতৃভূমি। সমস্ত নিবিড় নাট্যটি দেখা হয়েছে স্মৃতির ভিতর দিয়ে: বর্তমান কবির কাছে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবন্ত শুধু স্মৃতি-

প্রজ্বলন্ত অতীত, সেই অতীতের আগ্নেয় সংরাগে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা দীপ্তিময়। মিলন-যজ্ঞে চরম আত্মাহুতির সঙ্গে-সঙ্গে অন্তিম বিচ্ছেদের প্রলয় নামলো—তারই পিঙ্গল পটভূমিকা দেখতে পাই 'অর্কেস্ট্রা'য়। কবিতাগুলিতে একটা রুদ্ধশ্বাস দুঃসহ বেদনাবোধ আছে, যেটাকে সুধীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় 'ভবিতব্যভারাতুর'। 'ভবিতব্য' কথাটি বার-বার ফিরে-ফিরে আসছে শুধু 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, অন্য দুটি গ্রন্থেও, কিন্তু আমরা অদৃষ্টবাদ বলতে যা বুঝি এ ঠিক তা নয়, এতে পরলোকের আশা নেই, পরজন্মের আশ্বাস নেই, একে বলা যায় পেগান মনোভাব, অন্ধ, অধার্মিক, আধিভৌতিক, নির্মম অনতিক্রম্য নিয়তিচেতনায় পরিপূর্ণ। আমাদের আধুনিক কাব্যে মোহিতলাল একটি শাক্ত সুর লাগিয়েছিলেন, তাঁর শক্তিসাধনা দর্পিত পেশীতে-পেশীতে প্রকট, পরিস্ফীত শিরায়-শিরায় দৃশ্যমান। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদের মতো মোহিতলালের দেহবাদও একটা প্রতিক্রিয়ার ফল—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, সত্যেন্দ্র দত্তেরও বিরুদ্ধে—এবং সেই হিশেবে সেটা বাইরে থেকে অর্জিত জিনিশ। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথে যে-ভাবটি পাই সেটি যে তাঁর আন্তরিক, তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে রবীন্দ্র-রীতি বর্জন করবার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি, বরং যথেচ্ছ আহরণ করেছেন রবি-শস্যের স্বর্ণরাশি থেকে, রবীন্দ্রনাথের শব্দসমাবেশ, এমনকি বাক্যাংশ, অনায়াসে চালিয়ে দিয়েছেন নিজের রচনার মধ্যে—বিষ্ণু দে-র মতো সচেতনভাবে, ব্যঙ্গের ইঙ্গিতে, কিংবা আদি কবিকে আধুনিক সাজ পরাবার ভঙ্গিতে হয়—রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অন্তরেই বিরাজমান—এ-কথা সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বেশ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন, অথচ কোনোখানেই, কখনোই, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অণুমাত্র সাদৃশ্য তাঁর ধরা পড়ে না। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের মতো নন এ-কথা প্রমাণ করবার জন্য কোনো বিচিত্র কৌশল তাঁকে অবলম্বন করতে হয়নি, রবীন্দ্রনাথের আস্ত-আস্ত বচন ব্যবহার ক'রেও তিনি তাঁর

নিঃসংশয় স্বকীয়তার শিখরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণত দেখা যায় সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা যুগবিভাগ ও গোষ্ঠীবিভাগ করতে ভালোবাসেন ; লেখকদের ধ'রে-ধ'রে দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে এমনকি হাত-পা কেটে, যে-কোনোরকমে একটা যুগ বা সম্প্রদায় বা মতবাদের বস্তার মধ্যে পুরতে পারলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি এতে সুবিচার হয় না, সাহিত্যভোক্তার প্রতিও না। এমন আশঙ্কা অনর্থক নয় যে অনতিদূর ভবিষ্যতে কোনো-এক অধ্যাপক কোনো-একদিন হঠাৎ জেগে উঠে মোহিতলাল আর সুধীন্দ্রনাথকে একই দেহবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দেবেন, ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে একটা 'fleshly school of poetry' গজিয়ে উঠতেই বা কতক্ষণ। সেইজন্য সুধীন্দ্রনাথকে শাক্ত কবি বলতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম, তাঁকে বরং বলা যেতে পারে তান্ত্রিক, গৌণ অর্থে তান্ত্রিক। যে-বলশালী পৌরুষের সফেন উচ্ছ্বাস মোহিতলালের অভিজ্ঞান, সুধীন্দ্র-নাথের মনোধর্মের তা বিপরীত। সুধীন্দ্রনাথের তনু-তন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর আভিজাতিক সুমিতি, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক তাঁর দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর। সুদৃঢ়, প্রগাঢ়, চিন্তা-ছায়াচ্ছন্ন তাঁর কবিতা-গুলির সঙ্গে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়া সহজ নয়। আমাদের চিরাচরিত প্রত্যাশা পূরণ করেন না তিনি। 'অর্কেস্ট্রা' প্রেমের কবিতা, অথচ এতে পূর্বরাগ নেই, অভিসার নেই, অভিমান নেই, নেই সুখ, নেই সুখের চেয়েও সুমধুর বিষাদ, নেই লাস্য, নেই নৃত্য। এলিজাবিথান গীতবিতানের মতো কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয় ক্ষণিকা কি মহুয়ার মতো। নায়িকার দেহ ছাড়া কিছু দেবার নেই, আর সেই দেহের স্মৃতি ছাড়া নায়কের কিছু সম্বল নেই। বিচ্ছেদের দিনে মিলনরাত্রির দুরন্ত স্মৃতিবন্যায় সমাজ-সংসার সব ভেসে গেছে। সমাজের প্রতি, নীতিধর্মের প্রতি অপরিসীম অবহেলায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অফুরন্ত মহিমা উচ্চারিত হয়েছে বার-বার—কবিতাগুলি আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, নিষ্ঠুর—বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণায়, মিলনস্মৃতির দারুণতর

মত্ততায় কবি কখনো চীৎকার ক'রে উঠছেন, কখনো তিনি হতাশায় মগ্ন, কখনো সেই স্মৃতিকঙ্কালকেই জীবনের পরম উপার্জন জ্ঞানে অঙ্কশায়ী ক'রে আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত, আবার কখনো এ-কথা ভেবে মুহ্যমান যে মহাদস্যু কাল জীবনের এই একমাত্র স্মৃতিরত্নকেও একদিন লুণ্ঠন ক'রে নেবে নিশ্চয়ই, নিবিয়ে দেবে সেই দুঃখের অগ্নিশিখা, যেটা তাঁর উপজীবিকা, তাঁর জীবন। কোনোদিকে কোনো সান্ত্বনা নেই তাঁর, কোনো আশা নেই, আশ্বাস নেই, মুক্তি নেই। আসক্তি তাঁর দুর্মর, বিরহ তাঁর নরক, প্রশান্তি তাঁর মৃত্যু। মেঘদূতের স্বপ্ন ব্যর্থ তাঁর কাছে, শকুন্তলার স্বর্গ অর্থহীন, তাজমহল প্রহসন মাত্র। দেহচ্যুত, দেহাতীত প্রেমসাধনার রোমাঞ্চ কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। অথচ এটা তারুণ্যের তনুমুগ্ধ পৌত্তলিকতা মাত্র নয়, এ-পূজার পুরোহিত সেই পরিণত স্বাবলম্বী মন, যে-মনের কোনো মোহ নেই, কোনো গৃহ নেই, যে-মন পুতুলের ভিতরে দেখতে পায় খড় আর মাটি, কিন্তু মাটি আর খড় ছাড়িয়ে প্রতিমাকে দেখতে পায় না, নাস্তিকতার অন্ধকারে বুদ্ধির সাহসিক রশ্মিটুকুর প্রজ্জ্বলনে নিজেকে যে নিঃশেষ ক'রে দেয়। এ-মন দার্শনিকের, কবির নয়, কিন্তু এরই সঙ্গে কবিত্বের দুরন্ত আবেগকে যুক্ত ক'রে সুধীন্দ্রনাথ অসাধ্যসাধন করেছেন। বিচ্ছেদ-বেদনার যে-উত্তেজনা তাঁর কবিতাগুলির প্রাণ, একদিকে যেমন তার চরম ব্যঞ্জনা 'বর্বর বাঁশি'র মতো তীব্র দ্রুত উচ্চস্বরে অকস্মাৎ ধ্বনিত হয়েছে 'নাম' ব'লে কবিতাটিতে, তেমনি অন্য দিকে এই অন্ধ মত্ততার পরপারে মুহূর্তের জন্য, শুধুই মুহূর্তের জন্য, একটু শান্তি, একটু মধুরতা, একটু বিশ্বাসের আবেশ তাঁকে যেন ছুঁয়েছিলো 'শাশ্বতী' কবিতায়। মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রিয় তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলো, আসক্তি দিয়েছিলো মুক্তি, খুলে গিয়েছিলো সেই স্বর্গের দুয়ার, যেখানে একবার পাওয়া গেলে কখনো আর হারানো যায় না। তাই তো

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর ক'রে ছিলো সাতটি অমরাবতী

এই তুলনাহীন পংক্তি দুটি তিনি লিখতে পেরেছিলেন।

কলাকৌশলের দিক থেকেও সুধীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি এইখানে যে বাংলা কথাগুলিকে তিনি প্রায়ই মৌল সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করেন। ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি তিনি বসাতে পারেন, পাঁচ কথার বদলে এক কথা বসালেই চলে এবং প্রতিটি কথাকে কেন্দ্র ক'রে একটি ভাবের পরিমণ্ডল বহুদূর পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়, ফলে কবিতায় একটি মনোরম সংহতি আসে। কিন্তু সেই রম্যতা যেন রাধার কণ্ঠহার, পাঠকের সঙ্গে পূর্ণমিলনে সেটা বাধারও সৃষ্টি করে। এ-ক্ষেত্রে পাঠকেরও কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই, কবির সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁরও প্রস্তুতি আবশ্যক, কিন্তু ভোজ্যবস্তু রূপে রসে ঠিক কী-রকম হ'লে তবে বলা যায় যে রান্না হয়েছে আর ভোক্তার রসনাতেই বা কতখানি আস্বাদের শিক্ষা থাকলে তবে তাকে নিমন্ত্রণের যোগ্য ব'লে ধরা যায়, এই কঠিন তর্কের মধ্যে এখন যাবো না; আপাতত এ-কথাই ধ'রে নেবো যে কবি সকলের জন্যই লেখেন, যে পড়তে পারে তারই জন্য, এমনকি যে শুনতে পায় তারও জন্য, আর সেই আদর্শে বিচার করলে এ-কথা বলতেই হয় যে কলাকৌশলে সুধীন্দ্রনাথের যা শক্তি, তা-ই তাঁর দুর্বলতা। আমি অনুভব করেছি যে তাঁর কবিতার গম্ভীর ধ্বনিগৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন অভিভূত হওয়া যায় না, প্রতি পংক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, কেননা শব্দগুলি পরিচিত হ'লেও তার ব্যঞ্জনা অপ্রচলিত। সমস্তটা মনে যখন ধরা দেয় তখন খুবই ভালো লাগে, কিন্তু ধরা দেবার লম্বা রাস্তা পার হ'তে-হ'তে তার রস কি একটু ঝ'রে যায়, একটু কি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে সুসজ্জিত বাক্যবাহিনী? আমি যে বলেছিলাম সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর আমার উপভোগের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যবধান দেখতে পেয়েছি, নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি সে-ব্যবধান এইখানে। যদিও তাঁর দু'একটি কবিতা (যেমন 'উত্তরফাল্গুনী'র 'প্রতিপদ') এখনো তার হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে উন্মোচন করেনি, তবু

বলতে পারি যে প্রথম পরিচয়ের সেই ব্যবধান এতদিনে অতিক্রম করতে আমি পেরেছি। কিন্তু আমি পেরেছি ব'লে সকলেই কি পারবে? নাই বা পারলো, কয়েকজন বাছা-বাছা পাঠক হ'লেই সুধীন্দ্রনাথের চলবে। কিন্তু সে-কথাই বা কেন? যা ভালো, তা সকলেরই ভালো কেন লাগবে না? আমার যা ভালো লেগেছে, আমি যা ভালো ব'লে বিশ্বাস করি তা সকলেই ভালো ব'লে স্বীকার করুক, এই আশা, এই ইচ্ছা থেকেই তো এ-বই লিখলাম, লিখে ছাপালাম, তাতেও ক্ষান্ত না-হ'য়ে আবার এই প্রবন্ধ লিখে নিজেই নিজের সমালোচনা করলাম, ভালোবাসার এতই গরজ। আমরা সকলেই কালের পুতুল তা জানি—যাঁদের সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে তাঁরাও, আর যিনি লিখছেন তিনিও—কিন্তু তাই ব'লে কালের হাতে সব সঁপে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি না তো; আমি যা ভালোবেসেছি তা অন্যেও ভালোবাসুক এটি মানুষের একটি আদিম অদম্য ইচ্ছা, এখনকার কথা এখনই ব'লে নিতে হবে, বুঝি মহাকালের বিচারে তা বাতিল হ'য়ে যায় সে-ভয় করলে চলবে কেন। আর অত ভয়ই বা কিসের—কবি ও সমালোচক কালের পুতুল হ'লেও কবিতা তা নয়, সাহিত্য তা নয়, ভালোবাসাও তা নয়। Love is not Time's fool. আমি যে সাহিত্য ভালোবেসেছি সে-কথাই তো এ-বইয়ের শেষ কথা, আমি যে ভালোবেসেছি সে-ই তো সব কথার শেষ কথা, ভালোবাসাই তো সেই চিরন্তন যা alters not as alteration finds—পরিবর্তন পরিবর্তিত করে না তাকে, জীর্ণ করে না কাল, ধ্বংস করে না মৃত্যু।

মুখ্য আর গৌণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার কিছু দেবার আছে, আমি তা দিয়ে যেতে চাই—এই ভাবে আর্টের সুরু। আর্টের গোড়ার কথা অন্তরের পূর্ণতাবোধ ও পূর্ণতার অঞ্জলি শূন্য করার কামনা।

এ যেমন গোড়ার কথা তেমনি মাঝখানকার কথা হচ্ছে কেমন করে শূন্য করব সেই কৌশল জানা ও প্রয়োগ করা। কেমন করে দিতে হয় সে বিদ্যা আমি শিখেছি, সে লীলা আমি সেধেছি—এই ভাবে আর্টের চলা।

তার পরের কথা দান। আমার যা দেবার ছিল আমি তা দিয়েছি, সেই সূত্রে আপনাকে দিয়েছি—এই ভাবে আর্টের সারা। আর্ট যখন সারা হয় তখন দেখা যায় অঞ্জলি শূন্য করে একজন তার পূর্ণতার দান দিয়ে গেছে, সেই ছলে নিজেকেও দিয়ে গেছে। এই হচ্ছে শেষ কথা।

সুরু ও সারার মাঝখানে দীর্ঘ পথ। এ পথ যে কেবল দীর্ঘ তাই নয় দুর্গমও বটে। সুতরাং সুরু করার আগে দশ বার ভাবা উচিত এ পথে পা দেব কি দেব না। জগতে করবার মতো কাজ অনেক আছে, আর্টই এক মাত্র করণীয় নয়। যদি কেউ সব জেনে শুনে এ পথে পা দেন তবে তাঁকে মনে রাখতে হবে এ পথের অন্য নাম কলাবিদ্যা বা লীলাসাধনা। এর কোন শর্ট কাট বা একলম্ফ নেই।

কিন্তু এই সামান্য কথাটা অনেকের মনে থাকে না। তাঁদের ধারণা যেমন তেমন করে বাজালেই তার নাম বীণাবাদন, যেমন তেমন করে গাইলেই তার নাম মার্গসঙ্গীত, যেমন তেমন করে লিখলেই তার নাম কথাসাহিত্য। না, আর্টের মধ্যে যেমনতেমনের স্থান নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত কেমন করার রাজত্ব।

কেমন করে লিখব বা গাইব বা আঁকব বা গড়ব এ চিন্তা যাঁর কাছে তুচ্ছ চিন্তা তাঁর উচ্চ চিন্তা নিয়ে তিনি দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি করুন, আর্ট তাঁকে দিয়ে হবে না। এ রাজ্যে উচ্চ চিন্তার মূল্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু যতক্ষণ না সে জিনিস আর্টে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে আর্ট বলার উপায় নেই। সে জিনিস একলম্ফে আর্ট হয়ে ওঠে না। মহাবীর মারুতি রামনাম বুকে এঁকে একলম্ফে সাগর পার হয়েছিলেন, কিন্তু রামায়ণ বা রামচরিতমানস যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা কেবল রামনামের মহিমায় কালসাগর পার হননি, কেমন করে লিখতে হয় সে বিদ্যা শিখেছেন ও তার সাহায্য নিয়ে কালসাগর পার হয়েছেন।

এর থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে আর্টের আসল কথাটা হোল কলাবিদ্যা, কোনো মহান সত্য বা গভীর প্রেরণা থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে, তবে তিনি ভুল করবেন। সে কালের অনেকে এ ভুল করেছিলেন, একালের অনেকে করছেন, ভাবীকালের অনেকেও করবেন। আমরা আর্টিস্টরা মায়া দিয়ে মনোহরণ করি, সেটা আমাদের স্বধর্ম্ম। কিন্তু তাই বলে সত্যকে গৌণ ও মায়াকে মুখ্য করতে যাইনে, যদি যাই তো আমরা সত্যিকার আর্টিস্ট নই, আমরা মায়াবী। মায়া যাঁদের সম্মোহিত করেছে তাঁরা আর্ট সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাঁরা নিজেরাও মজেন, অপরকেও মজান, শেষ পর্য্যন্ত কোথাও পৌঁছন না, পৌঁছে দেন না। সুরু থেকে সারা অবধি যে মাঝখানকার পথ সেই পথই তাঁদের বেঁধে রাখে, মুক্তি দেয় না। কী করে তাঁরা মুক্ত পুরুষ হবেন! আর আর্টিস্টের অন্য নাম তো মুক্ত পুরুষ। যে পুরুষ দানভারমুক্ত। যে কিছু হাতে রাখেনি, হাত খালি করে দিয়ে গেছে।

এই পথপাশবদ্ধদের কালোয়াৎ বলা যেতে পারে। কালোয়াতী সঙ্গীত আমাদের কানেই পশে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না। কালোয়াতী কবিতারও সেই স্বভাব। কালোয়াতী চিত্র, কালোয়াতী

ভাস্কর্য্য, কালোয়াতী নৃত্য—যত রকম কালোয়াতী আর্ট আছে তদের সকলেরই সেই প্রকৃতি। তারা মরমে পশে না। আর্টের যেখানে সারা তাদের সেখানে প্রবেশ নেই, তত দূর তারা পৌঁছয় না, মধ্য পথেই বাঁধা পড়ে। বিশুদ্ধ কালোয়াতীরও এক প্রকার রস আছে, সেটা কলাবিদ্যার নিজস্ব রস। কলারসিকরা সে রসের সমজদার। তাঁরা একখানি বিশুদ্ধ আলাপ শুনলে ধন্য হয়ে যান, তাঁকেই বলেন পিওর আর্ট। এই যদি হয় পিওর আর্ট তো এ শুধু অল্পসংখ্যক গন্ধর্ব্বের জন্যে। এঁরা মানুষ হলে এঁদের হৃদয় থাকত, এবং হৃদয়ের সমাজদারি অত সহজে মিটত না, হৃদয় চাইত হৃদয়ের নিবেদন। সত্যকারের সমজদার হচ্ছেন হৃদয়রসিক, সেই সঙ্গে কলারসিক। আর মায়ামুগ্ধ সমজদার হচ্ছেন বিশুদ্ধ কলারসিক। পিওর আর্ট বলতে যদি বোঝায় হৃদয়বিরহিত কালোয়াতী তবে তাকে আমি উঁচুদরের আর্ট বলতে কুণ্ঠিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাকে মুগ্ধ করে, অবাক করে, কিন্তু আমার হৃদয়ে পৌঁছয় না। শ্রুতিসুখে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু মর্ম স্পর্শ করে মর্মান্তিক সুখী করে না। সেইজন্যে মনে হয় জয়দেবও পথপাশবদ্ধ মায়াবী পুরুষ, মুক্ত পুরুষ নন। চণ্ডীদাস তাঁর বিপরীত।

আর্টের মধ্যে একটা মুক্তি আছে। যাতে তা নেই তা আর্ট হতে হতে হল না, কোন এক জায়গায় ঠেকে গেল। হয়তো কলাবিদ্যার একান্ত অভাব, নয়তো কলাবিদ্যার একান্ত অতিশয্য। কিম্বা এমনো হতে পারে যে গোড়াতেই গলদ। দান করবার মতো অন্তঃসার নেই। পূর্ণতাবোধ নেই। দান করার কামনা নেই। কামনার বেদনা নেই। যা আছে তা অন্য জাতের কামনা, যেমন ধনকামনা যশকামনা শক্তিকামনা। সুরুতেই যদি ছাই থাকে তো সারাতেও তাই থাকে। মাঝখানে থাকে ভস্মে ঘি ঢালা। কলাবিদ্যার অপচয়।

তবে অনেক সময় ছাইঢাকা আগুনও থাকে। ঘি ঢালতে

ঢালতে জ্বলে ওঠে। ঘৃতের কিছু অপব্যয় হয়, কিন্তু একেবারে অপচয় নয়। সেইজন্যে কোনো কবিযশঃপ্রার্থীকে উপহাস করতে নেই। উৎসাহ দিয়ে বলা উচিত, "লিখুন, লিখতে থাকুন, লিখতে লিখতেই হবে।" এটা স্তোকবাক্য নয়। লিখতে লিখতে কত লেখক নিজেকে পেয়ে গেছেন। পেয়ে গেছেন নিজের বাণী, নিজের ধ্যান, নিজের যা শ্রেষ্ঠ, নিজের যা সত্য। কিন্তু লিখতে লিখতে মানে যেমন তেমন করে লিখতে লিখতে নয়। কেমন করে লিখতে হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে লিখতে লিখতে। কলাবিদ্যার অনুশীলন করতে করতে। গাইতে গাইতে কেউ গুণী হয় না, কেমন করে গাইতে হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে গাইতে গাইতে গুণী হয়, যদি তার ভিতরে গুণ থাকে, আগুন থাকে।

"তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী—" রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটিতে ঝোঁক পড়েছে কেমন করে'র উপর। গানের উপর নয়। এই 'কেমন করে' আছে বলেই 'গুণী' আছে। চর্চ্চা করতে করতে গুণ ফুটে ওঠে, আগুন জ্বলে ওঠে। সুরের আগুন তো বটেই, হৃদয়মনের আগুন। বৈষ্ণবকবিরা যাকে বলেন "হিয়া দগদগি অন্তরদাহনি।" তার পরে আর ভস্মে ঘি ঢালা নয়, আগুনে ঘি ঢালা।

আর্টের ইতিহাসে সব রকম পথিক দেখা যায়। কেউ পথকেই সর্ব্বস্ব করে কালোয়াৎ হলেন, কেউ পথসংক্ষেপ করতে গিয়ে বেরসিক। সেই যিনি বলেছিলেন, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" তাঁর যে কিছু বলবার ছিল না তা নয়। তবু তিনি হলেন চিরকাল হাস্যাস্পদ, অথচ সেই কথা আরেকজনের মুখে রূপ নিল, "নীরসঃ তরুবরঃ সম্মুখে ভাতি" আর তিনি হলেন কবির কবি। সেই থেকে একটা সূত্র রচিত হলো, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" অন্যান্য সূত্রের মতো এটিও মনে রাখার সুবিধার জন্যে। এর মধ্যে কাব্যের সব কথা নেই। রস যার আত্মা এমন যে বাক্য সেই হচ্ছে কাব্য। কিন্তু কোন রস? কথার পর পর কথা সাজিয়ে গেলে তারও তো একটা রস আছে।

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো" এটা শুধু প্রেমিকার অত্যুক্তি নয়। শব্দের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, উপমার মধ্যে, অলঙ্কারের মধ্যে স্বকীয় একটা রস আছে। সেটা বিষয়নিরপেক্ষ। প্রেরণা-নিরপেক্ষ। কালোয়াতেরা এ রসের সন্ধান রাখেন। কিন্তু শুদ্ধমাত্র এই রসই কাব্যের মূলতত্ত্ব নয়। কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হৃদয়রসই সেই রস যাকে বলা যেতে পারে কাব্যের আত্মা। সেই রসে রসাত্মক না হলে কাব্য কখনো কাব্য হতে পারে না, কলা কখনো আর্ট হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো কবিতা

কোনো-এক সময়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে ছোটো মাপের কবিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার পক্ষে অনুকূল নয়, সে-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই পরিসর, চাই অবসর, চাই ব্যাপ্তি; ছোটো কবিতায় যেখানে তিনি নিজেকে ঢেলে দিতে পেরেছেন, সেখানে কবিতা হয়েছে গান, কথার কৃপণতা দ্বিগুণ পূরণ করেছে সুর। কথাটা আমি বলেছিলাম চৈতালি প্রসঙ্গে; চৈতালির চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ প'ড়ে আমি কখনোই আত্মহারা হ'তে পারিনি—কেননা আমার মনে সব সময় জেগে আছে ইওরোপীয় সনেটের আদর্শ, সে-দৃঢ়তা, সে-গাম্ভীর্য, সে-ঘনবিন্যস্ত কারুকর্ম, সর্বোপরি সেই রুদ্ধশ্বাস আবেগ শুধু চৈতালিতে কেন, এমন যে শুচিস্নিগ্ধ নৈবেদ্য, তাতেও নেই। চোদ্দ মাত্রার পংক্তি এবং পংক্তিপ্রান্তিক মিল—এ-দুটিই আমার মনে হয় সনেটের অনুপযোগী—প্রতি পক্তির শেষে যতিপাত তো নিশ্চয়ই। অথচ চৈতালি-নৈবেদ্যে এই তিনটি লক্ষণই বর্তমান: চৈতালির চতুর্দশপদীতে অধিকাংশ পংক্তিই যতিপ্রান্তিক, নৈবেদ্যে প্রবহমানতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও কল্লোল নেই, তরঙ্গ নেই—উভয় গ্রন্থেই যুক্তবর্ণ বিরল এবং মিলগুলি বিস্ময়বর্জিত ব'লে সনেটের স্বরূপটি প্রস্ফুটিত হবার আরো বাধা হয়েছে। পংক্তিগুলি দীর্ঘ, প্রবহমান, এবং মিলগুলি একটু দূরে-দূরে বসানো ও অন্তত মাঝে-মাঝে বিস্ময়জনক না-হ'লে সনেটের রস জমানো শক্ত। ছোটো পংক্তি, পংক্তিপ্রান্তিক মিল ও যতিপ্রান্তিক পংক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে কবিতায় কেমন-একটা গুনগুনানির ভাব আসে, ইংরেজিতে যাকে বলে sing-song—সনেটের আত্মার সঙ্গে যার মৌল বিরোধ। এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মনে ধরা পড়েনি তা হ'তেই পারে না; উত্তরজীবনে যে-স্বল্পসংখ্যক চতুর্দশপদী তিনি লিখেছিলেন, পূরবীতে

'সমুদ্র', মহুয়াতে 'স্পর্ধা', 'রাখীপূর্ণিমা', 'আহ্বান'—এগুলি সবই আঠারো মাত্রার, এবং মিল যদিও পংক্তিপ্রান্তিকই, পংক্তিগুলির দুরন্ত প্রবহমানতা ও যুক্তবর্ণের সুমিত বিন্যাসের জন্য তাতে একঘেয়েমি প্রবেশ করতে পারেনি। পূরবীর 'শেষ অর্ঘ্য' কবিতাটি শুধু চোদ্দ মাত্রায় লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে মিল দিয়েছিলে অভিনব বৈচিত্র্যে—মাত্র চারটি মিল বারো পংক্তিতে বিতরিত, পঞ্চম মিলের শেক্সপীরিয় দ্বিপদীতে কবিতাটি শেষ—সব মিলিয়ে চোদ্দ মাত্রার চতুর্দশপদীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা এটি। উত্তর-রবীন্দ্রের এই চতুর্দশপদী ক'টির সঙ্গে চৈতালি নৈবেদ্য পাশাপাশি পড়লে যে-কোনো অভিজ্ঞ পাঠকই স্বীকার করবেন যে শেষের রচনা ক'টিতেই সনেটের ইওরোপীয় সৌকর্য প্রতিভাত হয়েছে।

কিন্তু চৈতালি নৈবেদ্যকে ইওরোপীয় সনেটের আদর্শে বিচার করা কেনই বা। সনেট না-হয় না-ই বলা হ'লো—না-ই বা এঁটে দিলাম কোনো নামের লেবেল—কবিতা হিশেবেই দেখা যাক। কিন্তু কবিতা হিশেবেই একদিকে মানসী সোনার তরী কল্পনা অন্যদিকে ক্ষণিকা বলাকা পূরবীর তুলনায় চৈতালি নৈবেদ্যকে একটু কি ম্লান মনে হয় না? মনে কি হয় না, কবি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না, পরিসরের অভাবে, বৈচিত্র্যের অভাবে তিনি যেন ক্লিষ্ট? ছোটো কবিতা আকারে ছোটো ব'লেই যে তুচ্ছ নয়, কিংবা বড়ো কবিতার বিচ্ছিন্ন অংশমাত্রও নয় সে, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, রসের ঐশ্বর্যে বড়ো মাপের কবিতার সমকক্ষ, এ-কথা কি সমগ্রভাবে চৈতালি নৈবেদ্য প'ড়ে মনে হয়? তাতে কি সেই আবেগঘন উত্তাপ আছে যা আমরা পেয়েছি প্রাচীন গ্রীক কবি সাফোর টুকরো ক'টিতে, কিংবা সেকালের ল্যাণ্ডর আর একালের এজরা পাউণ্ডের আট লাইনের, চার লাইনের, এমনকি দু'লাইনের কবিতায়? এর উত্তরে অবশ্য এ-কথা বলবার আছে যে রবীন্দ্রনাথের গানই তো তাঁর ছোটো কবিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—এমন আশ্চর্য ছোটো-ছোটো লিরিক এমন অজস্র পরিমাণে

পৃথিবীর আর কোন কবি লিখেছেন? সুরের জন্যই তো তাঁর গানের মূল্য নয়, নিছক কবিতাহিশেবেই তার মহিমা কি রবীন্দ্রনাথেরই যে-কোনো রীতিমতো কবিতার চাইতে কম? তা নিশ্চয়ই নয়, তবু রীতিমতো কবিতা আর গীতি-গত কবিতায় এটুকু প্রভেদ মানতে হবে যে দ্বিতীয়টির রচনায় কবি সুরের সহায় পেয়েছেন, সে-সুর যখন আমরা কানে না-ও শুনি, তখনও তার নিশ্বাস অনুভব করি—এমনকি ঠাণ্ডা ছাপার অক্ষরের ভিতর থেকেও তার উষ্ণতা আমাদের স্পর্শ করে। গানের জগতে প্রবেশ করলে রবীন্দ্রনাথকে যেমন ছোটো কবিতারই রাজা মনে হয়, তেমনি, অগেয় কবিতার দিক থেকে, আমার এ-ধারণাও মূলত সত্য ব'লেই মনে করি যে ছোটো কবিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার সে-রকম অনুকূল নয়।

ছোটো কবিতার প্রসঙ্গে কণিকাকে আমি ভুলিনি। কিন্তু কণিকা তো ঠিক কবিতা নয়, প্রতিভাপ্রদীপ্ত উপদেশ, ছন্দোবদ্ধ জ্ঞানচুম্বক, কৌতুকে, বুদ্ধিতে, বাকনৈপুণ্যে, সংক্ষেপীকরণে ইংরেজি এপিগ্রাম ও ফরাশি অ্যাফরিজম-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। কণিকা আমাদের ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে, কিন্তু কবিতা ভালো লাগা আর এ-ভালো লাগায় জাতেরই তফাৎ।

গান নয়, চতুর্দশপদী নয়, উপদেশ নয়, রবীন্দ্রনাথের এমন ছোটো কবিতা আমরা প্রথম পেলাম লেখনে। আর সে-কবিতা একেবারেই ছোটো—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিতিকা—দু'চার আট লাইনেই পরিসমাপ্ত। প্রথম প্রকাশের সময় লেখনের রসবস্তুর চাইতে এ-কথাটাই বাঙালি পাঠকসমাজকে বেশি ক'রে আকর্ষণ করেছিলো যে সেটি কবির হাতের লেখায় জর্মনিতে ছাপা হয়েছে। মনেই পড়ে না লেখনের কোনো রচনা সম্বন্ধে কারো মুখে কিছু শুনেছিলুম, যতদিন না সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যের 'স্মরণীয় নমুনা' হিশেবে তাঁর একটি প্রবন্ধে এই কবিতাটি উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছিলেন:

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

এ-রকম 'স্মরণীয় নমুনা' লেখনে আরো অনেক আছে। প্রথম কবিতাটি ঝকঝক করছে একটি মণিকারই মতো:

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা।

যুক্তবর্ণ তিনটি কী সুন্দর বসেছে, কী মধুর অনুপ্রাসের অনুরণন। এই কবিতিকার ধ্বনি যে বাংলার কাব্যপ্রবাহে তরঙ্গ তুলেছে তার প্রমাণ বিষ্ণু দে-র

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

লেখনের আর-একটি মণিকা:

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলির বৈশিষ্ট্যই এই যে তারা প্রত্যেকে এক-একটি সম্পূর্ণ কবিতা। লেখনের সমস্ত রচনাতেই যে এ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান সে-কথা বলা যায় না, যেমন

তোমারে প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
জানি তবুও জানি নি।
সকল কথা বলো নি অভিমানিনী।

এখানে মন আরো চায়, মনে হয় কবি যেন একটি সুন্দর কবিতা আরম্ভ ক'রেই থেমে গেলেন, আর লিখলেন না। তবু, মোটের উপর, আণবিক আয়তনের মধ্যে সুসম্পূর্ণ স্মরণীয় কবিতার সংখ্যা লেখনে আশ্চর্যরকম বেশি—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্তই আশ্চর্য বলবো, কারণ এ-ধরনের রচনায় তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রেরণা নেই। হয়তো জাপানি কাব্যাদর্শ এ-সময়ে তাঁর মনে প্রভাববিস্তার করেছিলো, কেননা তিনি জানিয়েছেন যে লেখন আরম্ভ হয়েছিলো চীন-জাপানে ভ্রমণকালে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে' এবং প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও উল্লেখ করেছেন যে 'জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন লিখে দিতে আমি কুণ্ঠিত হইনি।' অনুরোধের তাগিদে আরম্ভ ক'রে 'এইরকম ছোটো-ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগলো তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হ'য়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি।' ছোটো কবিতার এই টলটলে জ্বলজ্বলে রূপটি এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করেছিলো তাঁর আপন স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে, তাই লেখনে এমন একটি কাব্যরূপের প্রবর্তনা তিনি করতে পারলেন, যা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথে ছিলো না, বাংলা ভাষাতেই না।

লেখনের জুড়ি-বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে স্ফুলিঙ্গ * নাম নিয়ে। প্রকাশক জানিয়েছেন যে লেখনের সগোত্র এই রচনাগুলি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন লেখনের সমসাময়িক, পরবর্তী ও বহুপূর্ববর্তী বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি এবং নানা স্নেহভাজনের স্বাক্ষরলিপিকা † থেকে—তা ছাড়া 'ছন্দ' বইয়ে

* স্ফুলিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, চার টাকা।

† Autograph Book-এর তর্জমা বিশ্বভারতী করেছেন স্বলেখনসংগ্রহ। কিন্তু এই দুরূহ শব্দটির প্রবর্তনার প্রয়োজন আছে কি? রবীন্দ্রনাথ autograph অর্থে স্বাক্ষরলিপি ও autograph book অর্থে স্বাক্ষরলিপির খাতা ব্যবহার করেছেন, এর উপর আর সংশোধন করতে যাওয়া অনর্থক মনে হয়, তবে দ্বিতীয় অর্থে স্বাক্ষরলিপিকা হয়তো চলতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ব্যবহৃত স্তবকগুলিও মুদ্রিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। নানা সময়ের, নানা মেজাজের, নানা উদ্দেশ্যের ১৯৮টি কবিতিকা সব সুদ্ধু স্থান পেয়েছে, আকারের ক্ষুদ্রতাই তাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। উপভোগের উপাদান আছে প্রত্যেকটি কবিতাতেই। কোথাও একটু ঝিরিঝিরি হাওয়া, কোথাও একটু ঝিকিমিকি আলো, কোথাও কৌতুকের কণা, কোথাও সংহত তত্ত্বকথা বা উপদেশ, আর কোথাও বা বিশুদ্ধ কবিতা। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বেদনা বিকীর্ণ হয়েছে অনেকগুলি রচনায়—

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই।

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত,
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

কোনো-কোনো কবিতা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের সতীর্থ, যেমন ২১ সংখ্যকটি ('আমি বেসেছিলাম ভালো সকল দেহে মনে এই ধরণীর ছায়া আলো আমার এ জীবনে···), আর

দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে
দুঃখ সহিবার শক্তি
যেন পাই মনে।

একে মনে হয় 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা'র সংক্ষেপীকৃত পাঠান্তর, এবং এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে এ ছাড়াও আরো কয়েকটি রচনায়। আবার হয়তো, যেমন লেখনের শেষ অংশের দ্বিপদীগুলিতে, কণিকার ভাব এসে পড়লো—

সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে

অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

এরই পাশে-পাশে ঠাট্টাও আছে—

'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

আছে নিজেকে অবলম্বন ক'রে কৌতুক—

বড়ই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা।

কোথাও বা হঠাৎ-লাগা কথার ঢেউ খামকা ছলছলিয়ে উঠলো—

ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা
নৃত্যদোলায় দাও দোলা,
বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে
তরণী হয় পথভোলা।

আবার এই তরঙ্গ থামতে-না-থামতেই হয়তো দেখা দিলো শেষ কবিতাগুচ্ছের শুভ্র নিরাভরণ মহিমা—

সময় আসন্ন হলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের
আনন্দের আশা রাখিলাম
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

এই সুরই লেগেছে ৬২, ১৯৫, ১৯৬ সংখ্যক রচনায়, এবং ১২৩ সংখ্যকটিকে মনে হয় 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে, পরানে বসন্ত এলো কার মন্তরে' এই অপরূপ দ্বিপদীর পাঠান্তর।

স্ফুলিঙ্গের রচনাগুচ্ছে ভাবের ও ভঙ্গির বিচিত্রতা যে কত, সেইটে বোঝাবার জন্য এ-উদাহরণগুলি দিলাম। বইখানা সংকলনিকা গোছের হয়েছে—না-হ'য়ে উপায়ই বা কী—কোনো-একটা নির্দিষ্ট সুর তো এতে আশাই করা যায় না। অধিকাংশ হয়তো কবিতা হিশেবে লেখাই নয়, স্বাক্ষরসংগ্রাহকের দাবি মেটানোর নিদর্শন, কিংবা কোনো-একটি ভাবের প্রথম রেখাপাত, যা পরে মূর্ত হয়েছে অন্য-কোনো কবিতায় বা গদ্যরচনায়। তাই ব'লে এ-কথা মনে করা অত্যন্ত ভুল হবে যে বইখানা পরিচিত প্রিয় কবিতার প্রতিধ্বনিতে আর অসতর্ক দ্রুত মুহূর্তে উৎক্ষিপ্ত পদ্যপংক্তিতে ভরা। উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথ যেখানে এসেছিলেন, সেখান থেকে এমন-কিছু তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভবই হ'তো না যা সৌন্দর্য থেকে চ্যুত কিংবা যাতে কোনোখানেই কোনো রসের আমেজ লাগেনি—হোক তা কোনো সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অনিচ্ছুক অভিমত, হোক তা কোনো তত্ত্বান্বেষী উৎপীড়কের পত্রের উত্তর, হোক তা অটোগ্রাফের খাতায় দু'লাইন পদ্য। ছন্দের আলোচনা করতে-করতে সঙ্গে-সঙ্গে উদাহরণ বানিয়ে গেছেন—তা-ই বা কত সুন্দর। স্ফুলিঙ্গের পাতায়-পাতায় তাঁর সেই অদম্য সৌন্দর্যের স্বাক্ষর তো রয়েছেই। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, কয়েকটি রচনা পেলাম, যা বিশুদ্ধ কবিতা, সুসম্পূর্ণ, এটুকু আয়তনের মধ্যেই সর্বাঙ্গসুন্দর, যা সঞ্চয়িতার পরবর্তী সংস্করণের অন্তর্গত করতে বিশ্বভারতী বাধ্য হবেন, এবং স্ফুলিঙ্গে যার দেখা পেতে আমি আশাই করতাম না, যদি না বিশ্বভারতী পূর্বাহ্ণেই তাঁদের বিজ্ঞাপনে এই আশ্চর্য সুন্দর কবিতাটিকে প্রচার করতেন :

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে
　　একটি শিশির বিন্দু।

এই কবিতায় সমস্ত বইটির মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে : একটি শিশিরবিন্দুতে যে আকাশব্যাপী রবিপ্রতিভা প্রতিফলিত হ'তে পারে, স্ফুলিঙ্গের কোনো-কোনো কবিতা তো তারই প্রমাণ। এইরকম হিরে-জ্বলা শিশিরকণা আরো দু' একটি চয়ন করি :

তুমি যে তুমিই, ওগো
　　সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
　　শুধি চিরদিন।

ব্যস—আর-কিছু না, আর-কিছু দরকারও করে না, এটুকুতেই মন কূলে-কূলে ভ'রে উঠলো।

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হ'তে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
　　নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
　　প্রকাশ করিল আত্মীয়-গৃহখানি।

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
　　মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
　　পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
　　সমস্ত দিন চলেছি একরোখে।

দিনের শেষে পথের অবসানে
　　মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
　　পাবার জিনিস ছিল সারে সারে।
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
　　পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।*

এই দুটি কবিতা বার-বার প'ড়ে বার-বার আমার মন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে—এদের আঙ্গিক সরলতার অন্তরালে পরতে-পরতে অভিব্যক্তির গভীরতা আবিষ্কার ক'রে অবাক হয়েছি আমি, মুগ্ধ হয়েছি। আর এমনও নয় সে সমস্ত বইয়ের মধ্যে মাত্র দুটি চারটি রত্নই চোখে পড়েছে আমার। উদাহরণের ভিড় আর বাড়াবো না, সেইজন্য ব'লে রাখি যে ৪৮, ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৯৭, ১০৩, ১১৪, ১৩৪, ১৮০, ১৯০, ১৯৫ ও ১৯৬ —অন্তত এ-ক'টি রচনায় কবিতার সেই চিরসত্তাই দেদীপ্যমান, যাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না পরিমাণের ক্ষীণতা, আবার পরিমাণের পীনতা দ্বারা যার অভাব ঢাকা দেয়া যায় না।

ছন্দের দিক থেকে স্ফুলিঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য জিনিশ লক্ষ্য করলাম। বাংলা ছন্দ নিয়ে প্রায় সমস্ত রকম পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, শুধু প্রবেশ করেননি সেই মিশ্র-ছন্দের ক্ষেত্রে, ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্রী ভর্স। ইংরেজি ফ্রী ভর্সে গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে, দু'তিন রকম পদ্যছন্দ পাশাপাশি থাকলেও আপত্তি নেই। বাংলায় এই মিশ্র-ছন্দ ব্যবহারের চেষ্টা আমাদের তরুণতর কবিদের মধ্যে কেউ-কেউ করেছেন—সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ যে কখনো করেননি তাতে আমার অবাক লেগেছে। মনে-মনে আমার একটা ধারণা ছিলো যে আর-কিছুদিন সময় পেলে বাংলায় এই মিশ্র-ছন্দের সুমিষ্ট সুন্দর রূপটি রবীন্দ্রনাথই সৃষ্টি করতেন, সে-ধারণা যে অলীক নয় স্ফুলিঙ্গে তার

* এই কবিতার দুটি স্তবকের মধ্যে একটু ফাঁক না রাখায় স্ফুলিঙ্গের মুদ্রণ-পারিপাট্য ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রমাণ পাওয়া গেলো। একই কবিতায় দু' জাতের ছন্দ সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এ-পর্যন্ত কখনোই আমার চোখে পড়েনি * তাই

অপরাজিতা ফুটিল
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

প'ড়ে চমকে উঠতে হ'লো। এখানে প্রথম ও চতুর্থ পংক্তি তিন মাত্রার ছন্দে, অবশিষ্ট পয়ারজাতীয়। প্রবোধচন্দ্র সেন বলবেন মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক। তা নাম যা-ই হোক, দুটি স্বতন্ত্র ছন্দ যে এখানে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অথচ পড়তে কোথাও খটকা লাগে না, সমস্তটি মসৃণভাবে মানিয়ে গেছে। ৮৩ সংখ্যক কবিতায় মেশানো হয়েছে ছড়ার ছন্দ আর তিন মাত্রার ছন্দ, প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত।

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।

এখানে প্রথম চরণ স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয় চরণ মাত্রাবৃত্ত। সমস্ত কবিতাটিতে (স্ফুলিঙ্গের পরিমাপে এটি একটু বড়ো) স্বরবৃত্তেরই প্রাধান্য, কিন্তু শেষের দিকে আবার মাত্রাবৃত্ত এসেছে :

---

* শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে দেখিয়েছেন যে 'মেঠো-পথের পথিক' কবিতার শেষ স্তবকে ছন্দের জাত বদলে গেছে—স্বরবৃত্ত রূপান্তরিত হয়েছে মাত্রাবৃত্তে। কিন্তু এ-কথা মনে করা যায় না যে ওখানে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা ক'রে ছন্দ বদলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া গানে কখনো-কখনো একই রচনায় দু'রকমের ছন্দের আভাস এসেছে—তবে তাকে মিশ্র ছন্দ ব'লে কেউই ভুল করবে না—সুরের তাগিদে কাব্যছন্দ ভাঙা-ভাঙা হয়েছে, এলোমেলো হয়েছে, ব্যাপারটা হ'লো এই।

মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ঐ যে ছায়াখানি।

এরই মধ্যে আবার একটু বিভঙ্গ আছে—'মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের অগ্নিরেখার বাণী' মাত্রাবৃত্ত, 'ঐ যে ছায়াখানি', স্বরবৃত্ত। আশ্চর্য এই যে দুই ছন্দ চমৎকার মিলে-মিশে আছে, বাধা নেই, বিরোধ নেই, বরং দুয়ের সংযোগে একটি অভিনব মধুরতারই আভাস দিচ্ছে। দেখে-শুনে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ মনস্থির ক'রেই মিশ্র-ছন্দের সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু এ-পথে অগ্রসর হবার সময় আর হ'লো না।

গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশক জানিয়েছেন যে 'বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা যাইতে পারে এমন সব কবিতাই যে সন্ধান করিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়। যাঁহাদের স্বলেখন সংগ্রহে এইরূপ অন্য কবিতা আছে তাঁহারা সেগুলি পাঠাইলে তাঁহাদের আনুকূল্য স্বীকার-পূর্বক সেগুলি নূতন সংস্করণ যোগ করা যাইতে পারে।' এই সংস্করণে যাঁদের স্বাক্ষরলিপিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা মাত্র ৫৭, এবং নামের তালিকা দেখে বোঝা গেলো যে অধিকাংশই কবির আত্মীয়, বন্ধু বা সমীপবর্তীর মণ্ডলীভুক্ত। অথচ শুধু বাংলাদেশেই অসংখ্য স্বাক্ষরলিপিকায় তাঁর লেখনীর প্রবেশিকা হয়েছিলো নিশ্চয়ই, স্ফুলিঙ্গ তার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশেরই প্রতিরূপ। অবশিষ্ট অসংখ্যকে উদ্ধার করবার রীতিমতো চেষ্টা বিশ্বভারতীকে করতে হবে, এবং যাঁদের কাছে কবির এ-ধরনের অপ্রকাশিত রচনা এখনো গুপ্ত হ'য়ে আছে তাঁদের কর্তব্য সেগুলি জানিয়ে সর্বসাধারণের অধিগম্য করা। বলতে-বলতে মনে পড়লো যে ছেলেবেলায় আমারও একটি অটোগ্রাফ খাতা ছিলো, এবং রবীন্দ্রনাথ যেবার ঢাকা গিয়েছিলেন, আরো অনেকের সঙ্গে তাঁর প্রসাদ-কণিকা আমিও পেয়েছিলাম। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি যে খাতাটি আমি বহুদিন

হ'লো হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু কবিতিকাটি আমার মনে আছে, সেটি এখানে উদ্ধৃত করি :

বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে
বিশ্বকবির দান,
আঁধার-বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
তারার বহ্নিগান। *

* আমি জানি যে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাগুচ্ছের উল্লেখ না-ক'রে তাঁর ছোটো কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। রোগশয্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর কবিতায় ভাষণ ও ভূষণ দুই-ই বিরল হ'তে আরম্ভ করে, যে-বিরলতার চরম পরিণতি দেখা গেলো শেষ লেখায়। এ-সময়টায় তাঁর কবিতা যে আকারে ছোটো ছাড়া প্রায় হ'তোই না, হয়তো দুর্বহ দেহবৈকল্য তার একটা কারণ। কিন্তু সে-অভিশাপকে তিনি আশীর্বাদে পরিণত করেছিলেন—এই কবিতাগুচ্ছে লেগেছে পর্বতচূড়ার শান্ত আত্ম-সমাহিত সৌন্দর্য, তারপর শেষ লেখায় কবিতা হ'য়ে উঠলো বিশুদ্ধ ধ্যানীর বাণী, কথার সামান্যতম ছলটুকু মাত্র রইলো, তাছাড়া সমস্তটাই তৃতীয় নয়নের স্বপ্নজ্যোতি। স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না-করলে এই কবিতাগুচ্ছ সম্বন্ধে যথেষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, তাই এখানে উল্লেখমাত্র ক'রেই ক্ষান্ত হলাম।

সমালোচনা

ROMAIN ROLLAND : THE STORY OF A CONSCIENCE : by Alex Aronson. Padma Publications Ltd., Bombay.

ROLLAND AND TAGORE : Edited by Alex Aronson and Krishna Kripalani. Visva-Bharati, Rs. 3/8/-

ডক্টর এরনসন সুপণ্ডিত। ইওরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লালিত, অনেকগুলি ভাষায় অভিজ্ঞ, পাশ্চাত্য সংগীতের ভোক্তা ও বোদ্ধা। কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, এখন আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশে শিক্ষকরূপে বসবাস ক'রে ভারতবর্ষকেও তিনি বুঝতে শিখেছেন। এই সব কারণে রলাঁ সম্বন্ধে বই লেখবার বিশেষরূপে যোগ্য তিনি। বলা দরকার যে আলোচ্য বইটি রলাঁর মৃত্যুসংবাদ বেরবার পর তাড়াহুড়ো ক'রে লেখা হয়নি; রলাঁর বিশ্বমানবিক বিবেকের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ডক্টর এরনসন এই সুচিন্তিত বইখানা লিখেছেন। বইখানাতে যাঁরা জীবনচরিতের উপাদান খুঁজবেন তাঁরা নিরাশ হবেন; কিন্তু কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত রলাঁর আন্তরিক বিবর্তন ও পরিণতির ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে। ইওরোপের যে-যুগ এই যুদ্ধের সঙ্গে শেষ হ'লো, সেই যুগের বিবেকের প্রতিমূর্তিরূপে লেখক রলাঁকে দেখেছেন ও এঁকেছেন। কর্মী তিনি কখনো নন—কুখ্যাত ড্রেফাস-মামলার সময় জোলা কি আনাতোল ফ্রাঁসের মতো যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না-প'ড়ে তরুণ রলাঁ একটু দূরে স'রে সাময়িককে চিরন্তনের পটভূমিকা দিয়ে নাটক লিখলেন—মনীষার এই নির্লিপ্ততা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ছিলো—যদিও বিপ্লবী রাশিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, কবিকে খাকি পরাবার প্রস্তাবে কখনো তাঁর মন সায় দেয়নি, আন্তর্জাতিক মনীষী-মণ্ডলের ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁর আস্থা ছিলো অটুট। ইতিহাসের উত্থান-পতন, যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষের ভিতর দিয়ে রলাঁ ছিলেন সত্যের বাহন, ন্যায়ধর্মের স্বর, মনুষ্যত্বের পতাকা। একান্তভাবে সত্যকে আশ্রয় করলে পৃথিবীর হাতে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়, এই পুরাতন নীতির ব্যতিক্রম রলাঁর জীবনে হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে রলাঁ যখন তার মাতৃভূমির সঙ্গে প্রতিবেশী জর্মানির মিলনসাধনের ব্রত নিয়েছিলেন, যখন পরাজিত জর্মানির অন্নহীন অন্ধকার তাঁর হৃদয়কে দ্রব করেছিলো, তখন উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলি সহস্রফণা সর্পের মতো একযোগে বিষাক্ত দংশন করেছিলো তাঁকে। রলাঁ যে সত্য বলেছিলেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তা প্রমাণিত হ'লো কিনা জানি না, কিন্তু এ-যুদ্ধের শেষে যখন দেখা যাচ্ছে যে ফ্রান্সের অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ জীবিত লেখককে 'গুপ্তচর' সন্দেহে বন্দী করা হয়েছে, এবং তাঁদের অনেকের জন্যই হয়তো নির্ভুল গুলি কিংবা নিরপেক্ষ গিলোটিন অপেক্ষা ক'রে আছে, তখন এ-কথা মনে না-ক'রে পারা যায় না যে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই রলাঁ যে পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেলেন সেটাই ভালো হ'লো—ফ্রান্সের বর্তমান ভাগ্যবিধাতার বিচারে যে বৃদ্ধ রলাঁই 'গুপ্তচর' প্রতিপন্ন হতেন না, তার বিশ্বাস কী।

এই উজ্জ্বল অকলুষেয় বিবেকের একটি সম্পূর্ণ কাহিনী ডক্টর এরনসন তাঁর দু'শো পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। পড়তে-পড়তে এ-কথাটাই স্পষ্ট হ'য়ে মনে জাগে যে অন্য-কোনো ফরাশি লেখকের সঙ্গেই রলাঁর তুলনা হয় না, ফরাশি সাহিত্যের ইতিহাসে রলাঁর রচনাবলী একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। তাঁর যৌবনে ফরাশি সাহিত্যে ছিলো মোপাসাঁ জোলার বাস্তবিকতার রাজত্ব; কিন্তু রলাঁকে তা আকর্ষণ করলো না, তিনি ও তাঁর কয়েকটি তরুণ বন্ধু সন্ধান ক'রে ফিরলেন ভাবুকতার, বিশাল কল্পনার, স্বপ্নময় দিগন্তের, আবিষ্কার করলেন শেক্সপিয়র হ্বাগনার টলস্টয়কে। রলাঁর রচনায় দেখা যায় ফরাশি প্রভাবের বিস্ময়কর ক্ষীণতা, তাঁর নিজের সাহিত্যের মূল ঐতিহ্যকে যেন প্রথম থেকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বিখ্যাত ফরাশি লঘুতার কিছুমাত্র তাঁর মধ্যে নেই, নেই বিদ্রূপ, নেই রসিকতা, নিষ্ঠুরতাও নেই; প্রথম থেকেই তাঁর রচনা গভীর, গম্ভীর, কবিত্বদীপ্ত, চরম মূল্যের সন্ধানী। সাহিত্যজীবনের প্রথম অধ্যায়ে শেক্সপিয়রের আদর্শে গ্রীক-রোমান কাহিনী ও স্বদেশের ইতিহাস অবলম্বন ক'রে কতগুলি নাটক লিখলেন, People's Theatre স্থাপন করবার স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু তৎকালীন প্যারিসের আবহাওয়া অনুকূল ছিলো না, হ'লো না কিছুই। তারপর শুরু হ'লো মহত্ত্বের অশ্রান্ত অন্বেষণ; মাইকেলেঞ্জেলো, বীটোফেন, টলস্টয়—পর-পর ইওরোপের এই তিন মহামানবের জীবনচরিত প্রকাশিত হ'লো। আর তারপর প্রকাশিত হলেন রলাঁ নিজে—'জাঁ ক্রিসতফ' উপন্যাসে। উপন্যাস না-ব'লে কাব্য বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। রলাঁর কোনো পূর্বতনের চিহ্ন নেই 'জাঁ ক্রিসতফে'—কোনো পরবর্তীর পূর্বাভাসও নেই—এ-বই অন্য-কোনো ফরাশি লিখতে পারতেন এ-কথা ভাবাই যায় না, না ভলতেয়ার, না ফ্লোবেআর, না জোলা, না প্রুস্ত্। ফরাশি সাহিত্যের আপন স্বভাবটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস করাই শক্ত যে 'জাঁ ক্রিসতফ' ফরাশি বই।

'জাঁ ক্রিসতফ' লেখা হয়েছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের আগে, প্রকাশিত হয়েছিলো তার পরে। রলাঁর বয়স তখন চল্লিশের উর্ধ্বে। বারোখানা নাটক এবং তিনটি অতুলনীয় জীবনচরিত সত্ত্বেও ফরাশি পাঠকসমাজে তখন পর্যন্ত তিনি অপরিচিত। 'জাঁ ক্রিসতফ' লিখে তিনি বিখ্যাত হলেন—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণ ও-বইকে, কিংবা তার লেখককে, কখনোই খুব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি—সকলেই জানেন যে জাঁ ক্রিসতফ জর্মান, পাঁচ-ছ'জন জর্মান গীতকারের ছায়া পড়েছে তার চরিত্রে ও জীবনকাহিনীতে, ফরাশি বিমুখতার এটাই কি কারণ? জাঁ ক্রিসতফ বারো বছর ধ'রে লেখা—এই বারো বছর ফরাশি সাহিত্যজগতে রলাঁ সম্বন্ধে কোনোই উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি, প্যারিসীয় বহির্জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে আপন ঘরের গ্রন্থপরিবৃত নিঃসঙ্গতায় নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো তিনি কাটিয়েছেন। মাঝে-মাঝে সুইৎসর্লাণ্ডে তাঁর যাওয়া-আসা ছিলো—প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম কামান-বিনিময়ের সময় ও-দেশেই তিনি ছিলেন, যুদ্ধের চার বছর, আর তার পরেও অনেকদিন সুইৎসর্লাণ্ডেই ছিলো রলাঁর বাসভূমি। যুদ্ধের সময়টা তিনি যে নিরপেক্ষ বিদেশে কাটিয়েছিলেন, এর জন্য, ডক্টর এরনসন বলেছেন, ফরাশি জনসাধারণ কখনো তাঁকে ক্ষমা করতে পারেনি।

কিন্তু এটা রলাঁর পলায়ন নয়, এটা তাঁর সততা, তাঁর সত্যনিষ্ঠা। যুদ্ধের মত্ততার মধ্যে ব'সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বই লেখা—নিরপেক্ষ দেশে না-হ'লে এটা সম্ভব হ'তো না। ABOVE THE BATTLE আর THE PRECURSORS এ দু খানা বইয়ে মানবমহিমার জয়ধ্বনি ঘোষণা করলেন তিনি—কামানগর্জন ছাপিয়ে, কঠোর রণবর্ম ভেদ ক'রে সে-স্বর মানুষের মানুষিক হৃদয়ে ঘা দিলো। পৃথিবীর কাছে যে-বাণী এ-সময়ে তিনি প্রচার করেছিলেন, তার চুম্বক পাওয়া যাবে যুদ্ধের পরে রচিত Declaration of the Independence of the Spirit-এ, যার অনুবাদ 'কবিতা'র একটি পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করেছিলাম। যে-দেশপ্রেম প্রতিবেশীর দেশপ্রেমকে পদাঘাত করে, যে-স্বাজাত্যবোধ নখদন্তে রক্তিম, যে-আত্মগরিমা আত্মঘাতী, তার বিরুদ্ধে নির্ভীক ঘোষণা পৃথিবীর চোখে তাঁকে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ মনস্বিতার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করেছিলো। যুদ্ধের অবসানে তিনি যে রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে ভারতীয় মনের সঙ্গে, তাঁর পরিচয়। মানবমহিমার সন্ধান শেষ হয়নি তাঁর, আবার শুরু হ'লো যাত্রা,

সে-পথ তাঁকে নিয়ে গেলো গান্ধি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর তীর্থে। তিনি যে রামমোহনের জীবনী না-লিখে রামকৃষ্ণর লিখলেন, এ নিয়ে তাঁর ভারতীয় ভক্তদের মধ্যে কোনো-এক গোষ্ঠীকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। কিন্তু এর কারণ খুব স্পষ্ট। রেনেসাঁসের ইওরোপ যে-সব আশ্চর্য মানুষকে জন্ম দিয়েছিলো, রামমোহন ছিলেন তারই ভারতীয় প্রতিমূর্তি; একাধারে কবি ও কর্মী, বোদ্ধা ও যোদ্ধা, পণ্ডিত ও রাজনৈতিক। রেনেসাঁসের ইওরোপ যুবক রলাঁকে মুগ্ধ করেছিলো—তারই ফল মাইকেলেঞ্জেলোর জীবনী—কিন্তু তা থেকে আর-কিছু পাবার ছিলো না তাঁর, ইওরোপ থেকেই আর পাবার ছিলো না। জ্ঞানের শক্তির, বিজ্ঞানের শক্তির, কর্মের শক্তির চরম ব্যঞ্জনা—আর তার পরম সীমাবদ্ধতা—তিনি দেখেছিলেন পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে, এইবার তাঁর মন বেরিয়ে পড়লো সেই আত্মিক শক্তির সন্ধানে, যা মানুষকে সকল ভয়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। সে-শক্তির জীবন্ত উৎস বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র মহাত্মা গান্ধিতেই তিনি পেলেন—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেও দেখলেন সেই শক্তির আভাস। রামমোহন আমাদের ভারত-ভূমিতে পশ্চিমের প্রদীপ্ত প্রতিভূ; সেই জন্যই রলাঁকে তিনি আকর্ষণ করেননি।

বৃদ্ধ বয়সে রলাঁ আবার ফ্রান্সে বসবাস করছিলেন—প্যারিসে নয়, তাঁর নিজের প্রদেশে —তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ফ্রান্সের পতনের পর থেকে তাঁর সম্বন্ধে একবার মৃত্যুর জনরব ছাড়া আর-কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ডক্টর এরনসনের বইটি তাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে অবশ্যতই নীরব। এখন সমস্ত খবরই আস্তে-আস্তে পাওয়া যাবে, বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি লেখক হয়তো সুসম্পূর্ণ করতে পারবেন। বর্তমান বইটি ভারত ও রাশিয়া এই দুই বিপরীত দেশের প্রতি রলাঁর ঔৎসুক্যের উল্লেখে শেষ হয়েছে। রলাঁ নিজেই বলেছিলেন, 'আমি জলের সঙ্গে আগুনের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি—ভারতের সঙ্গে মস্কৌর সমন্বয়-সাধন!' এ-সমন্বয় সম্ভব কিনা, কিংবা সে-কাজে রলাঁ কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো বিস্তৃত আলোচনা ডক্টর এরনসন করেননি। রলাঁর শেষ জীবনের কোনো অপ্রকাশিত রচনা যদি পাওয়া যায়, হয়তো এ-প্রশ্নের উত্তর মিলবে। আপাতত তাঁর পূর্বপ্রকাশিত রচনার উপর নির্ভর ক'রে এটুকু বলা যায় যে রুশ-জর্মান-ফরাশি নির্বিশেষে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই ছিলো তাঁর ধর্ম, এবং একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সশস্ত্র যোদ্ধা আর নিয়তন্যায়পরায়ণ হওয়া সম্ভব নয়। এক নম্বর যুদ্ধের শেষে রাশিয়া যে-আশা জাগিয়েছিলো, দুই নম্বর যুদ্ধের শেষে তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? এই মোহভঙ্গের আগেই রলাঁর যে মৃত্যু হ'লো তাঁর দিক থেকে সেটা ভালোই, কিন্তু

বিশ্বমানবের দিক থেকে ভাবলে এ-আক্ষেপ মনে জাগেই যে মুক্তকণ্ঠে নির্ভীক সত্য উচ্চারণ করতে যিনি পারতেন, ইওরোপের সেই শেষ মানুষটি চ'লে গেলেন। অন্য-কোনো হৃদয় তো দেখি না যা মানবিকতায় জ্বলন্ত; অ্যাটম বোমার পরেও দু একজন ধর্মযাজক ছাড়া সকলেই নীরব। রলাঁ নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই—কে বলবে!

কিন্তু রলাঁ রবীন্দ্রনাথ নেই, এ-কথাই বা কেন বলি। দেহের ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু মন মুক্ত, মন অমর, জীবিত জগতে চির-প্রবহমান। রলাঁ রবীন্দ্রনাথ সেই বাণী রেখে গেছেন, প্রতি নতুন ঘটনার সংঘাতে যার সত্য নতুন ইঙ্গিতে জ্ব'লে ওঠে, প্রতি যুগের সংকটে যা কাণ্ডারী, যে-বাণীর জন্য আজকের এই ছিন্নভিন্ন অন্ধকারে আমাদের অন্তরের পরম তৃষা। ROLLAND AND TAGORE বইটি প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী একটি মহৎ সম্পদ আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। এ-বইতে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি রলাঁর পত্রাবলী, রলাঁর উপর রবীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের উপর রলাঁর প্রবন্ধ, দুই মনীষীকে অবলম্বন ক'রে এণ্ডরুজের আলোচনা, দু'জনের কথোপকথনের একটি অনুলিপি, টীকাবহুল পরিশিষ্ট এবং একটি অনতিদীর্ঘ কিন্তু দীপ্তিশালী ভূমিকা। পরিমাণে ও প্রাণসম্পদে রলাঁর পত্রাবলীই বইটির প্রধানতম অংশ। এক বছর আগে শীতের এক অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনের খোয়াইতে ব'সে এই পত্রাবলীর কার্বনলিপি পড়েছিলাম: মনে হয়েছিলো রলাঁর উদার গভীর গম্ভীর বন্ধুতা যেন সেই দিগন্তবিস্তৃত রৌদ্র-প্লাবনেরই মতো; কোনো শর্ত নেই তাতে, কিছুমাত্র হাতে-রাখা নেই—সে এমন একটি শ্রদ্ধা যাতে কোনো দাবি নেই, এমন একটি প্রেম যাতে কোনো বন্ধন নেই। কথাটা ভাবতে ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটা সত্য যে সুন্দরকে, মহৎকে, বরেণ্যকে ইওরোপীয়রা যেমন একান্ত ক'রে ভালোবাসতে পারে আমরা সে-রকম পারি না; হয়তো পরাধীনতার দুর্গতি আমাদের চরিত্রকে এমনভাবে সংক্রমিত করেছে যে আমরা মনে করি ভালোবাসাতেই দীনতা, এবং নিন্দাতেই পৌরুষ। ভালোকে ভালোবাসার যে তপস্যা, যা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়কেই বিশুদ্ধ করে, সে-তপস্যার তেজ, তার জ্বলন্ত প্রাণশক্তি যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না—আমরা যা পারি তা হৈ-চৈ, পুতুল-পুজো, একজনকে ছোটো করবার জন্য আর-একজনকে ফাঁপিয়ে তোলা। বইয়ের ভূমিকায় সুন্দর বলা হয়েছে: 'The love that two great souls give to each other is boundless in its generosity. Only the mediocre are afraid

of committing themselves, of giving themselves away. They do not understand that overflow of emotions and thoughts which is so characteristic of great friendships.' চিন্তার ও আবেগের এই উপপ্লাবন রলাঁর বাইশখানা চিঠির প্রায় প্রত্যেকটিকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে: 'Dear Great Friend' সম্বোধন থেকে আরম্ভ ক'রে শেষের স্বাক্ষর পর্যন্ত একটি সংযত সুদৃঢ় আবেগের উত্তাপ এমনভাবে বিকীর্ণ হ'তে থাকে যে অন্যমনস্ক চিত্তকেও তা স্পর্শ না-ক'রে পারে না। দুঃখের বিষয়, রলাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর প্রতিলিপি পাওয়া যায়নি; গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে-দু'খানা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, সেই ব্যাকুলতা নেই, এই ধরনের মহান মৈত্রীর যা মৌল লক্ষণ। তবে সম্পাদকরা আশা দিয়েছেন যে ইওরোপের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ পুনঃপ্রবর্তিত হ'লে রলাঁর উত্তরাধিকারীর কাছে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী উদ্ধার করা হয়তো সম্ভব হবে, এবং তার সংযোজনায় পরবর্তী সংস্করণে বইটি হবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। আমরা আশায় থাকবো।

প্রাপ্ত

বাংলার সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন।	বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী	॥•
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা, মনোমোহন ঘোষ।	„ „	॥০
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন।	„ „	॥০
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত।	„ „	॥•
পুতুল ও প্রতিমা, প্রেমেন্দ্র মিত্র। নূতন সংস্করণ।	সিগনেট প্রেস	২॥•
যতন বিবি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।	„	২॥•
পিরানদেল্লোর গল্প, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু।	„	৩৲
লেডি চ্যাটার্লির প্রেম, অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	„	৪৲
ইঙ্গিত (কবিতাসংকলন)	ঢাকুরিয়া প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘ।	১৲
প্রাণবসন্ত, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য।	„	„
বালুহাঁস, সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	একক সাহিত্য সম্প্রদায়	১॥০
The Dead Lover's Face, One-Act Play by Serapia Devi.		-/10/- as.

সম্পাদকীয়

কবি করুণানিধানের সম্বর্ধনা

কয়েকদিন আগে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হল-এ বর্তমান বাংলার প্রাচীনতম কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। কবি-বন্ধুদের অভিনন্দন আর অনুরক্ত পাঠকের শ্রদ্ধানিবেদন ছিলো এ-উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে করুণানিধান নূতন ক'রে বাঙালি পাঠকসমাজের শ্রুতিগোচর হ'লেন, সেটা সুখের কথা, কিন্তু শুধু শ্রুতিগোচর হওয়াটাই সব নয়, মনোগোচর হওয়াটাই আসল। পূর্বযুগের কবিদের কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে প্রায়ই পাওয়া যায় না—এ নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা অনেকবার লিখেছি, কিন্তু কথাটা এতই জরুরি যে পুনরুক্তিতে দোষ নেই। করুণানিধানের কবিতা আজকের দিনে কেউ পড়তে চাইলে পাবে কি? কি গোবিন্দচন্দ্র দাসের? কি দেবেন্দ্রনাথ সেনের, অক্ষয়কুমার বড়ালের, প্রিয়ম্বদা দেবীর? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী—এঁদেরই বা ক'খানা বই প্রচলিত আছে? সর্বযুগে সর্বদেশে সাধারণ পাঠক চলতি কালের খোরাকি নিয়েই খুশি, কিন্তু রসিকের মন বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধানী, আর সাহিত্যের ঐতিহ্যবোধের জন্যও সর্বকালের লেখকদের সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য। অথচ আমাদের সাহিত্যের নিকটতম অতীতের কাব্য-কর্মীদের রচনাবলীর সংরক্ষণের জন্য কোনো তরফেই কোনো প্রচেষ্টা এখনো দেখা যাচ্ছে না। এ-দায়িত্ব সাধারণ প্রকাশকের পক্ষে গ্রহণ করা দুরূহ, কেননা এতে লাভের আশা অল্পই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান এ-কাজের ভার নিলে তবেই তা সুসম্পন্ন হ'তে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গ্রন্থবিভাগ আছে, তার কর্তব্য কি পাঠ্যপুস্তক ও তৎজাতীয় গ্রন্থপ্রকাশেই সীমাবদ্ধ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা সাহিত্যের বিভাগও আছে, তার কাজ কি শুধু বছর-বছর কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীকে এম. এ. পাশের ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেয়া?

নবীনচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

একশো বছর আগে ২৯শে মাঘ তারিখে কবি নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পাদিত হবে তাঁরই জন্মভূমি নয়াপাড়া গ্রামে। ২৯শে মাঘ উদ্বোধিত হ'য়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন। এ-উপলক্ষ্যে একটি স্মরণ-গ্রন্থ প্রকাশেরও আয়োজন চলেছে। এই অনুষ্ঠানে বাঙালি সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমিক সকলেই উৎসাহিত হবেন আশা করি।

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি, এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]   চৈত্র, ১৩৫২   [ক্রমিক সংখ্যা ৪৯

কথিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

["লিপিকা"র নূতন সংস্করণ থেকে বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত]

এবার মনে হল, মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেকদিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেকদিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।"

তখন এতদিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারিদিক থেকে শুনতে পাই, "জয় পশুর জয়।" তখন শুনি, "আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কান্না।"

মন বললে, "তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে যে-পথের পানে চেয়ে বারে-বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে—যে-পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুঝেছিলুম, ওপার থেকে রথ বেরোল—সেই পথের দিকে আজ তাকালাম; মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, "দীর্ঘ পথে আমার সুরের সাথি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

আমি বলে উঠলুম, "হায় রে হায়, ঐ তো পায়ের চিহ্ন।"

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে-কানে কথা কইছে; তখন দেখি, আকাশে-আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায়-পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে-চোখে ইশারা।

পথ বললে, "ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "সুর লাগাও।"

বাংলা ছন্দ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ।' এ-কথা যে কত সত্য তা, যত দিন যাবে ততই গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করবো। শুধু যে সাহিত্যের শিল্পগত সুষমার আদর্শ ই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূর্ত হয়েছে তা নয়, শিল্পের উপাদান যে ভাষা সে-ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। সকলেই জানেন যে সাধারণ জীবনের ব্যবহারিক ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়, আবার গদ্যের ভাষা আর কাব্যের ভাষাতেও পার্থক্য আছে। গদ্যকাব্যের সার্থকতা স্বীকার করি, তবু এ-কথাও সত্য যে কাব্যের প্রধান বাহন ভাষার সেই সুনিয়ন্ত্রিত বেগবিকশিত ভঙ্গি, যার নাম ছন্দ। প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে ছন্দ জিনিশটা কৃত্রিম নয়, মিল অনুপ্রাসাদি আনুষঙ্গিক অলংকার নিয়ে শুধুমাত্র একটা কৌশলও নয়, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। কোনো-একটা কথা আবেগ দিয়ে বলতে গেলে ছন্দ এসে পড়ে স্বভাবেরই অনতিক্রম্য আকর্ষণে; আবেগের আঘাতে ভাষা যে স্বতই ছন্দে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে তার প্রমাণ রত্নাকর দস্যুর কাহিনীতে শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও আছে। ইংরেজি সাহিত্যে রানি এলিজাবেথের যুগে আর উনিশ শতকে যখন কাব্যপ্রেরণার বান ডেকেছিলো তখন ছন্দের ধ্বনিবিলাস হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছিলো সুপ্রচুর বৈচিত্র্যে, আর মাঝখানকার আঠারো শতকে কাব্যের প্রেরণা যখন স্তিমিত, ছন্দের বীণাও তখন চুপ ক'রে রইলো, হিরোয়িক কপলেট ছাড়া আর-কোনো সুর বাজলোই না। পুরোনো অ্যাংলা-স্যাক্সন কবিতায় একটিমাত্র আনুপ্রাসিক ছন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তার চেয়েও প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা সর্বজনবিদিত। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতায় বলবার কথাও বেশি ছিলো না; পোপ ড্রাইডেনের কবিতাও বুদ্ধিপ্রসূত

ব্যঙ্গচাতুর্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সাহিত্যে 'পয়ার ত্রিপদীর বাঁধন' ভেঙে নতুন ছন্দ জাগলো বৈষ্ণব কাব্যে, তারপর রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দোবৈচিত্র্য আনলেন পূর্বযুগে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। ছন্দের এই বিচিত্রতাকে শুধু একটা কারুকলার চর্চা মনে করলে ভুল হবে; তা শুধু উপায়নৈপুণ্য বা টেকনীকের উৎকর্ষ নয়, কবির চিত্তস্ফূর্তির অনুরণন সেটা, সমস্ত দেশের কাব্যপ্রতিভার অদম্য আনন্দধ্বনি। প্রতিভা যখন পাংশু, বক্তব্য যখন গদ্যজাতীয়, তখন একটি মোটারকমের ছন্দেই কাজ চ'লে যায়, কিন্তু যখন বলবার কথা এত জ'মে ওঠে যে মনে হয় ব'লে আর শেষ করা যাচ্ছে না, প্রতিভার সেই ঐশ্বর্যকে ধারণ করবার জন্যই মালিনী শিখরিণী মন্দাক্রান্তার উচ্ছ্বাস। 'তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে—' এ-কথা কবি যখন তাঁর কবিতাকেই বলেন, আনন্দের সেই বিহ্বলতা থেকেই ভাষার ভিতরে নানা ছন্দের ধ্বনিসংঘাত জেগে ওঠে।

ছন্দের যে-মাধুর্যমণ্ডিত বিচিত্রতা আজ দেখতে পাচ্ছি, তা যে সিদ্ধিদাতা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, এ-বিষয়ে কারো মনে এখনো যদি সংশয় থাকে, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' * প'ড়ে সে-সংশয় আশা করি দূর হবে। সৃষ্টি মানে বৈজ্ঞানিক অর্থে আবিষ্কার নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য হ'লেও বলতে হচ্ছে, কেননা এক শ্রেণীর পাঠক কথার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করতেই ভালোবাসেন। বাংলা ছন্দের যে-তিনটি মূল ধারা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যে সে-তিনটিরই প্রচলন ছিলো: রবীন্দ্রনাথ ভাঙাচোরাকে সুসম্পূর্ণ করেছেন, এবড়োখেবড়োকে পরিমার্জিত করেছেন, সমস্তটিকে সুসংগত ক'রে মিলিয়েছেন আধুনিক বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উৎসুকতার সঙ্গে—শুধু তা-ই নয়, তিনটি ধারারই স্বরূপ তাঁর কবি-চৈতন্যে প্রতিভাত হয়েছে এমনভাবে যে পুরোনো ছন্দের নব-নব

* ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ : প্রবোধচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী, ২৷৷০

বিস্ময়কর বিভঙ্গ কেবলই ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলেছে তাঁর কাব্যে সংগীতে গীতিনাট্যে, শেষ দিন পর্যন্ত সে-বিস্ময়ের বিরাম ছিলো না। বাংলা ছন্দের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি; সে-বৈচিত্র্যে আজকের দিনে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার বিস্ময়করতা সম্বন্ধে সব সময়ে আর সচেতন থাকি না, কিংবা এ-কথাও সব সময় মনে পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বৈচিত্র্যের উৎস। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' লিখে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই দুটি বিষয়েই আমাদের মনকে নতুন ক'রে জাগিয়ে দিলেন ব'লে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন যৌগিক ছন্দ আর সাধারণত যাকে বলা হয় পয়ার, তার প্রকৃতি মধুসূদন বুঝেছিলেন; প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত, আমাদের লোকসাহিত্যে ও মেয়েলি ছড়ায় তার প্রাণপূর্ণ প্রাচুর্য দেখা যায়: বাংলা ছন্দের এই দুটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথ একতলার উপরে চারতলা পাঁচতলা তুলেছেন, কিন্তু নূতন ভিত্তি স্থাপন করেননি; মৌল উপাদান অবলম্বনে বৈচিত্র্যবিকাশে তাঁর নূতনত্ব, নূতন উপাদানের প্রবর্তনায় নয়। কিন্তু তিন মাত্রার ছন্দে (প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় মাত্রাবৃত্ত) রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কর্তার আসন দেয়া যায়—কেননা যুক্তবর্ণকে দুই মাত্রা ধরলে তবেই যে এ-ছন্দের আসল রূপটি ফোটে, এ-কথা পূর্ববর্তী কোনো কবির মনেই ধরা পড়েনি, না বৈষ্ণব কবিদের, না হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর, 'মানসী'র আগে রবীন্দ্রনাথেরও না। প্রথম থেকেই এ-ছন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়; প্রথম থেকেই এ-ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ তাঁর শ্রুতিকে পীড়িত করেছে, এবং সেই কর্ণপীড়ার প্ররোচনায় প্রথমটায় যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগলেন তিনি, কিন্তু তাতে কেমন-একটা ঝিমিয়ে-পড়া একঘেয়ে ভাব এলো, কান খুশি হ'তে পারলো না। এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু' মাত্রা ধরলেই যে সমস্যার সমাধান হয়, এ-সত্যটি রবীন্দ্রনাথ যেদিন পেলেন সেদিন বাংলা ভাষায় নতুন একটি ছন্দের জন্ম হ'লো। নতুন এই অর্থে যে তার কোনো

উদাহরণই পূর্ববর্তী সাহিত্যে ছিলো না। কেননা এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু' মাত্রা ধরা আর না-ধরায় যে জাতেরই তফাৎ হ'য়ে যায়, আজকের দিনে আশা করি তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর এ-কথাও সুবিদিত যে যুগ্মধ্বনির আঘাতে-সংঘাতে এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ জীবন ভ'রে এমন ক'রে খেলিয়েছেন যেমন ক'রে সাপুড়ের বাঁশিও সাপকে খেলায় না। মাত্রাবৃত্তের বিভিন্ন উপবিভাগের প্রবোধচন্দ্র সুন্দর বর্ণনা করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ, সিদ্ধান্তও প্রায়ই নির্ভুল, যদিও—

আজি বর্ষা গাঢ়তম　　নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে

এখানে 'বর্ষা ও কুন্তল······এই সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিগুলি যেন উপলখণ্ডের মতো ছন্দের অবাধ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে। বস্তুত সমস্ত কবিতাই যেন যৌগিক ও মাত্রিক রীতির মধ্যে কেমন অব্যবস্থিত ভাবে দোদুল্যমান হয়ে আছে'—প্রবোধবাবুর এ-মন্তব্য সম্বন্ধে আমার একমাত্র বলবার আছে, না। কবিতাটি রীতিমতো যৌগিক রীতিতে রচিত, সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত, মাত্রিকের আভাসমাত্র নেই, বর্ষা ও কুন্তল ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করেনি, আঘাতের উত্তেজনা এনেছে। তাছাড়া 'এখানে শুধু বর্ষা ও কুন্তল শব্দে যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট' হয়নি, 'গাঢ়' শব্দেও হয়েছে। 'হৃদয়-যমুনা'য় যুগ্মধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম, এবং এক জায়গায় 'শব্দ' বিশ্লিষ্ট ক'রে 'শবদ' লেখা আছে ব'লেই কি প্রবোধবাবু এর মাত্রিক উন্মুখতা কল্পনা করেছেন ?

২

যুক্তবর্ণের প্রসঙ্গটা একটু ভেবে দেখা যাক, কেননা যুক্তবর্ণের মূল্যের ভিন্নতার উপরেই বাংলা ছন্দের রীতিবৈচিত্র্য অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু প্রথমেই তর্ক উঠতে পারে যুক্তবর্ণ কথাটা নিয়ে। ছেলেবেলার অভ্যাসদোষে আমরা বহুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তমনে যুক্তাক্ষর কথাটা ব্যবহার ক'রে আসছিলাম, প্রবোধচন্দ্র এসে সেটাকে

একেবারে উড়িয়ে দিলেন, তিনি বললেন, 'যুগ্মধ্বনি'। তাঁর ধমক খেয়ে যুক্তাক্ষর কথাটা মুখে আনতে আমাদের আর সাহসই হয় না, রবীন্দ্রনাথও দু' একবার যুক্তাক্ষর ব'লেই সামলে নিয়েছেন, কখনো বলেছেন যুগ্মধ্বনি, কখনো যুক্তবর্ণ, কখনো যুক্তব্যঞ্জন। যদি যুগ্মধ্বনি বলতে সমস্তটাই বোঝাতো, তাহ'লে অন্য-কোনো শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনই হ'তো না। যুক্তবর্ণ ছাড়াও যুগ্মধ্বনি হ'তে পারে, বাংলা হসন্ত শব্দে যুগ্মধ্বনির ছড়াছড়ি, কিন্তু যুক্তবর্ণ, সাবেক কালে যাকে যুক্তাক্ষর বলতুম, তার মূল্যভেদেই পয়ারের গাম্ভীর্য ও মাত্রাবৃত্তের ঝংকার। যুগ্মধ্বনি বললে কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।

এখানে 'তের' 'মান' ইত্যাদি যুগ্মধ্বনি আছে অনেকগুলি, যুক্তবর্ণ আছে একটি মাত্র, 'ণ্য'। ঐ 'ণ্য'-এর মূল্যভেদেই পয়ার আর মাত্রাবৃত্তে জাতের তফাৎ। কাশীরামের শ্লোকটাকে মাত্রাবৃত্তে ফেলে দেখা যাক :

মহাভারতের। অমৃতসমান। কথা
পুণ্যবানেরা। শোনে

'তের' ও 'মান' এখানেও দু' মাত্রা, পয়ারেও তা-ই, কিন্তু 'ণ্য' পয়ারে এক, এখানে দুই। দেখা যাচ্ছে যে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার পয়ারে ও মাত্রাবৃত্তে একরকম হ'তেও পারে, কিন্তু যুক্তবর্ণের ঘা লাগলেই প্রকট হ'য়ে ওঠে প্রভেদ। পুণ্য কথাটা পয়ারে অনায়াসে দু' মাত্রায় চেপে বসেছে, মাত্রাবৃত্তে তা হবার উপায় নেই। এই কারণে যুক্তবর্ণ কথাটার সার্থকতা মানতে হয়। সব যুক্তবর্ণই যুগ্মস্বর, কিন্তু সব যুগ্মস্বরই যুক্তবর্ণ নয়। বাংলার বহুল যুক্তব্যঞ্জন এবং ঐ ঔ এই ইত্যাদি যুক্তস্বর—যুক্তবর্ণ বলতে এ-গুলোকেই বোঝায়, আজ কাল তার এর প্রভৃতি অসংখ্য হসন্ত শব্দের যুগ্মধ্বনিকে নয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যুক্তবর্ণগুলির ওজন কখনো একমাত্রা, কখনো দু'মাত্রা,

কিন্তু মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের ওজন সর্বদাই দু'মাত্রা, এর কখনো ব্যতিক্রম হয় না—*এই দুই ছন্দের জাতিভেদের একটি সূত্র হ'লো এই। শুধু যুগ্মস্বর দিয়ে বিচার করলে এ-প্রভেদ সুস্পষ্ট হয় না, তাই যুক্তবর্ণকে আসরে আনতে হ'লো।

বাংলার যেটা লৌকিক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত, এক দিক দিয়ে পয়ারের সে সধর্মী, অন্য দিক দিয়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার মিল। তার মাপটা মাত্রাবৃত্তের মতো আঁটোসাঁটো সুনির্দিষ্ট নয়, পয়ারের মতোই মাঝে-মাঝে তার অনেকখানি ফাঁক, কবি ইচ্ছেমতো তার খানিকটা ভরান খানিকটা ছেড়ে দেন—কিছু-কিছু ফাঁক থেকেই যায়, যা আমরা টেনে উচ্চারণ ক'রে ভরাট করি। স্বভাবের এই সাদৃশ্যের জন্য স্বরবৃত্ত পংক্তি মাঝে-মাঝে হুবহু পয়ারের চেহারা নেয়—আমাদের গ্রাম্য ছড়ার পদে-পদে তার উদাহরণ :

সুবুদ্ধি তাঁতির ছিল, কুবুদ্ধি ঘনালো
আক্রাবাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিলো।...
আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি
সেথান থেকে এলো ব্যাং চোদ্দ হাজার ডালি।

প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির রীতিমতো পয়ার হবার কোনোই বাধা নেই, এমনকি, ও-দুই পংক্তি যদি পয়ারের মতো ক'রেও পড়ি তাহ'লেও সমস্তটার সুর কেটে যায় না। পয়ার-স্বরবৃত্তের এ-রকম হরিহর-মিলন রবীন্দ্রনাথেও লক্ষ্য করেছি, নিচের চার লাইনের মধ্যে দু'লাইনই স্বচ্ছন্দে পয়ারে চালান ক'রে দেয়া যায় :

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।...

* অবশ্য শব্দের আদিতে কোনো-কোনো যুক্তব্যঞ্জন নিঃসংশয়ে একমাত্রা—কী পয়ারে, কী মাত্রাবৃত্তে। 'ম্লান হ'য়ে এলো কণ্ঠে মন্দারমালিকা,' 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি'—এখানে 'ম্লান' ও প্রাণে'র যুক্তব্যঞ্জন দু'মাত্রায় উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়। যুক্তস্বরের কথা আবার আলাদা—হোক সে শব্দের আদিতে, মধ্যে কি অন্তে—ঐ ঔ পয়ারজাতীয় ছন্দে এক মাত্রা কি দু'মাত্রা হ'তে পারে, মাত্রাবৃত্তে তার দু'মাত্রা বাঁধা।

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ।

এ থেকে বোঝা যায় যে পয়ারের সঙ্গে স্বরবৃত্তের খুব একটা ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক আছে, স্বরবৃত্ত একটু শিথিল হ'লেই পয়ারের কাঠামোর মধ্যে ধ'রে যায়, আবার পয়ার কখনো ঢেউ খেলিয়ে স্বরবৃত্ত হ'য়ে উঠতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর'কে পয়ারে বেঁধে যে-শ্লোক বানিয়েছেন তার 'মন্দ-মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান' এ-পংক্তিটি সুচিন্তিত পয়ার হওয়া সত্ত্বেও অনায়াসেই ছড়ার ছন্দেও পড়া যায়।

মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে। স্বরবৃত্তে যুগ্মধ্বনিমাত্রেরই ডবল মাত্রা স্বাভাবিক, হোক তা হসন্ত শব্দ কি যুক্তবর্ণ, মাত্রাবৃত্তে তা অনতিক্রম্য নিয়ম। মহাভারতের শ্লোকটাকে স্বরবৃত্তের ছাঁদে ফেলছি—

কাশীরামের মহাভারত পুণ্যবানে শোনে

এখানে 'মের' 'রত' আর 'ণ্য'-র সমান ওজন, তিন জায়গাতেই ডবল মাত্রার ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু পয়ারের ঝোঁক যুক্তবর্ণের একমাত্রিক উচ্চারণের দিকে, তাই যুক্তবর্ণের এলাকায় এসেই স্বরবৃত্ত পয়ারকে ছেড়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালো। তার পয়ার-ঘেঁষা স্বভাব তবু ঘুচলো না; মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এটুকু তফাৎ রইলো যে একটু-আধটু কম-বেশিতেই সে ভেঙে পড়ে না, তাকে টেনে বাড়ানো এবং চেপে কমানো যায় ব'লে রচয়িতা এবং আবৃত্তিকার স্বাধীনতা পায় অনেকটা বেশি। যদি লেখা যায়

কাশীরামের মহাভারত গুণবানে শোনে

তাহ'লে স্বরবৃত্ত আপত্তি করে না, কিন্তু

মহাভারতের অমৃতসমান কথা
গুণবানেরা শোনে

এ-লাইন ভুল-ছন্দের উদাহরণস্বরূপ লিখতেও লজ্জা বোধ হয়। স্বরবৃত্তের

২

হালকা হ'তে যেমন আপত্তি নেই, তেমনি তার উপর এতখানি বোঝাও চাপানো সম্ভব হয়েছে যাতে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট হ'য়ে গেছে একটু অস্বাভাবিকভাবেই। প্রবোধচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে উদাহরণ তুলে দিয়েছেন :

আসছে নানাবিধ শকট অল্পবিস্তর অন্ধকারে,...
অনেক বাক্য-হানাহানি, গর্জনবর্ষণ অনেকখানি

এখানে 'অল্পবিস্তর' আর 'গর্জনবর্ষণে' সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্ত রীতিতে ব্যতিক্রম ব'লেই ধরতে হবে, প্রবোধচন্দ্র জানিয়েছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পর্ব যথাসম্ভব বর্জন ক'রেই স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করেছেন...।'

স্বরবৃত্ত আমাদের ভাষার দ্বিধর্মী ছন্দ। পয়ারের প্রতি তার রক্তের টান, আবার মাত্রাবৃত্তের সঙ্গেও তার প্রাণের মিল। এই দুই বিপরীতের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে চ'লেও এই ছন্দ তার আপন বৈশিষ্ট্যের ধারাটি এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে যে ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। তবু তার অসবর্ণ উন্মুখতার পরিচয় পাওয়া যায় বারে-বারে : খুব বেশি ফাঁক রেখে-রেখে লিখলে সে চায় পয়ারে মিশে যেতে, সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিলে তার ভিতরে জেগে ওঠে মাত্রাবৃত্তের তাল, যে-কোনো দিকেই বাড়াবাড়ি হ'লে তার চরিত্ররক্ষা দুরূহ হ'য়ে পড়ে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদী এলো বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কন্যা দান

এই শ্লোকটার ফাঁক বাড়িয়ে দিয়ে যদি লেখা যায়

জল পড়ে টিপিটিপি নদী এলো বান
শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যা দান

তাহ'লে তাকে পয়ার না-ব'লে আর উপায় থাকে না, আবার এরই সবগুলো ফাঁক ভরিয়ে দিলে কী রকম হয় তার নমুনা রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' বইতে বানিয়ে দিয়েছেন :

বৃষ্টি পড়ছে টাপুরটুপুর নদেয় আসছে বন্যা
শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দোহাই দিয়েছেন, স্বরবৃত্তের ফাঁকগুলো এমন ক'রে 'ঠেসে ভরাতে কেউ যেন ইচ্ছা না করেন'। মাঝে-মাঝে ফাঁক না-থাকলে স্বরবৃত্ত যে খেলে না, এ-জ্ঞান কোনো যুগের যে-কোনো কবির জন্মলব্ধ, কিন্তু ফাঁকগুলো ভরিয়ে যদি দেয়াই যায়, তাহ'লে সেটা যে স্বরবৃত্তের শরশয্যা না-হ'য়ে মাত্রাবৃত্তের ফুলশয্যা হ'য়ে পড়ে, রবীন্দ্র-রচিত এই শ্লোকই তার প্রমাণ। এর প্রথম লাইন

বৃষ্টি পড়ছে টাপুরটুপুর নদেয় আসছে বন্যা

দ্রুত তালে এক নিশ্বাসে স্বরবৃত্ত রীতিতে প'ড়ে ফেলা যায়, কিন্তু

শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা

এখানে এসে স্বরবৃত্ত আর টিঁকলো না, পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম লাইনটি স্বরবৃত্তেও পড়া যায়, আবার মাত্রাবৃত্তেও, দ্বিতীয় লাইনটি শুধু মাত্রাবৃত্তেই পড়া যায়, অতএব পুরো শ্লোকটি মাত্রাবৃত্তে পড়লেই কি ভালো হয় না? স্বরবৃত্তে 'বেফাঁক ঠাশবুনানি'র আর-একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন :

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণ-যাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অস্ত শিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে।

এর পুরোটাই মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে গেলো। এ থেকে এই তত্ত্বই আমরা পেলাম যে স্বরবৃত্তের সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিতে গেলে তার মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে ওঠবার ঝোঁক এমন প্রবল হয় যে রচয়িতার পক্ষে সে-ঝোঁক সামলানো প্রায় সম্ভবই হয় না।

নিজের দোহাই নিজেই অমান্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ ফাঁক-ভরানো মাত্রাবৃত্তে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। পূরবীর 'বিজয়ী' ও 'বেঠিক পথের পথিক' উল্লেখ ক'রে প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ফাঁক-ভরানো রীতি সর্বত্রই রক্ষিত হয়নি, মাঝে-মাঝে ফাঁক থেকে গেছে। 'বেঠিক

পথের পথিকে'র শেষ স্তবকটিকে যে স্বরবৃত্ত বলাই যায় না, মাত্রাবৃত্তই বলতে হয়, এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রবোধবাবু ভালো করেছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের রাশি-রাশি কবিতার মধ্যে (গান বাদ দিয়ে বলছি) এটিই বোধহয় একমাত্র দৃষ্টান্ত* যেখানে একই কবিতায় দু'জাতের ছন্দ প্রবেশ করতে পেরেছিলো। ফাঁক-ভরানো স্বরবৃত্তকে স্বতন্ত্র একটি ছন্দের মর্যাদা দিয়ে প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিতে চাচ্ছেন স্বরমাত্রিক, তা নামে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু স্বতন্ত্র ছন্দ হিশেবে ওটি দাঁড়াবে কি ? কেননা স্বরবৃত্ত একেবারে নিফাঁক হ'লেই তাতে মাত্রাবৃত্তের তাল এসে পড়ে দুর্বার বেগে, পুরো কবিতার ছন্দ যে মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত, তা বোঝাবার জন্য মাঝে-মাঝে ফাঁকওলা লাইন রাখতেই হয়। কবিতার আরম্ভেই ফাঁক রেখে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের সুর পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমন

তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয়রথে

কিন্তু স্বরবৃত্তের সুরে আরম্ভ করা সত্ত্বেও এমন অনেক পংক্তি অনিবার্যভাবেই এসে গেছে যা স্বরবৃত্তের চারিত্র্য থেকে স্খলিত হ'য়ে নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছে মাত্রাবৃত্তে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠলো জ্ব'লে
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটলো প্রবল দম্ভভরে

এ-সব পংক্তি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে না-প'ড়ে কি পারা যায় ? 'আনমনা' কবিতাতেও এ-রকম একটি পংক্তি আছে—'অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।' আসলে খাঁটি 'স্বরমাত্রিক' বা নিফাঁক স্বরবৃত্ত লিখতে হ'লে স্বরান্ত শব্দ ও যুক্তবর্ণ (কেননা বাংলায় যুক্তবর্ণ মাত্রেরই স্বরান্ত উচ্চারণ) একেবারে বাদ দিয়ে শুধু তিন-তিন মাত্রার হসন্ত

* এ-রকম দৃষ্টান্ত 'স্ফুলিঙ্গে' দু' একটি আছে। পৌষ ১৩৫২ 'কবিতা'য় 'রবীন্দ্রনাথের ছোটো কবিতা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শব্দের মালা গেঁথে যাওয়া চাই *—মাত্রাবৃত্তের মহল থেকে তাকে নিশ্চিতরূপে দূরে রাখবার সেটাই একমাত্র উপায়—হসন্তের বেড়ি এমন ক'রে পরাতে হবে যাতে স্বরবৃত্তের দ্রুত লয় মাত্রাবৃত্তের ঢিমে লয়ে মিশে যেতে না পারে কিছুতেই। যেমন

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।

এখানে এটুকু লক্ষ্য করবার আছে যে 'চকিত' শব্দকে 'চকিৎ' পড়তে হবে, স্বরান্ত উচ্চারণ করলেই মাত্রাবৃত্তের তাল আর ঠেকানো যাবে না। এমনিও, এই শ্লোককে টেনে-টেনে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে পড়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক শোনায় না, কান প্রসন্ন হ'তে পারে না, এবং যে-কোনো পাঠক, কবিতা প'ড়ে যাঁর একটুও অভ্যেস আছে, তিনি কবিতাটি হাতে নিয়েই ঠিক হসন্তে ঠেকে-ঠেকে স্বরবৃত্তের তালে প'ড়ে যাবেন—ব্যাপারটা কী, তাঁকে ব'লে দিতে হবে না। অতএব একেই বলা যায় নিফাঁক স্বরবৃত্তের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু বাংলায় স্বরান্ত শব্দ এড়িয়ে চলতে হ'লে সমস্ত যুক্তবর্ণান্ত শব্দ, বিশেষ্যপদের বিভক্তি, ক্রিয়াপদের বিভক্তি ও কালভেদ এবং এ ছাড়াও অসংখ্য নিত্যব্যবহার্য শব্দ বাদ প'ড়ে যায়—শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে ছন্দ রচনা করতে গেলে সেটা ছন্দের কসরৎ হ'তে পারে, কিন্তু কাব্য হওয়া তার পক্ষে দুরূহ। এইজন্যই আগাগোড়া

* একটু-আধটু রকমফের হ'তে পারে, যেমন 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রচিত শ্লোক :

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

কিন্তু এতেও ছন্দ রচনাই চলে, কাব্যরচনা চলে না।

নিফাঁক স্বরবৃত্তে রচিত একটি কবিতাও রবীন্দ্রনাথে নেই, 'বেঠিক পথের পথিক'-এর শেষ স্তবক মাত্রাবৃত্তে চ'লে পড়লো, 'বিজয়ী' কবিতাতেও ফাঁক থেকে গেলো মাঝে-মাঝে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধবাবুকে বলেছিলেন: 'বিজয়ী কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারিনি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারিনে।' ছন্দোরচনার কোনো ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'চেষ্টা ক'রে পারেননি,' এ-কথা একটু অদ্ভুতই শোনায়; আসল কথাটা এইরকম যে বেশিক্ষণ ধ'রে নিফাঁক স্বরবৃত্ত বাংলা ভাষাই বরদাস্ত করে না, স্বরবৃত্ত রচনায় মাঝে-মাঝে ফাঁক ভরিয়ে দেয়া যেতে পারে, আবার মাত্রাবৃত্ত রচনাতেও মাঝে-মাঝে এমন লাইন হয়তো হ'য়ে গেলো যা নিফাঁক স্বরবৃত্তের অবিকল অনুরূপ, যেমন 'পথের বাঁধন' কবিতায়

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল

আগে-পিছনে মাত্রাবৃত্তের চাপে এ-লাইনটি আমরা স্বতই টেনে-টেনে প'ড়ে ফাঁক ভরিয়ে দিই, কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথ

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবির গুলাল

না-লিখে

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
হাওয়ায় ছড়ায় আবির গুলাল

লিখতেন, তাহ'লে মুহূর্তের জন্য 'বেঠিক পথের পথিক'-এর সুর বেজে উঠতো; কিন্তু তার পরে যেই পড়তুম

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য

অমনি মাত্রাবৃত্ত ফিরে পেতো তার রাজ্য। এ থেকে এই কথাটাই আবার বোঝা গেলো যে নিফাঁক স্বরবৃত্ত লিখতে-লিখতে যদি কখনো একটিও স্বরান্ত শব্দ এসে পড়লো অমনি তো স্বরবৃত্ত আর রইলো না,

হ'য়ে গেলো মাত্রাবৃত্ত, আর শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে পদ্যরচনা সম্ভব হ'লেও কাব্যরচনা অসম্ভব ব'লেই মনে করতে হবে। তাই মনে হয় যে স্বতন্ত্র ছন্দের পদবী প্রবোধচন্দ্রের 'স্বরমাত্রিকে'র প্রাপ্য নয়, যদি তা হ'তো সে-পাওনা রবীন্দ্রনাথ চুকিয়ে দিতেন।

৩

বাংলায় ক'রকমের ছন্দ আছে, এবার এই প্রসঙ্গটি ভেবে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিন রকম। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে এই ত্রিধারার নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া সহজ নয়। 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে,...আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে...আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।' প্রথমটি পয়ার-জাতীয়, দ্বিতীয়টি ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত, তৃতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত বাক্যে এই তিন ছন্দের যে-রকম বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাতে তাদের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি, কোন ছন্দের কী-রকম ভাষার দিকে ঝোঁক সে-কথাই শুধু বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই যে স্বরবৃত্ত শুধু যে প্রাকৃত বাংলারই ছন্দ, সাধু ভাষা তার ধাতেই সয় না, এ-কথা মনে করলে ভুল হবে:

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি মা, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই শ্লোকে সংস্কৃত শব্দ আগাগোড়াই ছড়িয়ে আছে। আবার এ-কথা বললেও একটু বেশি বলা হ'য়ে যায় যে স্বরবৃত্তই একমাত্র বাংলা ছন্দ, যাকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ স্পর্শই করে না,' যেখানে 'অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন' অনুসারে আরবি ফারশি ইংরেজি শব্দ সংস্কৃত শব্দের 'সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি।' 'সাধু' ভাষার ছন্দে অর্থাৎ পয়ারে 'শব্দের মিশোল' যে যথেষ্ট সহ্য হয়, সেখানেও যে সংস্কৃতের পাশে-পাশে দেশজ ও যাবনিক শব্দ অনায়াসে এসে বসতে পারে, বাংলা কবিতায় তার উদাহরণের অভাব নেই।

ভারতচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও বিষ্ণু দে, তিন যুগের এই তিনজন বাঙালি কবির কথা মনে পড়ছে যাঁরা পয়ারছন্দে বিমিশ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন—সে-ভাষাকে এ-অপবাদ কিছুতেই দেয়া চলে না যে 'সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে।' তাছাড়া, পয়ার যে জাত না-খুইয়েও খাঁটি কথ্য ভাষার বাহন হ'তে পারে কেমন ক'রে তার আদর্শ তো রবীন্দ্রনাথই স্থাপন করেছেন 'পরিশেষ' গ্রন্থে।

মনে হয়, ছন্দের আলোচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন স্বরবৃত্তের রঙে অত্যন্ত বেশি রঙিন হ'য়ে ছিলো, তার হসন্ত-হিল্লোলিত ঢেউ-খেলানো রূপের বর্ণনা দিতে-দিতে অন্যান্য ছন্দের প্রতি একটু অবিচারই তিনি করেছেন। বলেছেন, 'এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।' খাঁটি বাংলা ভাষায়, অর্থাৎ চলতি ভাষায় সকল ছন্দই লেখা সম্ভব, তা রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন, কিন্তু যে-কোনো ছন্দে যে-কোনো কাব্য লেখা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রেই বলেছেন যে প্রাকৃত বাংলার ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য লেখা যেতো, কয়েক লাইন লিখেও দেখিয়েছেন :

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পরে না হোতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আবার প্রবোধচন্দ্র সমর্থন করেছেন, এর উপর বেশি আর কী বলবো, কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত কাব্যাংশে অমিত্রাক্ষরের বেগতীব্র ধ্বনিকল্লোল কিছুমাত্র এসেছে কিনা তা বিচার করতে হ'লে কবি বা 'ছান্দসিক হ'তে হয় না, পাঠকের উপরেই তার বরাদ্দ দেয়া গেলো। কাব্যের মধ্যে যে-খবরটুকু থাকে, তা যে-কোনো ছন্দে বা

অছন্দে বলা যায়, কিন্তু রস জড়িয়ে থাকে ছন্দে, বিশেষ-বিশেষ শব্দের বিশেষ-একটি বিন্যাসে, সেখানে একটু নড়চড় হ'লে সমস্তটাই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এক ছন্দের কবিতা আর এক ছন্দে বদলি করা এতই যদি সহজ হ'তো, তাহ'লে এক ভাষার কবিতা আর-এক ভাষায় তর্জমা করতেও মানুষকে এত ভাবতে হ'তো না।

ধ্বনির দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গোত্রবিচার করেছেন : বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগের নাম দিয়েছেন সমমাত্রার, অসমমাত্রার আর বিষমমাত্রার ছন্দ। 'দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।' দুই মাত্রার হ'লো পয়ারজাতীয় সব ছন্দ, এবং তিন মাত্রা আর দুই-তিনের মিলিত মাত্রা দুটোকেই মাত্রাবৃত্তের মধ্যে গণ্য করলে দোষ হয় না—রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমি অনেকদিন ধ'রে মাত্রাবৃত্তকে তিন মাত্রার ছন্দ ব'লে এসেছি। তাহ'লে স্বরবৃত্ত? 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববিচারের দিক থেকে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে একই ছন্দ ব'লে ধরেছেন, দুটিই তাঁর মতে তিন মাত্রার ছন্দ।

অচেতনে ছিলেম ভালো
আমায় চেতন করলি কেনে

আর

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
　　মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
　　পথের নিকটে রয়।

এ দুটি একই ছন্দের 'প্রাকৃত'রূপ আর 'সাধু'রূপ এই হ'লো রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু বর্তমান লেখকের—এবং আরো অনেকের—কানে এ দুটি আলাদা-আলাদা জাতের আওয়াজ দিচ্ছে, প্রবোধচন্দ্রের বিভাগ অনুসারে প্রথমটি স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। 'পয়ার' শব্দটির ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক সময় এক-এক রকম। অধিকাংশ

সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন—তার মানে, চোদ্দ মাত্রা হ'লেই যে পয়ার হবে তা নয় কিন্তু পয়ারে চোদ্দ মাত্রা থাকতেই হবে। অবশ্য আঠারো মাত্রার 'বড়ো পয়ার'ও স্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু 'আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘপয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা' এ-কথা তিনি কেন লিখেছিলেন জানি না, কেননা তাঁর নিজের রচনাতেই আঠারোর চেয়েও বড়ো মাপের পংক্তি পাওয়া যায়, মোহিতলাল ও অন্যান্য আধুনিকতররা ২২ ও ২৬ মাত্রা অক্লেশে চালিয়েছেন। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে ২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ার আসলে সেকেলে লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর একেলে রকমফের, আর এ-আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। তবু তফাৎ একটু আছে। সে-তফাৎ এইখানে যে ত্রিপদীতে যতিস্থাপনের যে-নিয়ম নির্দিষ্ট ছিলো, আধুনিক কবিরা তা লঙ্ঘন ক'রে তাঁদের লম্বা মাপের পয়ারে যতিস্থাপনের বৈচিত্র্য এনেছেন। সেইজন্য এই লম্বা পয়ারকে ছদ্মবেশী ত্রিপদী মনে করাও ঠিক হবে না। পাঠককে হয়তো ব'লে দেয়া দরকার যে পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ পয়ারকেই একটা ছন্দোবন্ধরূপে উল্লেখ করেছেন অনেকবার, কিন্তু পয়ার যে আসলে একটা ছন্দ, ছন্দের একটা জাত, এ-চেতনা তাঁর 'ছন্দ' বইতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত, এবং 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি এ-কথাও ব'লে ফেলেছেন যে 'বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল "বলাকা"য় "পলাতকা"য়।' আজকের দিনেও হয়তো এমন পাঠক থাকতে পারেন যিনি এ-কথা প'ড়ে মনে করবেন যে বলাকা আর পলাতকা একই পয়ার ছন্দে লেখা, সেইজন্য এ-কথাও বলতে হ'লো যে বলাকা প্রধানত পয়ারে লেখা আর পলাতকা আদ্যোপান্ত স্বরবৃত্তে। একবার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে, আর-একবার স্বরবৃত্ত আর পয়ারকে অভিন্নরূপে উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মল্লিনাথ-মণ্ডলীর কাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলা ছন্দের প্রাণের

রহস্যটি তাঁর বইতে যেমন ক'রে উন্মোচিত হয়েছে, এমন আর কোনো-খানেই হয়নি, কিন্তু ছন্দের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের আশায় কবির লীলা-প্রাঙ্গণ ছেড়ে ছন্দোবিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতেই আসতে হ'লো।

৪

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান বিভাগের নাম দিয়েছেন যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। এই বিভাগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো তর্ক উঠতেই পারে না, নামকরণও সুচারু, তবে সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য মাত্রাবৃত্ত অর্থে তিন মাত্রার ছন্দ আর স্বরবৃত্ত অর্থে ছড়ার ছন্দ বিকল্পে চলতে পারে। ছন্দের নাম বিজ্ঞানসম্মত হওয়াটাই সব কথা নয়, সেই সঙ্গে খুব সহজে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, এমন হ'লেই ভালো হয় যাতে নাম শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে কোনো চেনা কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা সকলেই তার চেহারাটা চিনতে পারি। সেদিক থেকে যৌগিক নামটিতে আমার আপত্তি আছে। 'এ-জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয় বলে' এ-ছন্দের নাম প্রবোধচন্দ্র দিতে চেয়েছেন যৌগিক। কিন্তু আমাদের চিরকালের চিরচেনা পয়ার কথাটা দোষ করলো কী। যে-পয়ারে বহুযুগ ধ'রে বহু বাঙালি কবির অসংখ্য রচনা অসংখ্যতর স্বদেশবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, সেই কথাটা কি ছন্দের পরিভাষা থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবে? ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছিলাম যে পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত—রবীন্দ্রনাথও অনেকবার এই অর্থে পয়ার বা পয়ারজাতীয় ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যবস্থায় এমন-কী ত্রুটি ছিলো যার জন্য নতুন নামের প্রবর্তনা অত্যাবশ্যক হ'লো। প্রবোধচন্দ্র যাকে যৌগিক বলেন, সে-রীতিতে রচিত সমস্ত কাব্যই তো পয়ারের মধ্যে পড়ে: কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেঘনাদবধ কাব্য, চিত্রাঙ্গদা, 'উর্বশী', বলাকার 'বলাকা' ইত্যাদি কবিতা, পরিশেষের 'উন্নতি'

ইত্যাদি কবিতা—পয়ার বলতে এই সমস্তই বুঝি। ছন্দটা যতিপ্রান্তিক না প্রবহমান না মুক্তক, পংক্তিগুলি সমান না অসমান, মিল আছে কি নেই, সাধুভাষায় লেখা না চলতি ভাষায়, স্তবকবিন্যাস কী রকম, এ-গুলো সবই গৌণ কথা, ছন্দের জাতটাই হ'লো আসল। একই ছন্দকে অবলম্বন ক'রে বহুবিধ বৈচিত্র্যসাধন কবিরা করতে পারেন ও ক'রে থাকেন, কিন্তু এ-সব ঘাট-বদলে ছন্দের জাত-বদল হয় না তো। পয়ার কথাটা শুধু যে ব্যাপক তা নয়, তার আর-একটি গুণ এই যে সে সর্বজনবিদিত, স্বল্পতম শিক্ষিত বাঙালি, ছন্দোতত্ত্বের যে কিছুই জানে না, স্কুলপাঠ্য পদ্য ছাড়া কবিতাও হয়তো পড়েনি, সেও পয়ার কথাটা শুনলে ঝাপসাভাবে খানিকটা ধারণা করতে পারবে ব্যাপারটা কী। প্রবোধচন্দ্র যৌগিক চালাতে চান চালাবেন, কিন্তু আশা করি পয়ার তাতে একেবারে দেশছাড়া হবে না।

৫

আগে বাংলা ছন্দ ছিলো যতিপ্রান্তিক—তার মানে এক-একটি পংক্তি যেখানে শেষ হ'লো, নিশ্বাস নেবার জন্য থামতে হ'তো সেখানেই। তখনকার জনসাধারণের কাছে এর একঘেয়েমি যে অসহ্য বোধ হয়নি তার কারণ কবিতা তখন গাওয়া হ'তো কিংবা পড়া হ'তো সুর ক'রে। সে-সুরের গলা চেপে ধরলো ছাপার অক্ষর। ছাপানো বাঁধানো কবিতার বইয়ের প্রচলন যেদিন থেকে হ'লো সেদিন থেকে কবিতার শ্রোতার সংখ্যা ক'মে গিয়ে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে উঠলো দ্রুতবেগে, আর সুরবিরহিত হ'য়ে যতিপ্রান্তিকতার নির্জীবতা কর্ণগোচর হ'লো সহজেই। বাংলা পদ্যের সেই স্তিমিত স্রোতোধারায় প্রবহমানতার দুরন্ত তরঙ্গ প্রথম প্রবাহিত ক'রে দিলেন মধুসূদন। তাঁর অমিত্রাক্ষরে যে মিল ছিলো না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য কথা নয়, তিনি যে 'লাইন-ডিঙোনো' পয়ার লিখেছিলেন, বাংলা ছন্দের যুগান্তকারী ঘটনা এইটেই। যে-প্রবহমানতার সূত্রটি মধুসূদন ধরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ যে তা কত বিচিত্র উপায়ে ব্যবহার করেছেন তার সুসম্পূর্ণ আলোচনা প্রবোধচন্দ্র

করেছেন। ছোটো-বড়ো পংক্তিতে সাজানো যে-ছন্দ সাধারণত বলাকার ছন্দ ব'লে অভিহিত হয়, কিন্তু যে-ছন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রথম লেখেন মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়, আর রবীন্দ্রনাথেরও আগে লেখেন গিরিশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিয়েছেন মুক্তক। নামটি ভালো হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুক্তক একটা ছন্দের নাম হ'তে পারে না, এ একটা ঢঙের নাম। ছোটো-বড়ো লাইনে লেখা হ'লেই তাকে মুক্তক বলা যেতে পারে, কিন্তু আরো একটু কথা আছে, সেই সঙ্গে প্রবহমান হওয়া চাই, কেননা প্রবহমানতার তাগিদেই লাইন ছোটো-বড়ো হয়। প্রবোধচন্দ্র সুন্দর দেখিয়েছেন যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ যতটা প্রবহমান, বলাকার ছন্দ তার চেয়ে বেশি, কিন্তু বলাকার ছন্দেও প্রত্যেক পংক্তির পরে সূক্ষ্ম একটু বিরতি আছেই। এ-কথা স্বরবৃত্ত মুক্তক সম্বন্ধেও সত্য। পুরোপুরি প্রবহমান মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছাড়া কিছু হয় না, শুধু সে-ছন্দই এতটা গদ্যধর্মী যে একটা যতিচিহ্ন না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা গড়গড় ক'রে প'ড়ে যেতে পারি—অবশ্য দমে যদি কুলোয়।

মুক্তক পয়ার, মুক্তক স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিরা অজস্র লিখেছেন, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত মুক্তক বিরল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র উভয়েই তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে বুঝিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত ক'রে দিই: 'পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়।···কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে-ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না।···তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলবার চেষ্টা।' অমিত্রাক্ষর বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রবহমানতার কথাটাই ধরেছেন, মিল তো না-দিলেই হ'লো,

সে আর বেশি কথা কী। প্রবোধচন্দ্রও বলেছেন যে মাত্রাবৃত্তে 'যথার্থ মুক্তক রচনা বোধ করি সম্ভব নয়।' অথচ অসম্ভবও যে নয় তা সেঁজুতির 'যাবার মুখে' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে প্রবোধচন্দ্রই দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলতে চান যে এটি মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের অনন্য দৃষ্টান্ত, 'এ-রকম দ্বিতীয় আর একটি দৃষ্টান্তও' তাঁর 'চোখে পড়েনি।' কিন্তু আমার চোখে একাধিক পড়েছে :

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,—প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দু'মাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।···
দু'মাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো ;···
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি
ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের
প্রেমে প'ড়ে গিয়ে !···
সে-কথা যাক তা কথাটা হচ্ছে
কেমন ক'রে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায় ?
অবশ্য কোনো গোল না ক'রে···
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব নাকি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে ?
ক্লান্ত লাগে। (বিষ্ণু দে—চোরাবালি, 'মন-দেওয়া-নেওয়া')

অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায় : ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত,
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে

বাজে দিনরাত বাজে সারারাত, বাজে সারাদিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ;···
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায়···
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব'লে ছলছল ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
(বুদ্ধদেব বসু—কঙ্কাবতী, 'কঙ্কাবতী')

আরো একটি উদাহরণ মনে পড়ছে—সেটি অসমপংক্তিক না-হ'লেও প্রবহমান।

বিশাল সাগর পার হ'য়ে এসে বাতাস পাগল
জানালার কাছে চীৎকার ক'রে আবোলতাবোল
বকতে থাকবে—আমরা কবিতা পড়বো যখন।···
বই থেকে চোখ তুলে মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার
গভীর কালোয় ; তুমি মুখ তুলে হাসবে—কেমন ?
(বুদ্ধদেব বসু—কঙ্কাবতী, 'কবিতা')

কথাটা উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু এই কবিতাগুলি যে সেঁজুতি প্রকাশের অনেক আগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো এ-খবরটা ঐতিহাসিকের কাছে ঔৎসুক্যকর হ'তে পারে।

কথাটা এই যে মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে তাহ'লে বার-বার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায় ? সুতরাং এ-ছন্দে মুক্তক রচনা 'বোধ করি সম্ভব নয়,' এ-কথা আর কেন ? পয়ারের মতো স্বাধীনতা না-থাকলেও মাত্রাবৃত্ত তাঁর বাঁধনকে অনেকখানি আলগা ক'রে দিতে পারে বইকি, এবং মুক্তকের উঁচু-নিচু রাজ্যে তার তিন মাত্রার নাচ দেখতে-শুনতে ভালোই তো হয়। এ-পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে একটানা বেশিক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ, কেননা পদাতিকের চেয়ে নর্তকের বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি, এমনকি দৌড়ওলার চাইতেও। মাত্রাবৃত্তকে প্রবহমান করতে গিয়ে কোনো-কোনো কবি ইতিমধ্যেই অপঘাত ঘটিয়েছেন :

সত্যই যদি এ-ধরণী হ'ত ঘরণী
কাব্যের,—হ'ত মহাজীবনের তরণী,—
খুলে যেত তবে প্রেমের মুক্ত সরণি
ধরায়। রভসে রসায়িত হ'ত ধমনী।

(মণীন্দ্র রায়—ছায়াসহচর, 'কর্কশ গান')

তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া
অধিক। আমি ঘরের স্মৃতি নিবিয়ে পথচারী।

(মণীন্দ্র রায়—ছায়াসহচর, 'ঘরবাহির')

কী-রকম হ'লো ? যেন নাচিয়েকে দৌড় করাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো পথের মাঝখানে। এ-রকম দুর্ঘটনা আরো লক্ষ্য করেছি ব'লেই কথাটা এ-সুযোগে ব'লে নিলাম। অসমমাত্রিক হোক, প্রবহমান হোক, যা-ই হোক, মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক যতিপাত অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, নয়তো আঙুলে গোনা ছন্দ হ'তে পারে, কানে শোনা ছন্দ হবে না।

৬

স্বরবৃত্তের প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের দু'একটি মন্তব্য আমার ভারি অদ্ভুত লাগলো। তাঁর মতে স্বরবৃত্ত চার-চার সিলেবলের পর্ব ধ'রে চলে—'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,' এখানে যমুনাবতীর পাঁচ সিলেবলকে তিনি বলেন ব্যতিক্রম। 'এ রকম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ সযত্নে বর্জন করেছেন, তাঁর পরিণত বয়সে (ধরা যাক 'ক্ষণিকা'র সময় থেকে) রচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের কোথাও ওরকম পাঁচ সিলেবলের পর্ব দেখা যায় না'—প্রবোধচন্দ্রের এই কথা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাধিক পাঁচ সিলেবলের স্বরবৃত্ত পর্ব আমার মনে প'ড়ে গেলো। বই নিয়ে ব'সে ক্ষণিকায় আমি পেলুম ৩৫টি, পলাতকায় ২৭টি, আমার চেয়ে সতর্ক ব্যক্তি হয়তো আরো বেশি পাবেন। অতগুলি উদাহরণ দিয়ে ছাপাখানার কাজ বাড়াবো না, ক্ষণিকা এবং তৎপরবর্তী বই থেকে পাঁচ সিলেবলের স্বরবৃত্ত পর্ব কয়েকটি তুলে দিই। প্রথমে ক্ষণিকা :

অলক নেড়ে 'দুলিয়ে বেণী'
কথা কইতো শৌরসেনী

মনে হচ্ছে 'আমিও এমন'
লিখতে পারি ঝুড়িঝুড়ি

হের মাঠের পথে ধেনু
চলে 'উড়িয়ে গোখুর' রেণু

আলের ধারে 'দাঁড়িয়েছিলাম' একা

হঠাৎ খুশি 'ঘনিয়ে আসে' চিতে

'দাঁড়িয়েছি এই' দণ্ড দুয়ের তরে

কালিদাসকে 'হারিয়ে দিয়ে'
গর্বে বেড়াই নেচে

কিন্তু তবু 'তুমিই থাকো' সমস্যা যাক ঘুচি

তারপর উৎসর্গ—

দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা 'উড়িয়ে দিল' হাওয়া

খেয়া—

আঁজল ভরে সোনা দিতে
'ছাপিয়ে পড়ে' চারি ভিতে,
'লুটিয়ে গেলো' পৃথিবীতে
এ কী নেহারি

গীতাঞ্জলি—

'উড়িয়ে ধ্বজা' অভ্রভেদী রথে

যা 'হারিয়ে যায় তা' আগলে বসে রইব কত আর

গান গেয়ে আনন্দমনে
'ঝাটিয়ে দে সব' ধুলো

'তুমিও বুঝি' পথ নাহি পাও

8

গীতিমাল্য—

আমার 'সাজিয়ে সাজি' তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে

গীতালি

'হারিয়ে-যাওয়া' মনটি আমার
'ফিরিয়ে তুমি' আনলে আবার।
'ছড়িয়ে-পড়া' আশাগুলি
'কুড়িয়ে তুমি' লও গো তুলি

শিশু—

শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
'চেঁচিয়ে উঠল,' "হা রে রে রে রে রে রে।"......
'ছুটিয়ে ঘোড়া' গেলেম তাদের মাঝে

বলাকা—

জীর্ণ জরা 'ঝরিয়ে দিয়ে'
প্রাণ অফুরান 'ছড়িয়ে দেদার' দিবি

এবারে পলাতকা থেকে কয়েকটি তুলে দিই

'গালিয়ে বুকের' ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে এই কথা।

'হাঁপিয়ে উঠলে' প্রাণ
'পালিয়ে যাবার' একটি আছে স্থান

কেবল পত্র রওনা করা
'কেবল শুকিয়ে' মরা

অতীত হ'য়ে 'তবুও তারা' বর্ত্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে
গর্ভবাঁধন 'কাটিয়ে শিশু' তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে—

আর থাক। এর পর শিশু ভোলানাথ—

'জমিয়ে ধুলো' 'সাজিয়ে ঢেলা'
তৈরি হবে আমার খেলা

'মিলিয়েছিলেম' বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়
'সাজিয়েছিলেম' ঋতুর তরণীতে

পূরবী—

'হারিয়ে ফেলা' বাঁশি আমার 'পালিয়েছিল' বুঝি
লুকোচুরির ছলে

বাতাসেতে 'উড়িয়ে দেওয়া' গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখী

মহুয়া—

'মাখিয়ে নে আজ' পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু

লেখন—

উড়ে গিয়ে 'ফুরিয়ে গেলো'
সেই তারি আনন্দ।

ছড়ার ছবি—

'বেড়িয়েছিলেন' মিলিটারি জরিপ করার কাজে

ছড়া—

বর্ষাকালে ঢল নেমেছে
'ছাড়িয়ে গেল' বাঁধখানা

কিন্তু আর বোধহয় দরকার নেই। এখানে নিবেদন ক'রে রাখি যে ক্ষণিকা পলাতকা ছাড়া অন্য বই আমি খুঁজে-খুঁজে দেখিনি—যে উদাহরণ মনে পড়লো বা বই খুলতেই চোখে পড়লো, সে-ক'টিই শুধু তুলে দিলাম। উল্লিখিত বইগুলি—এবং উত্তর-রবীন্দ্রের অন্যান্য কাব্য—ভালো ক'রে অনুসন্ধান করলে আরো অনেক পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

স্বরবৃত্তে তিন সিলেবলের পংক্তিকেও প্রবোধচন্দ্র 'ব্যতিক্রম' বলেছেন। অবশ্য আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এই 'ব্যতিক্রমে'র সংখ্যা অত্যধিক, প্রবোধবাবু নিজেই আট লাইন ছড়া থেকে সাতটি দৃষ্টান্ত

দিয়েছেন। 'এক কন্যে' 'তিন কন্যে,' 'হাত ঝুমঝুম' 'পা ঝুমঝুম'— এই ধরনের ত্রিস্বর পর্ব সম্বন্ধে তিনি কিছুটা সহনশীল, তার কারণ 'এগুলিতে অন্তত দুটি করে যুগ্মধ্বনি আছে,' এবং ছড়ার ছবির 'যোগীনদা' কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে-ক'টি ত্রিস্বর পর্ব তিনি উদ্ধৃত করেছেন, 'সে সব কয়টিই এই ধরনের।' কিন্তু 'কুড়োতে,' 'না খেয়ে' বা 'কাজিফুল'-এর মতো ত্রিস্বর পর্ব, যাতে যুগ্মধ্বনি একটিমাত্র কিংবা একটিও নেই, প্রবোধবাবুর মতে সাবালকের পঠিতব্য কবিতায় তাকে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়, 'সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ-রকম ত্রিস্বরপর্বিক ব্যতিক্রমকেও সযত্নে পরিহার করেছেন। এমনকি, কাজিফুল-এর মতো যে-সমস্ত ত্রিস্বর পর্বে একটিমাত্র ধ্বনি যুগ্ম এবং দুটি অযুগ্ম, সে-রকম পর্বও রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না।' পাওয়া যায় না, এ-কথা ঠিক নয়। 'কুড়োতে' বা 'না খেয়ে'-র মতো পর্ব লক্ষ্য করেছি :

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা—

এখানে 'খোকা না হ'য়ে' যেমনভাবেই পড়া যাক,

যদি 'খোকা না' হ'য়ে

কিংবা

যদি খোকা 'না হ'য়ে'—

যুগ্মধ্বনিবর্জিত ত্রিস্বর পর্বই পাওয়া যাবে। আর 'কাজিফুল'-এর মতো পর্ব, যাতে একটি যুগ্ম ও দুটি অযুগ্ম ধ্বনি, তাও ক্ষণিকা পলাতকায় পেয়েছি :

সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু 'এ ঘাট ও' ঘাট।
বাইরে যা পাই সমজে নেব 'তারি আইন' কানুন
'দূর হইতে' গড় করিতাম দিঙনাগাচার্যেরে
'মা বললেন' কেন ঐ যে চাটুয্যেদের পুলিন
মনে ভাবে 'এও কেন' মোদের সাথে আসে

অন্যান্য বই আমি আর খুঁজিনি, অন্য-কেউ যদি জাল ফেলেন, কিছু উঠে আসবেই। দুটি যুগ্মস্বর ও একটি অযুগ্মস্বরে গঠিত ত্রিস্বর পর্বের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রবোধবাবুই দিয়েছেন, অতএব আমি আর ও-বিষয়ে উদ্যোগী হলাম না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়লো। স্বরবৃত্তের বিশেষ একটা রীতি আছে, 'কুড়োতে' কি 'কাজিফুল' ধরনের ত্রিস্বর পর্ব নিয়েই যার চলন। সেটি আমাদের বাউল গানের ছন্দ। জাত এর ছড়ার ছন্দেরই কিন্তু ঢং আলাদা। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইয়ে ব্যবহৃত একটি উদাহরণের অংশ তুলে দিই :

আছে যার। মনের মানুষ। আপন মনে
সে কি আর। জপে মালা

এই চরণে প্রথম ও চতুর্থ পর্ব ত্রিস্বর, আর তারই ফলে এর ধ্বনি-বৈচিত্র্য। অবশ্য বাউল-সংগীতে এই ত্রিস্বরঘটিতবৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকেই যে-পরিমার্জিত রূপ দিয়েছেন, তাতে তিন সিলেবল ঘাটে-ঘাটে কায়েমি হ'য়ে বসেছে। এই রীতিতে রচিত সম্পূর্ণ একটি গান দেখা যাক :

আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা ;
এবারে ঘুচল কি ভয় এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হোলো কি ক্ষয় কালীর রেখা॥
কারে ঐ যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে দাঁড়ায় একা।
ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক নয়ন তুলে,—
নীরবে চরণ মূলে মাথা ঠেকা।

লক্ষ্য করতে হবে যে এতগুলি ত্রিস্বর পর্বের মধ্যে অধিকাংশেই একটিও যুগ্মস্বর নেই। তাহ'লে আর 'কুড়োতে' বা 'না খেয়ে' নিয়ে বলবার কী রইলো।

এখন কথাটা হ'লো, গ্রাম্য ছড়ায় যার ছড়াছড়ি, বাউল-সংগীতে

যা অপরিহার্য, আর রবীন্দ্র-কাব্যে যা অঙ্গীকৃত, সেই তিন ও পাঁচ সিলেবলের পর্বকে ব্যতিক্রম বলি কেমন ক'রে? বরং এ-সব উদাহরণ থেকে এই কথাটাই বোঝা গেলো যে স্বরবৃত্তের প্রত্যেক পর্বে তিন থেকে পাঁচ সিলেবলের স্থান হ'তে পারে স্বচ্ছন্দে। পলাতকায় একটি ছ সিলেবলের পর্বও আমি পেয়েছি :

সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
'ফেনিয়ে গড়িয়ে' গর্জে ছুটে

তবে পড়তে একটু আটকে যায় ব'লে এটাকেই সত্যিকার ব্যতিক্রম ব'লে ধ'রে স্বরবৃত্তের পর্ববিভাগে ছ সিলেবলের পদপ্রার্থনা না-মঞ্জুর ক'রে দিলে দোষ হয় না। আবার

এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা

হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি

পলাতকার এই পংক্তি দুটিকে

এল তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে।......
হও তুমি সা। বিত্রীর মতো।......

এইভাবে ভাগ-ভাগ ক'রে দেখিয়ে প্রবোধবাবু নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারেন যে ওতে প্রত্যেক পর্বে চার-চার সিলেবল ঠিকই আছে, কিন্তু ঐভাবে ভাগ-ভাগ ক'রেই পড়তে হবে এ-রকম দণ্ড ছান্দসিকের দণ্ডচিহ্নের সাহায্যেও আশা করি তিনি দিতে চাইবেন না। রবীন্দ্রনাথ 'মরি মরি। অনঙ্গদেবতা' পড়তেন, আরো অনেকেই তা-ই প'ড়ে এসেছেন, একমাত্র দিলীপকুমার ছাড়া আর কেউ 'মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা' পড়েন ব'লে জানি না; তেমনি পলাতকার পংক্তি দুটিও বাঙালি পাঠকের মুখে সেই ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে ও হবে, যেটা সবচেয়ে সহজ ও অর্থের সঙ্গে সংগত :

এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে......
হও তুমি। সাবিত্রীর মতো......

এখানে প্রথম পর্বে তিনটি ও দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি ক'রে সিলেবল

পাওয়া যাচ্ছে, আর এ-রকমের আবৃত্তিতে কোনো সময়ে কোনো বাঙালির কান পীড়িত হয়নি। যে-সব নাম-না-জানা কবিরা মুখে-মুখে আমাদের ছেলে-ভুলোনো ছড়াগুলি বানিয়েছিলেন, তাঁরা যদিও সিলেবল কাকে বলে জানতেন না, স্বরবৃত্তেরও নাম শোনেননি, তবু স্বরবৃত্তে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ, সে-কণ্ঠ থেকে তিন আর পাঁচ সিলেবলের পর্ব উৎসারিত হ'তে পারতোই না, যদি না তাতে স্বরবৃত্তের স্বভাবেরই সম্মতি থাকতো। গ্রাম্য ছড়ায় যতটা স্বাধীনতার অবকাশ আছে, সুসংস্কৃত সুপরিণত কবিতায় ততটা নেই সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু ছন্দের স্বভাব যাবে কোথায়? যদি তিন আর পাঁচ সিলেবলে কোনো গলদই থাকতো তাহ'লে ও-সব ছড়া রবীন্দ্রনাথের কানে খারাপ লাগতো, আরো খারাপ লাগতো রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের কানে—কিন্তু তা তো লাগলো না, বংশপরম্পরায় ছেলেবুড়ো সকলকেই ঐ আঁকাবাঁকা ছন্দ এমন ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে যে কিছুতেই মনে করতে পারি না আঁকাবাঁকা হওয়াটাই ওর স্বধর্ম নয়।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সিলেবল কথাটাই অবান্তর; ভাবতে পারি না, প্রবোধচন্দ্র ছড়ার ছন্দকে syllabic ছন্দ বললেন কেমন ক'রে। বাংলায় syllabic ছন্দ তো হ'তে পারে না, কেননা আমাদের অ্যাকসেন্টবর্জিত উচ্চারণের এটুকুই বৈশিষ্ট্য যে ইংরেজিতে যাকে সিলেবল বলে তা বাংলায় কখনো এক মাত্রা, কখনো দু মাত্রা। বাংলায় এমন-কোনো ছন্দ নেই যাতে এক সিলেবলের ওজন কোনো-না-কোনো সময়ে দু'মাত্রার সমান না হয়, তাই সিলেবল দিয়ে হিশেব করতে গেলে সবই গোলমাল হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বরবৃত্তে পাঁচ সিলেবল আর তিন সিলেবলের পর্ব আছে, এর চেয়েও বড়ো কথা এইটে যে এমন অনেক পর্ব আছে যা আঙুলে গুনতে চার সিলেবল হ'লেও ওজনে পাকা পাঁচ সিলেবল। পাঠককে অনুরোধ করা যাচ্ছে,

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

এর সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি নিম্নলিখিত লাইনগুলি পড়ুন :

শেষ বসন্তের সন্ধ্যাহাওয়া শস্যশূন্য মাঠে (ক্ষণিকা)

কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয় (পলাতকা)

বৈরাগ্যে মন ভারি (পলাতকা)

'যমুনাবতী'তে আছে পাঁচ সিলেবল আর 'শেষ বসন্তের' 'শস্যশূন্য' 'নিঃসংকোচে' 'বৈরাগ্যে মন' এ গুলির প্রত্যেকটিতে চার, কিন্তু এখানে চার সিলেবলের ওজন যে অবিকল পাঁচ সিলেবলের সমান এ-কথা নিছক কান দিয়েই বোঝা যায়, বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কানের কাছে চার আর পাঁচ সিলেবল-এ যদি তফাৎই না রইলো তাহ'লে এ-কথা বলার সার্থকতা কোথায় যে পর্বের ঠিক-ঠিক মাপটি হচ্ছে চার সিলেবল। চার সিলেবল হ'লেই যে ঠিক হবে তাও তো নয়:

'ওগো যৌবন'-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ ক'রে দিলেম বিদায় করি।

সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহুদিনের বোঝা তোমার 'চির-নিদ্রার' দেশে।

(ক্ষণিকা—'যৌবন-বিদায়')

'চির-নিদ্রার' নিশ্চয়ই চার সিলেবল, 'ওগো যৌবন'ও তা-ই, কিন্তু সমস্তটা শুনতে ভালো হয়নি, স্বরবৃত্ত ধরনে পড়তে অসুবিধেই হয়। যদি লেখা হ'তো

'ওগো জীবন'-তরী,
'চির ঘুমের' দেশে

তাই'লেও এক-এক পর্বে চার সিলেবলই থাকতো, কিন্তু ছন্দ কোথাও বাধা পেতো না। চার সিলেবলেই ছন্দ কেটে যাচ্ছে, আবার চার সিলেবলই ছন্দ ঠিক চলছে—এই থেকে বোঝা যাবে যে সিলেবলের কথাই এখানে ওঠে না। প্রাচীন কবিরা অক্ষর গুনে-গুনে ছন্দ লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন শুনতে পাই, আধুনিক ছান্দসিক সিলেবল গুনে-গুনে ছন্দ বুঝতে গিয়ে ভুল করছেন দেখতে পেলাম। স্বরবৃত্তের স্বরূপ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে নতুন ক'রে ভাবতে হবে।

৭

ছন্দের যে-তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা ছাড়াও আরো একটি ছন্দ বাংলায় পাওয়া যায়, তার আকৃতি পয়ারের, কিন্তু প্রকৃতি তিন মাত্রার, পয়ারের মতোই জোড় মাত্রায় তার চলন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের 'যৌগিকে'র লক্ষণ তার নেই, যুগ্মস্বর বিষয়ে সে মাত্রাবৃত্তের সধর্মী, যে-কোনো যুগ্মস্বর তাতে দু'মাত্রা হ'তেই হবে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে দুই মাত্রার চলনের প্রথম যে-দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তাকে এই ছন্দের ছাঁচ ব'লে গ্রহণ করা যায়:

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছু পানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হ'লো দায়

মনে হ'তে পারে, এ তো রীতিমতো পয়ারই হ'লো, কিন্তু যুক্তবর্ণ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক:

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছুপানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হ'লো দায়।
অঞ্চল বেধে যায় চম্পক-শাখে,
ঝ'রে-পড়া পল্লব বারে-বারে ডাকে।
আনলো তীক্ষ্ণ-কালো চক্ষে আবেশ
বন্ধুর বিরহের অশ্রুর রেশ।

সমস্তটা পড়লে কোনো সন্দেহই থাকবে না যে ছন্দের চরিত্র বদলে গেছে—পয়ারের পদাতিক চলন নয় এর, যুক্তবর্ণের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নেচে-নেচে চলাতেই এর আনন্দ। ঠিক মাত্রাবৃত্তের মতো ধরন। আবার হসন্তের ঘেঁষাঘেঁষিতে স্বরবৃত্তের মতো একটা আহ্লাদি চেহারাও এর হ'তে পারে।

খুব তার বোলচাল সাজ ফিটফাট
তকরার হোলে তার নাই মিটমাট
চষমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এ-উদাহরণটি রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বই থেকেই নিয়েছি, একে তিনি

বলেছেন 'পয়ারের ছিবলেমির একটা পরিচয়।' এখানে স্বরবৃত্তের মতো হসন্তের তালি পড়ছে ঘন-ঘন, কিন্তু স্বরবৃত্তের মতো মাঝে-মাঝে ফাঁক রাখবার উপায় নেই মাত্রাবৃত্ত ধরনে আগাগোড়া ভরপুর হওয়া চাই। এই 'ছিবলে' ছন্দের আভাস ছিলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে :

বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে

ঈশ্বর গুপ্তর রচনায় এ-ছন্দ যুক্তবর্ণে এসেই আর টিঁকলো না :

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি

এখানে খাঁটি পয়ার ফিরে এলো। প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে আলোচ্য ছন্দটি গ'ড়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। এর নাম তিনি দিয়েছেন মাত্রিক পয়ার—পয়ার বলতে প্রবোধবাবু চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধ বোঝেন—তাঁর হিশেবে পয়ার 'তিন রকমের হতে পারে…যৌগিক…মাত্রিক…স্বরবৃত্ত।' যদি চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধকেই পয়ার বলতে হয় তাহ'লে মাত্রাবৃত্ত পয়ার পয়ারই বা নয় কেন?—

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে

এ ছাড়াও মাত্রাবৃত্তে চোদ্দ মাত্রার আরো কত বিচিত্র বিন্যাস সম্ভব রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে-দিয়ে দেখিয়েছেন। তার প্রথমটি হচ্ছে এই :

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এটা যে 'মোটেই পয়ার নয়,' তা রবীন্দ্রনাথ ব'লে না-দিলেও আমাদের কানেই ধরা পড়তো। কিন্তু প্রবোধবাবু যদি 'মাত্রিক পয়ার' আর 'স্বরবৃত্ত পয়ার' স্বীকার করেন তাহ'লে এটাকে, এবং চোদ্দ মাত্রার অন্যান্য মাত্রাবৃত্ত বিন্যাসকে, পয়ার ব'লে তাঁকে মানতে হবে। পয়ারকে একটা ছন্দ না-ভেবে একটা ছন্দোবন্ধ ভাবলে এইরকম সব অসংগতি থেকে-থেকে দেখা দেবেই।

তাছাড়া অবশ্য মাত্রিক যে চোদ্দ মাত্রারই হ'তে হবে তা নয়,

অন্যান্য ছন্দের মতো ছোটো-বড়ো নানা আকারেই তার চলাফেরা। এ-ছন্দ আট মাত্রায় লিখতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত আর সুকুমার রায় দু'জনেই অভ্যস্ত ছিলেন :

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি
খাশা তোর চাঁচানি
শুনে শুনে আনমন
নাচে মোর প্রাণমন।

চুপ চুপ ঐ ডুব
দেয় পানকৌটি
দেয় ডুব চুপ চুপ
ঘোমটার বৌটি।

আটমাত্রা থেকেই ষোলো মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে :

বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত,
মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে।

ঘর বার করবার দরকার নেই আর
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।

দশ মাত্রা, যেমন

আহা তুমি পায়রাটি ফুটফুটে
আর আমি পায়রাটি মিশকালো

সত্যেন্দ্র দত্ত এ-ছন্দে কুড়ি মাত্রা পর্যন্ত লিখেছেন

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে

আঠারো মাত্রার কোনো উদাহরণ মনে পড়ছে না, একটা বানিয়ে দেয়া গেলো :

পৌষের সৈনিক কেড়ে নিক ফুর্তির প্রাণ
ভয় নেই আসবেই চৈত্রের শৌখিন গান।

অসমপংক্তিক তো করলেই হ'লো, মুক্তক হয় কিনা দেখা যাক :

বনে-বনে বেজে যায় সুন্দর জ্যোছনায়
চৈত্রের চঞ্চল মঞ্জীর,
পরিদের জমে ভিড় ।
যত ভয় সংশয় দুঃখের শঙ্কিত মেঘ-ভার
নেই আর ।
হাওয়া বয় ঝিরঝির, অস্থির-পল্লব-করতাল
নৃত্যের দেয় তাল ।
একা চাঁদ
চুপ ক'রে চেয়ে থাকে নীল জলে । দেখে তার
আপনার মুখ, আর
আকাশের উজ্জ্বল উল্লাস ।
মনে ভাবে বিশ্বে কি এত সুখ ! উৎসুক
ঘাসে-ঘাসে কার ছোঁওয়া,
কার ছায়া
গাছে-গাছে শিহরায়, পরিদের পায়-পায়
আসে যায় কে যেন আগন্তুক !
এত সুখ ! কার সুখ এই সুখ !

পদ্যটায় চার মাত্রার চলন লক্ষ্য করছি, পংক্তিগুলি চার, আট, বারো ষোলো আর কুড়ি মাত্রায় চলছে। পয়ারের মতো মুক্তক অবশ্য হ'লো না—এ-ছন্দে তা হ'তে পারে না—তবে মাত্রাবৃত্ত যতটা মুক্তক হ'তে পারে এও ততটাই হয়েছে বোধ হয়। অবহিত পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে যুক্তবর্ণের সঙ্গে এর সম্বন্ধ বিজোড় মাত্রার ছন্দের মতো হ'লেও পয়ারের মতোই বিজোড়মাত্রিক পংক্তিকে এ আমল দেয় না।

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি
খাশা তোর চ্যাঁচানি

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে ঘন-ঘন নালিশে

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে—

এগুলিকে কেউ বিজোড়মাত্রিক ব'লে ভুল করবেন না আশা করি, শেষমাত্রায় একটু যে কম আছে, সেটুকু আমরা অচেতন অভ্যাসবশতই টেনে পুষিয়ে নিই—সত্যি বলতে, ঐ কমটুকুকে কম বলাই ভুল।

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে-মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে ঘন-ঘন নালিশে

আর

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সেই
ঘ্যানঘ্যান আবদারে ঘন-ঘন নালিশেই

কানের কাছে এ-দুয়ে কোনো প্রভেদ নেই। শিশু ভোলানাথের 'তালগাছ' কবিতার প্রথম স্তবকটিকে যদি এ-ভাবে লেখা যায়

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়েই
উঁকি মারে সব গাছ ছাড়িয়েই
মনে সাধ আকাশেতে উড়ে যায়
বাসাখানি একেবারে ফুঁড়ে হায়,
হায় তার পাখা নেই !

তাহ'লে ছন্দের রস বদলে যায় কিন্তু রূপের বদল হয় না। 'দাঁড়িয়ে' আর 'উড়ে যায়' দুটোই যে এখানে চার মাত্রার ওজন পাচ্ছে, মূলের সঙ্গে-সঙ্গে এটি পড়লে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না।

এই মাত্রিক ছন্দের দুটো রূপ বাংলা কবিতায় দেখা যায়। একটা রবীন্দ্রনাথের 'ছিবলে পয়ার', যুক্তবর্ণকে এড়িয়ে শুধু হসন্তের ধাক্কায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। হাসিতে ঠাট্টায় ছোটোদের কবিতায় সুশোভন, সত্যেন্দ্র দত্ত একে জাতে তুলেছিলেন, সুকুমার রায় ভলোবেসেছিলেন। আবোল-তাবোলের অনেকগুলি কবিতাই এ-ছন্দে লেখা, আর তার একটিতে এ-ছন্দ এমন আশ্চর্যরকম জমকালো হ'য়ে উঠেছে যেমন আর-কোনো কবিতাতেই আমি লক্ষ্য করিনি। কবিতাটির নাম 'হুলোর গান'।

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছতলে
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।...

বাইশ লাইনের এই কবিতায় যুক্তব্যঞ্জন আছে তিনটি মাত্র—ঝুপঝুপ ক'রে হসন্তের দাঁড় ফেলে-ফেলে খরবেগে চলেছে হালকা নৌকো, অথচ 'বিবিজান লবেজান' কি 'খুব তার বোলচাল'-এর মতো ঠাট্টার ভাবটা নেই, বেশ একটা গা-ছমছম-করা কবিত্বের সুর লেগেছে।

এ-ছন্দের অন্য রূপটিতে যুক্তবর্ণের প্রধান্য। একে বলা যেতে পারে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক, কেননা

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল

'মানসী'র এই প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে গল্পসল্পের

তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার

পর্যন্ত এ-রীতিতে যত কবিতা রবীন্দ্রনাথে রচনা করেছেন, তারা অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য পেয়েছে যুক্তবর্ণের ঝংকারে। 'বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা'-কে বাহবা দিতে হয়, কিন্তু এর একটা অসুবিধে এই যে ৪+৪+৪+২ ছাড়া অন্য কোনোরকম মাত্রাবিভাগ আনতে গেলেই এর তরতরে ফুর্তির ভাবটা আর থাকে না, আর প্রতি পংক্তিতে একই ধরনের যতিপাতে কান ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে সহজেই। সেইজন্য অল্পে শেষ ক'রে না-দিলে এর শেষরক্ষা হয় না। (সতেন্দ্র দত্তর 'ছিপখান তিন দাঁড়' সম্বন্ধে আমরা কে না মনে-মনে ভেবেছি, 'আহা, কবিতাটি যদি এর অর্ধেক হ'তো!'), ছোটো আকারের মধ্যেও যদি যতি-বৈচিত্র্যের দাবি থাকে, তাহ'লেও একে দিয়ে কাজ চলবে না। এ যদিও হাতের কাছেই ছিলো, রবীন্দ্রনাথ একে বড়ো-একটা ডেকে পাঠাননি,

শিশুপাঠ্য কবিতায়ও না। সহজ পাঠের পদ্যগুলি শুধু স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণেরই নয়, ছন্দের উদাহরণরূপেও স্মরণীয়:

আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকেবাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে···

গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু মুঠো অন্ন তারে দুইবেলা দেন
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যূষে গান

যুক্তবর্ণের নূপুর বেজে উঠলো, যতিবিন্যাসও হ'লো বিচিত্র। ছোটোদের পদ্যে, লঘুরসের কবিতায় এ-ছন্দ বার-বার এসেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায়, আবার এই ছন্দেই আবেগমধুর গীতিকবিতার চরম নিদর্শন লেখা হ'লো:

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধুমঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন
স্বর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।

যুক্তবর্ণ শরদের ধ্বনির মতো বেজে চলেছে। আর কি একে সেই 'ছিবলে পয়ার' ব'লে চেনা যায়!

না, চেনা যায় না, কিন্তু তাই ব'লেই কি এর জাত আলাদা হ'য়ে গেলো, না কি এ পয়ারেরই একটা শাখা? ফশ ক'রে ব'লে উঠতে ইচ্ছা করে—নিশ্চয়ই আলাদা! কোথায় 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান,' আর কোথায় 'ওগো বধূ সুন্দরী'! কিন্তু যদি এই ছন্দে কখনো যুক্তবর্ণ বা হসন্ত বিরল হয় তাহ'লেই পয়ারের সঙ্গে তার জাতের মিল আর গোপন থাকে না।

ফিরে-ফিরে আঁখি-নীরে পিছুপানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হোলো দায়

এখানে শুধু দুই-দুই মাত্রায় চলেছে ব'লে শুনতে নতুনরকমের হয়েছে, কিন্তু

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই,
হয় না যা তাই হোলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি। (গল্পসল্প)

এখানে পয়ারের সুর দুর্বার বেগে এসে পড়লো। এ ছাড়া এই ছন্দের আরো একটা ভঙ্গি আছে, যেটা খুব বেশি পয়ার-ঘেঁষা। সেটা 'সোনার তরী' কবিতার ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেছেন ঊনমাত্রিক পয়ার। সমস্ত 'সোনার তরী' কবিতায় একটিমাত্র যুক্তবর্ণ আছে, কিন্তু ঐ ছন্দকেই যুক্তাক্ষরে ঝংকৃত ক'রে উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির যে-ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন, প্রবোধচন্দ্র তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত একটি কাব্যাংশই তুলে দিচ্ছি:

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিলো,
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিলো।

যে-কারণে প্রবোধবাবু পয়ারকে যৌগিক বলেছেন পয়ারের সেই প্রধান লক্ষণই এ-ছন্দে নেই, তবু একে আস্ত একটা রাজত্ব দিয়ে না-ফেলে পয়ারেরই একটা প্রদেশ ব'লে গণ্য করা ভালো। পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে পয়ার বলতে এখানে একটা ছন্দ বোঝাচ্ছে, ছন্দোবন্ধ নয়। প্রবোধচন্দ্রের 'মাত্রিক' নাম চলতে পারে। মনে করতে দোষ নেই যে পয়ারের দুটো রীতি আছে, একটা 'যৌগিক,' তাতে যুগ্মধ্বনি কখনো এক মাত্রা, কখনো দু'মাত্রা; আর একটা 'মাত্রিক,' যাতে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দু'মাত্রা।

৮

ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে, metre আর rhythm; বাংলায় সাধরণভাবে দুটোকেই আমরা বলি ছন্দ। কিন্তু পারিভাষিক

ব্যবহারের জন্য এমন একটা কথা প্রয়োজন, যাতে rhythm বোঝায়। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ছন্দস্পন্দ, ধ্বনিস্পন্দন বললেও দোষ হয় না। তবে এ-পরিভাষা শুধু কাব্যছন্দের আলোচনায় চলতে পারে, ব্যাপক অর্থে ধরলে rhythmকেই ছন্দ না-ব'লে উপায় নেই। এতক্ষণ যে-আলোচনাটা হ'লো, সেটা metre নিয়ে, কিন্তু সকলেই জানেন যে ছন্দের প্রাণ হ'লো রিদম—অন্তত তা যাঁরা না জানেন আমার এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তাঁরা নিশ্চয়ই পড়বেন না। এমন পদ্য হ'তে পারে যাতে metre ঠিক আছে কিন্তু rhythm নেই, সে-ছন্দ নিশ্চয়ই অছন্দ। কিন্তু rhythm যেখানে আছে সেখানে metre-এর জন্য ভাবতে হয় না কেননা rhythmই ছন্দসরস্বতী, metre তাঁর বাহনমাত্র, দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রাজহাঁসটিকে পাওয়া যাবেই। এই rhythm—ছন্দই বলা যাক—আছে চিত্রে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে, সমস্ত শিল্পকলায়, আছে জলের ঢেউয়ে, মেঘের রঙে, গাছের গড়নে, বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিতে। এই ছন্দোবোধ নিয়ে যিনি জন্মান তিনিই শিল্পী। বোধ না-ব'লে বোধি বলা উচিত, কারণ এটা তাঁকে শিখতে হয় না, এটা তাঁর ইনসটিংক, রিদম তাঁর রক্তে। যাঁর প্রাণে ধ্বনির ছন্দ তিনি সুরকার, যাঁর প্রাণে রেখা-রঙের ছন্দ তিনি চিত্রকর। আর মানুষের ব্যবহৃত ভাষার ছন্দ যাঁর প্রাণে অবিশ্রাম তরঙ্গ তোলে, তিনিই কবি হ'য়ে ওঠেন। এই ভাষার দুটো বড়ো মহল আছে—গদ্য আর পদ্য। ছন্দ, রিদম, এটা যে শুধু পদ্যেরই প্রাইভেট প্রপার্টি তা তো নয়, গদ্যের শিল্পরূপেরও তাতে অধিকার আছে। 'গদ্যছন্দ কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব', প্রবোধবাবুর এ-কথাটিই তাই অবাস্তব ও অনর্থক হ'য়ে পড়েছে। গদ্যে পদ্যের মতো 'সুনিয়মিত সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট' ধ্বনিবিন্যাস নেই, অর্থাৎ metre নেই, এ তো জানা কথাই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ আছে, রিদম আছে; গদ্যছন্দকে স্বীকার না-ক'রে তাই উপায় কী! সব গদ্যে রিদম থাকে না, সব পদ্যেই কি থাকে! যাতে ধ্বনির স্পন্দন জাগেনি এমন গদ্যের

পরিমাণ পৃথিবীতে যত, এমন পদ্যের পরিমাণ তার চেয়ে কিছু হয়তো কম, এর বেশি আর কী বলা যায়? কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও ভাববার আছে যে বিশ্বসাহিত্য থেকে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার কোনোটিই ছন্দোচ্যুত নয়। গদ্য যখন সাহিত্য হয়েছে, আর্ট হয়েছে, তখন ছন্দস্পন্দন জেগে উঠেছে অনিবার্যভাবেই। গদ্যকবিতা কথাটা নতুন হ'তে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দ চিরকালের, ইংরেজি সাহিত্যে বাইবেল থেকে বর্নার্ড শ পর্যন্ত তার কত ভঙ্গিই না দেখা গেলো। পদ্যের 'অতিনিরূপিত' ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে গদ্যের অনতিব্যক্ত ধ্বনিস্পন্দনের পার্থক্যটা কী-রকম, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে আমি আর সে-বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রের দু একটি মন্তব্য আমাকে অবাক করেছে ব'লেই আরো কিছু বাক্‌বিস্তার আবশ্যক হ'লো।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দকে বলেছেন ভাবছন্দ। 'এ উক্তিটি' প্রবোধবাবুর 'হেঁয়লির মতো বোধ হয়।' তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তাহ'লে কি ও-সব কবিতার রচনাভঙ্গিতে ধ্বনিসুষমা একেবারেই নেই?' ভাবছন্দ ধ্বনিসুষমার বিরোধী এমন কথা প্রবোচন্দ্র ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে? আসলে শুধু গদ্যছন্দই নয়, পদ্যছন্দও ভাবছন্দ, ছন্দ সেখানেই সুন্দর, যেখানে ভাবের ধারাকে তা অনুসরণ করে, হ'য়ে ওঠে ভাবেরই ধ্বনিময় রূপ। পদ্যে metre-এর ঝংকার আছে ব'লে তার ছন্দের ভাবানুবর্তিতা আমরা সব সময় লক্ষ্য করি না, কিন্তু গদ্যছন্দের সেটাই সর্বস্ব ব'লে তাকে বিশেষ অর্থে বিশেষ স্থলে ভাবছন্দ বলার সার্থকতা আছে—রবীন্দ্রনাথ তা-ই বলেছেন। আবেগের আঘাত ধ্বনির যে-তরঙ্গ তোলে আমাদের মুখের কথায়, সেইটেই তো ভাবছন্দ, আর গদ্যছন্দ তার অবিকল প্রতিরূপ। কথাটা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তসহযোগে বুঝিয়ে বলেছেন, 'মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না, যেমন,—

"তার চেহারাটা মন্দ নয়"

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগাবামাত্র ঝোঁক এসে পড়ে, যেমন—

"কী সুন্দর তার চেহারাটি।"

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায়—

"কী সুন্। দর তার। চেহারাটি"।'

এই রকম আরো কয়েকটি বাক্য রবীন্দ্রনাথ রচনা ক'রে দিয়েছেন যা 'প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্ম-রচিত।' দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমরা প্রত্যেকেই বাড়িয়ে যেতে পারি ইচ্ছা-মতো, কিন্তু তার দরকার নেই, এই একটি দৃষ্টান্ত নিয়েই ভেবে দেখা যাক। 'কী সুন্দর তার চেহারাটি' এই হচ্ছে আমাদের মুখের স্বতঃস্ফূর্ত কথা, সহজ ব'লেই ওর প্রাণশক্তি প্রবল। এই প্রাণশক্তিই তো সাহিত্যকলার কাম্য। গদ্য লিখলে অবিকল এই কথাটিই বসিয়ে দেয়া যায়, সেটা গদ্যের মস্ত সুবিধে, কিন্তু এই কথাটাই পদ্যে বলতে হ'লে কী করতাম?

আহা তার চেহারাটি কী যে সুন্দর!

পদ্য হ'লো, কিন্তু কবিতা হ'লো না, আবেগ লাগলো না।

দেহখানি তার দোহারা
কী যে সুন্দর চেহারা!

মিল-টিল সবই হ'লো, কিন্তু ঠাট্টার মতো শোনায়। 'চেহারা' কথাটাই পদ্যের জাত নামিয়ে দিচ্ছে। গদ্যের সহজ ঋজু ভঙ্গিকে পদ্য মাঝে-মাঝে ঈর্ষা করতে পারে, কিন্তু সে-ঈর্ষায় সে প্রাণত্যাগ করেনি, আবিষ্কার করেছে অন্য-একটি ভাষা, যাতে অপরূপ অতিরঞ্জনের সাহায্যে সমস্ত কথার সার সত্য একেবারে চিরকালের বুকের উপর লেখা হ'য়ে যায়। 'কী সুন্দর তার চেহারাটি' এ-কথা পদ্য গদ্যের মতো ক'রে বলবার চেষ্টাই করে না, সে বলে:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

—আর গদ্য অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। তখন বোঝা যায় যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতির যে-শক্তি গদ্যের আছে, সেই সুবিধার জন্যই সে সীমাবদ্ধ, পদ্যের মতো যখন-তখন অসীমে যাত্রা করতে সে পারে না, বাস্তবিকতার শৃঙ্খলে সে মাটিতে বাঁধা। অথচ 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু'-র মধ্যেও 'অস্বাভাবিকতা'র চিহ্নমাত্র নেই, একে কিছুতেই বলা চলবে না 'কৃত্রিম', 'কী সুন্দর তার চেহারাটি' যেমন বিশেষ-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো মানুষের মুখের কথা, এও তেমনি বিশেষ-কোনো মুহূর্তে বিশেষ-কোনো মানুষের মুখের কথা। এই যে মুখের কথার জোর, এই যে আবেগের আত্ম-উৎসারিত তরঙ্গ, ভাবছন্দ তো এইটেই, আর পদ্যের ছন্দোরীতির মধ্যে—metre-এর মধ্যে এটাই লীন হ'য়ে থাকে, তা যদি না থাকতো তাহ'লে কবিতা হ'তো এমন একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ যা কোনোকালে কোনো মানুষের প্রাণে নাড়া দিতে পারতো না। কবিতার যে-কোনো স্মরণীয় চরণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে আবেগের অনিবার্য বেগের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে কথাটি বলা হয়েছে যে আটপৌরে মুখের কথাতেও ওর চেয়ে সহজ, প্রাণময় প্রকাশ সম্ভব ছিলো না। অবশ্য পদ্যছন্দের খাতিরে ভাবছন্দ কখনোই যে ব্যাহত হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা ছন্দের দোষ, কাব্যের দুর্বলতা। কবিগুরুর রচনাতেও ক্বচিৎ এ-দুর্বলতা প্রবেশ করতে পারে, তাই ব'লে প্রবোধবাবুর এ-কথা মেনে নিতে পারি না যে 'পদ্যরচনায় ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিতে হয় ব'লে কবিকে অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়; আর গদ্যরচনায় ছন্দোবন্ধের বালাই থাকে না ব'লে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।' ছন্দটা কবির বন্ধন নয়, ছন্দটা কবির উপায়। কিসের উপায়? ভাবকে পাবার। ভাবের ছন্দ আর তাঁর রচনার ছন্দ যদি কবির কাছে অভিন্ন না হ'তো, যদি ছন্দের জন্য 'অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে' হ'তো তাঁকে, তাহ'লে ছন্দ তিনি লিখতেনই না, কেননা ভাবের প্রকাশের জন্যই তাঁর লেখা, ছান্দসিককে দৃষ্টান্ত জোগাবার জন্য নয়।

কবি চিন্তাই করেন ছন্দে, কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ তাঁর মনে এমনভাবে মিশে আছে যে ভাবছন্দ কোথাও বাধা পেলে সেই রিদমও ক্ষুণ্ণ হয়, যে-রিদম ছন্দের, মানে metre-এর, প্রাণ।

বিপুলা এ-পৃথিবীর কতটুকু জানি

এখানে কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ মিশে আছে, গদ্যে বললেও এ-ই বলতাম, কিন্তু এতটা বলা হ'তো না। এই কবিতারই অন্য দুটি লাইন:

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী

এখানে কাব্যছন্দ ঠিক ভাবছন্দের অনুসরণ করতে পারেনি, 'সে সর্বত্রগামী'তে রিদম দুর্বল হ'য়ে পড়েছে, সমস্তটায় একটু আড়ষ্ট ভাব এসেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে prosaic। সহজ গদ্যে এ-কথাটি এর চেয়ে ভালো ক'রে বলা যেতো, আর সেই পদ্যাংশই prosaic, গদ্যে রূপান্তরিত করলে যার সৌষ্ঠব বাড়ে।

এ-রকম অসিদ্ধার্থ পদ্য-পংক্তি রবীন্দ্র-রচনায় বিরল, এ যেমন বলবার কথাই নয়, তেমনি একটা দুটো যে আছে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এ থেকে এ-রকম অনুমান কিছুতেই করা যায় না যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দোবন্ধের বালাই' না-রেখে গদ্যকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ছন্দোবদ্ধ একটা 'বালাই' নয়, মিলও তা নয়,* আর কোনো কবির কোনো জন্মেও তাতে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ—বা অন্য যে-কোনো উল্লেখযোগ্য

* মিলের কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে প্রবোধবাবু ধ'রেই নিয়েছেন যে গদ্যকবিতা অবশ্যই মিলহারা। অধিকাংশ গদ্যকবিতা অমিল হ'লেও সমিল হবার বাধা নেই তার—ইংরাজিতে সমিল গদ্যকবিতা হয়েছে, বাংলাতেও হয়েছে। অমিল পদ্য যেমন সম্ভব, সমিল গদ্যও তেমনি। আর-একটি কথা: রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন মুক্তকের ভঙ্গিতে, কিন্তু অন্যান্য কবিরা তাতে স্তবকবিন্যাসও করেছেন

কবি—যে ছন্দোবন্ধের বদলে গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন সেটা এই কারণেই যে কোনো-কোনো বিষয় বা ভাবের পক্ষে তখনকার মতো গদ্যছন্দই তাঁদের বেশি উপযোগী মনে হয়েছে, তার মানে কবিতাটা গদ্যছন্দেই 'এসেছে'। গদ্যছন্দে যে স্বাধীনতা বেশি এ-কথাও ঠিক নয়, বরং তালের সাহায্য পাওয়া যায় না ব'লে এর ধ্বনিস্পন্দন রক্ষার সমস্তটা ভার এসে পড়ে কবির স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর, কবির দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ থেকে কেউ আবার এ-রকম যেন না ভাবেন যে গদ্যকবিতা রচনার কাজটাই বেশি শক্ত—শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনটা কোনটার চেয়ে দুরূহ সে-কথাই ওঠে না—কিছুই সহজ নয়, আবার সবই সহজ।

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র ধারণা করেছেন তা যেন ছন্দোবন্ধ কবিতারই ভ্রূণাবস্থা—'গদ্যকবিতাকে "ছন্দোগন্ধি' বা "পদ্যগন্ধি" কবিতা ব'লে অভিহিত করাই সমীচীন। কোনো-কোনোক্ষেত্রে সমীচীন যে হ'তে না পারে তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা বিশুদ্ধ গদ্য, পদ্যের আভাসমাত্র নেই তাতে। আকাশ-প্রদীপের 'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতা থেকে একটি অংশ প্রবোধচন্দ্র তাঁর সপক্ষের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু 'তোমার কণ্ঠস্বরে গদ্যে রং ধরে পদ্যের' এ-কথা কৌতুক হ'তে পারে, কবিত্ব হ'তে পারে, রাবীন্দ্রিক আবৃত্তির প্রতি উল্লেখ হ'তে পারে, গদ্যছন্দের রবীন্দ্র-ভঙ্গির বর্ণনা হ'তে পারে না। গদ্যছন্দে পদ্যের আভাস তিনি যে দোষাবহ মনে করতেন, পুনশ্চ শ্যামলী শেষ সপ্তকেই তার পরিচয়। যে-গদ্যে এ-সব বইয়ের কবিতা লেখা সে-গদ্যই শেষের কবিতার কালের যাত্রার বিশ্বপরিচয়ের, তবু কবির নিজের জবানিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি চাই, সে-প্রমাণও আছে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সতেরোটি কবিতার মধ্যে দশটি ছিলো গদ্যছন্দের। বোধহয় সেই কারণই, পত্রিকাটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে গদ্যকবিতা সম্বন্ধে অনেকটা মন্তব্য ছিলো। চিঠিটি 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৪২) প্রকাশিত হয়েছিলো,

তারপর পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো ১৩৪৯-এর আশ্বিন সংখ্যায়। তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রে দিই :

'অল্পদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখার ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্যাদারক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল-ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝংকারে যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্ধা কখনোই পুরস্কৃত হ'তে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টিবিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। ···প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তামাসা" কবিতাটিতে পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে অথচ সহজে নয়। ·· সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।···'

যে-গদ্যকবিতা 'পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি' তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নেই, তিনি ভালো বলছেন সেই গদ্যছন্দকেই যাতে 'সঙ্গে-সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না'। রবীন্দ্রনাথের মনে গদ্যকবিতার যে-আদর্শ ছিলো, এ-চিঠিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সে-আদর্শ 'পদ্যগন্ধি' নয়, ঠিক তার উল্টো, 'বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝংকারে যে-মোহসৃষ্টি করে, তার সহায়তা অস্বীকার' করতে হবে,

গদ্যছন্দ সম্বন্ধে এইটেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য, আর এ-কথা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধেও বিশদভাবে বলেছেন। 'কিঞ্চিৎ ছন্দের আভাস,' প্রবোধবাবু যেটা গদ্যকবিতার লক্ষণ ব'লে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা।' অবশ্য 'পদ্যগন্ধি' গদ্যকবিতা যে হ'তে না পারে তা নয়, হয়েওছে, বাংলায় সমর সেন আর অমিয় চক্রবর্তীর রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দুটো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে: একটা রবীন্দ্র-রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে, আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয়—এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী-ভর্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রী ভর্স সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র কোনো আলোচনাই করেননি, কিন্তু গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের যে-বিবৃতি দিয়েছেন তাতে একটি খবর পাওয়া গেলো যা লক্ষ্য না-ক'রে পারলুম না। একজন ফরাশি অধ্যাপক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি বাংলায় free verse রচনা করেছেন কি?' কবি উত্তরে বললেন, 'অমি অনেক free verse রচনা করেছি।' এখানে রবীন্দ্রনাথ 'free verse' বলতে কী বুঝেছেন জানি না, হয়তো বলাকা পলাতকার ছন্দ, হয়তো পুনশ্চ, কিন্তু এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ইংরেজ বা ফরাশি ফ্রী ভর্স বলতে যা বোঝে রবীন্দ্রনাথ তা রচনা করেননি। ওদের ফ্রী ভর্স প্রবোধচন্দ্রের মুক্তক নয়, গদ্যছন্দও নয়, ওদের ফ্রী ভর্স হ'লো মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে। ছন্দ ব্যবহারের কি অব্যবহারের স্বাধীনতা আছে ব'লেই এর নাম free verse, বাংলায় এর অন্য-কোনো সংজ্ঞা দিতে গেলে শুধু অস্পষ্টতার ক্ষেত্র বাড়ানো হবে, তাছাড়া কিছু লাভ হবে না। আর এই আদর্শে বিচার করলে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে শুধু তিনটি নৃত্য-নাট্যেই মিশ্র ছন্দের কিছু আভাস এসেছে মনে করা যায়, তাও আভাস মাত্র, কারণ এ-তিনটি বইয়ের ছন্দোবন্ধ প্রায়ই ভাঙা-ভাঙা,

গদ্য রীতিও সর্বত্র সুঠাম নয়, গদ্য-পদ্য মিশ্রিত না-হ'য়ে সমস্ত রচনাটাই যেন গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বিরাজমান। প্রকৃত মিশ্র ছন্দের চেহারাটা বাংলায় কী রকম হ'তে পারে তার একটা নমুনা দৈবাৎ পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইতেই। 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধে একটা প্রাকৃত ছন্দের মাত্রা মিলিয়ে তিনি লিখেছেন:

> বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
> শীতল পবন বহে সঘনে,
> কনক বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে,
> নিষ্ঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

এখানে প্রতি পংক্তি ছন্দে বাঁধা আছে, কিন্তু এক-এক পংক্তির এক-এক ছন্দ। এ ছাড়া 'স্ফুলিঙ্গে' দুটি মিশ্র ছন্দের কবিতা পাওয়া গেছে, যথাস্থানে * তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রে নির্ভর ক'রে এ-কথা বলা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ মিশ্র ছন্দ লিখেছেন। একই কবিতায় দু'তিন রকমের ছন্দ বা গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার পরীক্ষা আমাদের কোনো-কোনো জীবিত কবি করেছেন, কিন্তু বাংলায় মিশ্র ছন্দের স্পষ্ট কোনো রূপ এখনো ফোটেনি।

* 'রবীন্দ্রনাথের ছোটো কবিতা' 'কবিতা', পৌষ ১৩৫২

প্রৌঢ় প্রেম

বুদ্ধদেব বসু

নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন,
তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান।
তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস,
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান।
বৈদ্যুৎময় অণুর গণিত অদ্ভুত
কত নীহারিকা-বীথিকা কাঁপায়, আঁধারে ভাসায়
কত সূর্যের অর্বুদ বুদ্বুদ ;
সৌরলোকের ঐন্দ্রজালিক তোমার শাণিত তনিমায়
সহসা গণিতে ক্বণিত করেছে মন্ত্রে,
সংখ্যারাশিরে বেঁধেছে দারুণ ছন্দে।
তারই তরঙ্গ-রঙ্গে তোমার অঙ্গে ফুটেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ পারিজাত,
আকাশে আলোকে ঢেলেছে ইন্দ্র লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ চপল আঁখিপাত,
তোমার দু' আঁখি বৈশাখী মেঘে এঁকে দিলো, যেন বাসনার বেগে
ঐরাবত আর উচ্চৈঃশ্রবা দুর্বার,
সে-আঁখিতারার তেরছা চাহনি যখনি আমারে করেছিলো তাড়া,
জেনেছি আমার নেই আর নেই উদ্ধার।
আজও আছে সেই মায়ার আভাস,
অভাবনীয় লাবণ্য,
হায়রে সে আর নয় সে আমার জন্য।
তোমার লম্বিত বিলোল আঁচলে, আঁচল-ঝরানো বায়ুহিল্লোলে,
আঁচলে লুকানো যুগল উতল উচলে,
রূপের রেখার তীক্ষ্ণ ঝলকে, পরশ-রসের উষ্ণ ছলকে

আজও লজ্জার অভিসার, আজও আতিথেয় সৌজন্য,
হায়রে সে আর নয় সে আমার জন্য।

•

আমার যেটুকু গৌরব আজ সৌন্দর্যের দৌত্যে,
তোমাতে মূর্ত রূপলক্ষ্মীর বরদান,
নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন
তোমাতে আমাতে এক মৃত্যুর ব্যবধান।
বেঁচে আছো তুমি বেঁচে থাকবারই খুশিতে,
তাই তো বিশ্ব ব্যস্ত তোমায় তুষিতে,
আছে শৈশব স্বৈরী স্ববশ অবসরে, আছে কৈশোর তব কৌতূহলের
রৌদ্র-রঙিন ঝরনায়,
আছে জীবনের সফল ফসল ব্যস্ত আঙুলে ত্রস্ত চরণে
বিলসিত ঘর-করনায়।
আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে
ভাষার গুঞ্জনে,
শুক্ল-রাতের একলা জাগার অসম্ভাব্য ভাবায়
কল্পলোকের আভায়,
আমার ভাবার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে।
আসে যায় যারা নবীন-জীবন-বণিক
সহজ সুখের ধনিক
মুক্তদুয়ার উদার তোমার প্রাণের প্রাঙ্গণে
ভ্রমর-কম্পনে,
তাদের হৃদয় জ্বালায় তোমার আঁখির আগুন, আশার আকাশে
যেন উজ্জ্বল সূর্যের শিখা লেলিহান,

তাদের মুখের রেখায় কোণায় রক্তকণায় দুঃসাহসের
উচ্ছ্বাসে জাগে কলরোল,
জ্বলে আর নেবে চঞ্চল শিখা, নাচে আর থামে
পলকে-পলকে ঝলমল
আবার তোমার চোখের তারায় ;
আমি দূর থেকে দেখি চুপে-চুপে, দেখি সেই শিখা হঠাৎ কখন হারায়,
সজল মেঘের কোমল ছোঁওয়ায়
ছলছল করে আবেশে ছায়াচ্ছন্ন,
তা-ই নিয়ে, শুধু তা-ই নিয়ে আমি ধন্য।
তোমার সে-চোখে বিকশিত অভিনন্দনে
বাঁধিব ছন্দোবন্ধনে,
আবেগ-লাগানো সিক্ত অধরে, আবেশ-রাঙানো রক্তকপোলে,
তনুর অণুর মন্ত্রমুগ্ধ গণিতে
যদি পারি মোর ভাষার ছন্দে ধ্বনিতে,
যদি তার রূপ ধ'রে দিতে পারি একলা-রাতের ভাবায়
কল্পলোকের আভায়
সে কোন অনামী অনুকম্পায়ী আগামী কালের জন্য
তাহ'লেই, শুধু তাহ'লেই আমি ধন্য।

ফাল্গুনের গুঞ্জন

বুদ্ধদেব বসু

আসবে, গ্রীষ্ম, আসবে আবার কৃষ্ণচূড়ার
উষ্ণ শোণিতে, উচ্চ চূড়ার উচ্ছ্বাসে লাল
আকাশের সুখী রেখায়, আসবে শাখায়-শাখায়
সবুজ শিখায়, পথে-পথে ঝরা আহ্লাদি-লাল-
হলদে গুঁড়োয়, চলতি পথের চপল হাওয়ার
উল্লাসে, আর তীক্ষ্ণ কঠিন শুকনো চাঁপার
রৌদ্র-মদির বৈশাখী সৌগন্ধ্যে, আবার
আসবে নতুন তরুণমিথুনে তীব্র নেশায়,
মত্ত আশার ইচ্ছা-ছড়ানো পাখায়-পাখায়,
বিশ্বপ্লাবন দৃষ্টিধারায়, চোখের তারায়
স্বর্গবিজয়ী মৌন মন্ত্রে—কিন্তু আমার
ক্লান্ত হৃদয়ে আসবে কি আর, আসবে আবার,
আমার হৃদয়ে আবার, গ্রীষ্ম, আসবে কি আর ?

ডেলি প্যাসেঞ্জার

আদিত্য ওহদেদার

ছোট এক গ্রামের স্টেশন।
সারাদিন থাকে চুপ ক'রে।
কেবল যখন
দিনের আলোর সঙ্গে তিমিরের চুলে
খানিক পাকায় জট,
তখন সময় হয়।
যাক-এসে-গেছি বলা অনেক নিশ্বাস
তৃপ্তির আশ্বাসে ভরা
আচ্ছা-তাহ'লে-চলি, কাল-ফের-দেখা
নিঃশব্দে এ সম্ভাষণ জানায় পা-ফেলা।
তারপর গ্রাম,
এই-শেষ-হ'য়ে-আসা ক্রোশখানি পথ।
তারপর ছায়া-ছোঁয়া একটি কুটির
ওগো-এসো-এসো বলা খোলা দরজাটি,
হাসিভরা একখানি মুখ,
চোখের উজ্জ্বল কথা—
এসে গেছো তুমি!

সনেট

প্রভাকর সেন

যখন নীলাভ নদী হিমানীর ঘুম ভেঙে শোনে
হারানো তারার গান কালো জলে আলোছোঁওয়া বনে,
মেরুন সমুদ্র হ'তে ফেনার পালকে এই গ্রামে
প্রথমে হাঁসের ঝাঁক মেঘমুখে থরোথরো থামে।

পুরোনো পাতার ছাপ কাঁপে কোন ঝিকিমিকি চরে
সবুজ যখন স্রোত বনানীর কথা মনে ক'রে
স্রোতের বোনালি কুটা সম্মোহনে সমুদ্রের টানে,
বিষণ্ণ ব্যাকুল চোখ দূরের পাহাড় কাছে মানে।

রাতশেষে রুক্ষ মাঠ ঘাসফুল বুনে হেসে ওঠে,
পলাশের শীর্ণ শাখে হিংস্র হাওয়া রক্ত হয়ে ফোটে,
চঞ্চল আরণ্য ঝাউ নিত্য নব আকাশের তলে
নিমেষের নীড় বাঁধে, মেঘের আগুনে মাঠ জ্বলে।

শিশিরে নিজের ছায়া সময়ের আগ্নেয় কিনারে
ভগ্নপাখা, তবু নীল, প্রজাপতি মনে হতে পারে।

বাঁক

জগন্নাথ বিশ্বাস

যেখানে নদীর স্রোত
ঘুরে গিয়ে চলে গেছে দৃষ্টির বাহিরে,
ওপারে প্রান্তর জুড়ে ধূ ধূ বালুচর,
সেইখানে রোদ পড়ে
সেইখানে মনের উপর।

সে কোন নদীর বাঁক?
যেখানে ওপার জুড়ে বাবলার সার,
ধূসর সীমানা জুড়ে অসীমেতে মিলন প্রয়াস?
ছলছল কালো জল মাঝখানে শান্তির মতন
মৃত্যুর মতন শব্দ বয়ে চলে?
তাকে তো দেখেছি কোনোদিন
কিশোরের বেলাভূমে,
ভুলিতে পেরেছি তাকে?

কোনোদিন ভিনগাঁয় যেতে,
খামারের পাশ দিয়ে
ধানের নিঃশ্বাস নিয়ে,
চাষার ঔৎসুক পেতে-পেতে,
সে নদীর বাঁকের ওপার—
বিস্মিত নয়নে দেখি অজস্র—অপার—
হয়তো রেঁধেছে কেউ,

কোনো পথে নিঃশব্দ বালিতে,
পোড়া কাঠ প'ড়ে আছে,
হয়তো বা প'ড়ে আছে মার্মালেডের টিন কোনো,
এই শুধু।

আজ কোন মাঠ দেখি
রূপায়িত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে,
বিজ্ঞানের বুদ্ধি দিয়ে রক্তের সংগীতে
কাঁদে প্রাণ অপ্রাণের ভিড়ে।
সবুজের বুক চিরে চিরে
ধূসরের রূপদান,
এ কি সাম-গান।
অনেক, অনেক সুখ, বহু তৃপ্তি,
তবু আছে তবু থাকে ফাঁকে।

এইখানে নদীর কিনারে
সেই-দেখা বাঁক মনে পড়ে,
চিকচিকে রোদ-মাখা,
চরে নয়
রোদ পড়ে মনের উপরে।

বিরহ

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিরহ সে অধ্যাপক,—
যায় শখ—
নিরজনে
স্মরণের তপোবনে
প্রেমাভিভাষণে
পায় প্রাণ!
গাহি' গান
ম্রিয়মাণ
আমি—
দিনযামী
বিরহের পাদমূলে
বিশ্ব ভুলে'
বসি শিষ্য সম,
লভিবারে প্রিয়তম
পাঠ।

জীবনে ঝঞ্ঝাট
আছে।
তবু তো মানুষ বাঁচে
গীতি নিয়া
প্রীতি নিয়া
আগুলিয়া
অভিনব স্মৃতি!

বনবীথি
মুঞ্জরিয়া
কল্পনার কেতকী কুসুমে
শতবার চুমে
বসন্তেরে?

হয়তো গ্রহের ফেরে
প্রিয় আর প্রিয় নাই
আজ।
তবু লাজ
নাই। জানি
বিরহের বাণী
বাহি'
গান গাহি'
অতীতের প্রিয়
রমণীয়
ধ্যানমূর্তি ধরি'
—মরি মরি
ধরি ধরি
যেন—
স্বপ্ন হেন,
মর্মদেশে নামে।
অতীতের প্রিয় নামে

ডাকে, ডাকে,
কাছে থাকে,
বুকে থাকে,
মুখে মুখে রাখে।

অরূপ সে রূপ-মোহে
শত দুঃখ সহে
রহি সুখে।
বিরহের মুখে
সেই সুখ—
অপূর্ব উন্মুখ
আশে
গীতোচ্ছ্বাসে
নিত্য বাহিরায়।
বসি তার পদচ্ছায়
শিষ্য সম
'নমো নম'
বলি'
আনন্দে উজ্জ্বলি'
উঠি।
তারপরে লুটি
ভাবাবেগে।

সমস্ত রজনী জেগে
নিই পাঠ
বিরহের পাঠ।

জীবনে ঝঞ্ঝাট
আছে।
তবু তো পরাণ বাঁচে
তুমি আছে বলে'।
নানা ছলে
বিচিত্র কৌশলে
পাঠ দাও,
অভাগারে সঙ্গে নাও
অতীতের আনন্দিত দিনে।

পথ চিনে
মনে মনে
কামনার কুঞ্জবনে
যাই।
ভুলে' যাই
নাই,
আজ নাই।

একদা তুমি প্রিয়ে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সন্ধ্যার আঁচ লেগেছে নীচে
লেবুতলায়,
তুমি কূয়োয় জল তুলছো,
একাই,
—অনেকক্ষণ,
কালো চুল, শাড়ীতে নীল আকাশ,
হাতের চুড়ি ঝন্‌ঝন্,—
বাইরে রেলের আওয়াজ,
গোয়ালন্দের গাড়ী,
কোমরে শাড়ী তোমার,
খোঁপায় সন্ধ্যা,
বাগিচায় নেবুগন্ধা-হাওয়া,
লাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি দেখি—
তোমার নাওয়া।

সেদিন ও এদিন

জগন্নাথ চক্রবর্তী

তোমায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলুম,
মনে পড়ে ?
সেদিন আকাশে তারা ছিল,
আজ নেই
সেই সেদিন।
অত্যন্ত আবোলতাবোল সেই চিঠি।
তবু দ্যাখো, মাঠে কাশফুল ফুটেছিল,
রেলস্টেশনের ওপারে সাঁওতালি মেয়েরা নেচেছিল,
পায়ে চলার রাগিণী মনকে আচ্ছন্ন রেখেছিল,
সেই ইউক্যালিপটাস্-সন্ধ্যা তোমার মনে নেই ?
বিবর্ণ জ্যোৎস্নার নীচে সেই আকাশপাতাল সন্ধ্যা ?
ঝিঁঝিঁ পোকার কোরাস্,
জোনাকির ঝিকিমিকি
আর শিখীপাখা আকাশে—
সে রাত্রির জৌলস আজ হয়তো ফিকে হয়ে গেছে।
সেদিন আকাশে তারা ছিল,
আজ নেই
সেই সেদিন।

বিদেশী সাহিত্য

গেব্রিএলা মিস্ত্রাল

১৯৪৫-এ সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার স্পানিশভাষিণী কবি গেব্রিএলা মিস্ত্রাল (Gabriela Mistral)। একাধিক কারণে এ-ঘটনা উল্লেখযোগ্য। লাতিন-আমেরিকায় নোবেল পুরস্কার পৌঁছলো এই প্রথম, সাহিত্যের জন্য কোনো মেয়ের কাছে এলো এই চতুর্থ বার, তাছাড়া ইএটস-এর পরে আর-কোনো কবি এ-পুরস্কার পাননি। এটা একটু আশ্চর্যই যে সাহিত্যিকদের মধ্যে এই সার্বভৌম সম্মানের জন্য যাঁরা বৃত হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই গদ্যলেখক। কবিতার পাঠকের সংখ্যা অল্প, অনুবাদ সহজে হয় না, আর সেজন্য কবিদের খ্যাতি সাধারণত স্বদেশের সীমানাতেই আবদ্ধ থাকে—বোধহয় এ-সব কারণেই নোবেল প্রাইজ দীপ্তিশালী সাংবাদিক-সাহিত্যিককেও খুঁজে বের করেছে প্রতিভাশালী কবিদের পাশ কাটিয়ে। এই কারণে পুরস্কারের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে আলস্য বা অনুৎসুকতার অপবাদ যদি আমাদের মনে ওঠে, সে-সম্ভাবনা এবার তাঁরা অংশত খণ্ডন করলেন গেব্রিএলা মিস্ত্রালকে আবিষ্কার ক'রে। আবিষ্কার কথাটা ইচ্ছে ক'রেই বসালাম, কেননা—আর এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা—এ-পর্যন্ত স্বদেশের বাইরে তাঁর খ্যাতি ছিলো নামমাত্র, মার্কিনদেশে তবু কিছু পরিচিত ছিলেন, ইওরোপে অতি সামান্য। আর সেইজন্যই, আমাদের দেশে তাঁর অস্তিত্বও জানতুম না আমরা। আমি তো এর আগে নাম পর্যন্ত শুনিনি।

ইংরেজি ভাষাই আমাদের বিশ্বভ্রমণের পথ। সে-পথ যত ব্যাপক ও যত বিচিত্রই হোক, সর্বত্র তা পৌঁছয়নি, এবং একান্তরূপে তার এলাকার বাইরে প'ড়ে আছে দক্ষিণ আমেরিকা নামক বিষুবরেখা-

দ্বিখণ্ডিত মহাদেশ। এই মহাদেশের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির আত্মিক যোগাযোগ কিছুই নেই—ইংরেজ-শাসিত ভারতে তো তা 'সম্ভবপরতার পরপারে'। রবীন্দ্রনাথ যদি ও-দেশে না-যেতেন, না ফিরতেন ও-দেশ থেকে একটি স্মরণীয় বন্ধুতার অর্ঘ্য নিয়ে, তাহ'লে বছরের মধ্যে একবারও দক্ষিণ আমেরিকাকে স্মরণ করবার কোনো কারণ থাকতো না আমাদের। আজ গেব্রিএলা মিস্ত্রাল তাঁর মাতৃভূমিকে আমাদের চোখে উজ্জ্বল করলেন।

New York Times Book Reviewতে মিলড্রেড অ্যাডামস-এর লেখা প্রবন্ধে এই অশ্রুতনামার কিছু পরিচয় পাওয়া গেলো। এঁর প্রকৃত নাম লুসিলিয়া গডয় আলকাইআগা (Lucilia Godoy Alcayaga), জন্ম ১৮৮৯ অব্দে, চিলি প্রদেশে। পিতামাতা দু'জনেই চৈলিক, পিতার কিছু কবিত্বশক্তি ছিলো। পনেরো বছর বয়সে লুসিলিয়া একটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেন, দশ বছর ধ'রে মাস্টারি করলেন পর-পর অনেকগুলি মেয়ে-ইস্কুলে। তারপর একটি ঘটনায় বদলে গেলো তাঁর জীবনের ধারা। লাতিন আমেরিকানরা স্বভাবতই কাব্যপ্রেমিক, তাদের দেশে পুরোনো দিনের মতো কবিতা-প্রতিযোগিতায় উৎসাহের তীব্রতা এখনো স্বতঃস্ফূর্ত। হঠাৎ সান্টিআগোতে একটি প্রতিযোগিতায় লুসিলিয়া পেলেন উচ্চতম পুরস্কার—একটি লরেলপাতার মুকুট আর একটি স্বর্ণপদক। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ। স্বভাব ছিলো সলজ্জ, দুর্জয় ছিলো সংকোচ—জনতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে পুরস্কার নিতে পারলেন না, ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ব'সে-ব'সে শুনলেন নিজের কবিতার আবৃত্তি, বিচারকের সিদ্ধান্ত, আর শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস।

কিন্তু এর পর তাঁর পক্ষে লুকিয়ে থাকা আর সম্ভব হ'লো না। দেশের মধ্যে তাঁর কবিতার চাহিদা জেগে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজন অনুবাদক তাঁরও কিছু কবিতা ও মন্তব্য বইয়ের

মধ্যে প্রকাশ করলেন। গেব্রিএলা মিস্ত্রাল ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর আবির্ভাব হ'তে লাগলো।

স্বদেশে সমাদরের অভাব ছিলো না, তবু ঘটনাচক্রে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হ'লো নিউ ইঅর্ক নগরীতে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট Institute de las Espanas-এর তত্ত্বাবধানে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্পানিশ অধ্যাপক শ্রীমতী মিস্ত্রাল-এর কয়েকটি কবিতা প'ড়েই নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন তাঁর প্রতিভার অসামান্যতা। পূর্বোক্ত স্পানিশ-মণ্ডলীতে এই নবীন কবিকে অবলম্বন ক'রে একটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষক—একজন শিক্ষক, তাঁদেরই একজন, তিনি এত বড়ো কবি! সকলেই উৎসাহী, তাঁর বইয়ের জন্য সকলেরেই আগ্রহ। কিন্তু বই কোথায়, সাময়িক পত্রের কয়েকটি ছিন্ন অংশ ছাড়া অধ্যাপকের হাতেও কিছু নেই। তখনই স্থির হলো যে বক্তৃতার শ্রোতৃগণ প্রত্যেকে এক-এক খানা বইয়ের মূল্য অগ্রিম দিয়ে দেবেন. আর সেই টাকায় ছাপা হবে গেব্রিএলা মিস্ত্রাল-এর প্রথম বই। অধ্যাপক কবিকে লিখলেন, কবি পাঠিয়ে দিলেন পাণ্ডুলিপি, হলদে কাপড়ের মলাটে বিশ্ববিদ্যালয়িক আনুকুল্যে প্রকাশিত হ'লো শিক্ষক-কবির প্রথম কবিতার বই, Desolacion। এটা ১৯২২ সালের কথা।

বইখানাতে কোনো ইংরেজি অনুবাদ বা ভাষ্য ছিলো না, সেইজন্য নিউ ইঅর্কে প্রকাশিত হ'য়েও মার্কিন সাহিত্যজগতে কণামাত্র কম্পন উঠলো না [illegible] কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাকে জয় ক'রে নিলো দ্রুতবেগে, পৌঁছলো স্পেনে, স্পেন পার হ'য়ে ফ্রান্সে, অন্যান্য দেশেও একটু-একটু ছড়ালো। একটু-একটু, তার বেশি নয়। একে তো কবিতা, তার উপর পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প, আবার ভাষাও স্পানিশ, নিতান্তই পরিমিত তার ব্যাপ্তি। স্পেনের বাইরে যে ইওরোপ সেখানে দু'চারজন তাঁর লেখা পড়লেন, কিন্তু পাশ্চাত্য মহাদেশের বৃহত্তর সাহিত্যসমাজে তাঁর নামই উঠলো না, বিশেষ ক'রে ইংরেজিভাষী

জগতে তাঁর কবিতা পথই খুঁজে পেলো না যেন; ফরাশি, জর্মন, ইতালিয়ান ও সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর, কিন্তু দুটি মাত্র ইংরেজি কাব্যসঞ্চয়নে তাঁর কয়েকটি মাত্র কবিতা স্থান পেয়েছে এ-পর্যন্ত। ইংরেজের এ-দুর্ভাগ্যের অংশ বহন করছি আমরাও।

সাহিত্যের বিশ্বরূপের সাধনা মানুষের যতই ঐকান্তিক হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আপন ভাষার মাতৃভূমিই তার স্বরূপের ক্ষেত্র। বিশেষভাবে এ-কথা সত্য কবিতার পক্ষে—কেননা কবিতার অনুবাদ দুঃসাধ্য, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব। বৈদেশিক প্রতিপত্তির শাখা-প্রশাখার উদ্গমও যদি না হয়, তবু মৌল মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলেই কবির প্রাণ বাঁচতে পারে। এ-বিষয়ে শ্রীমতী মিস্ত্রাল-এর ভাগ্য বাঙালি কবির চেয়ে অন্তত ভালো, কোনো-কোনো ইংরেজ কবির চেয়েও। কাব্যপ্রেমিক স্বজাতির অকৃপণ অভ্যর্থনা প্রথম থেকে তিনি পেয়েছেন। তাঁর জীবিকার বিবরণ শুনে মনে হয় যে চৈনিকদের মতো চৈলিকদের মনেও এই অসাধারণ বিশ্বাস আছে যে রাজকর্মও একটি কবিকৃত্য। রাষ্ট্রকে সম্মানিত করেন যে-মনীষী, তাঁর সম্মাননায় রাষ্ট্রের কেন কুণ্ঠা থাকবে, এইরকম তাদের মনের ভাব। Desolacion প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মেক্সিকোর শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী মিস্ত্রালকে আহ্বান করলেন সে-দেশের পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কৃতিসাধনে: চিলির বাইরে সেই তাঁর প্রথম পদার্পণ। মেক্সিকোর কাজ শেষ ক'রে কিছুদিন ইওরোপে কাটালেন ১৯২৪-এ মাদ্রিদ থেকে প্রকাশ করলেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ-বইখানাও ছোটো, ছোটোদের কবিতাগুচ্ছ, নাম Ternura; স্বদেশে তাঁর প্রত্যাবর্তন অভিষিক্ত হ'লো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মঙ্গলাচরণে। লীগ অব নেশন্স-এর Institute for Co-operation-এ চিলির প্রতিনিধি হলেন, ১৯৩১-এ এলেন মার্কিনদেশে অধ্যাপক হ'য়ে। সেই সময় থেকে থেকে চিলির কনসল বা রাষ্ট্রিক প্রতিনিধিরূপে পালেরমো, মাদ্রিদ, লিসবন, রিও ডি জানেরিও ও

৯

অন্যান্য রাজধানীতে বাস করেছেন, বর্তমানে আছেন ব্রাজিলের পেট্রোপোলিস নগরে।

তাই ব'লে তাঁর সাহিত্যজীবন নিরঙ্কুশ মসৃণতার ইতিহাস নয়। কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের আসন ভারতবর্ষের মতোই দক্ষিণ আমেরিকায় অবারিত নয় এখনো। নিন্দার আন্দোলন তীব্র হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে। প্রথম কবিতাগুচ্ছের আবেগপ্রাবল্য গতানুগতিক মনের পক্ষে 'দুঃসহ হয়েছিলো। তারপর ধর্মদ্রোহী ব'লে তাঁর বিরুদ্ধে রব উঠলো—যদিও তিনি মনে-প্রাণে ক্যাথলিক। পুরোহিততন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করেন, আর তাঁর ভক্তিপ্রবণ কবিতার ভাষা একেবারেই প্রথাসম্মত নয়, এই দুটোই তাঁর অপরাধ ব'লে গণ্য হয়েছে। শত্রুতা ফণা তুলেছে রাজনীতির সূত্র ধ'রেও। স্পানিশ গৃহযুদ্ধের সময় যারা গৃহহারা হ'লো সেই দুর্ভাগাদের—বিশেষ ক'রে শিশুদের—আশ্রয় দিতে দক্ষিণ আমেরিকা যে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে না, এর বেদনা বিদীর্ণ করলো তাঁর হৃদয়। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, TALA এই বেদনারই বাণীরূপ। বইখানা প্রকাশ করলেন আর্জেন্টিনা থেকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (রবীন্দ্রনাথের বিজয়া) আর তার উপস্বত্ব ব্যয়িত হ'লো অনাথ শিশুদেরই সাহায্যকল্পে। ভূমিকায় কবি জানালেন যে 'বইখানা তিনি লিখেছেন যেহেতু পৃথিবীর বাতাসে-বাতাসে বিক্ষিপ্ত স্পানিশ শিশুদের আর-কিছুই তাঁর দেবার নেই।' বলা বাহুল্য, ফ্রাঙ্কোর পক্ষপাতীরা খুশি হ'লো না, আক্রমণ উদ্ধত হ'য়ে উঠলো। সম্প্রতি আবার কবির বন্ধুরাই আপত্তি করছেন এই ব'লে যে তাঁর রচনায় উপদেশের সুর বেজে উঠেছে অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট হ'য়ে। অনেক লেখকের জীবনেই এই পরিহাসটি ঘ'টে থকে: প্রথম জীবনে তাঁরা নিন্দিত হন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব'লে, পরবর্তী জীবনে লাঞ্ছিত হন যথেষ্ট সাহসী নন ব'লে। এ দুই বিপরীত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কোনো-এক সময়ে দুটো-একটা ভালো কথা বলবার লোক যে জোটে এটাই এক-এক সময় আশ্চর্য বোধ হয়।

গেব্রিএলা মিস্ত্রাল সম্বন্ধে যে-সব তথ্য এখানে উল্লিখিত হ'লো তা সমস্তই পেয়েছি NEW YORK TIMES BOOK REVIEW-র প্রবন্ধ থেকে। কবির বিষয়ে খবরই এতে বেশি, কবিতা বিষয়ে আলোচনা অত্যল্প; তবু যেটুকু আছে তা থেকে মিস্ত্রালের কবিতার জাত চিনতে পারলাম। সুগভীর বেদনারসে পরিপ্লুত তাঁর কাব্য। তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম DESOLACION—এই কথাটিতেই যেন বিশ্বব্যাপী বন্ধুহীনতার হতাশা হাহাকার ক'রে উঠলো। এ-বই এমন তিক্ত, এমন নিষ্ঠুর যে বইয়ের শেষে তিনি নিজেই লিখেছেন: 'ঈশ্বর যেন আমার এই তিক্ততা ক্ষমা করেন, আর সেই সব মানুষও যেন ক্ষমা করে জীবনকে যারা মধুর ব'লে জানে।' তাঁর তরুণ বয়সের প্রণয়ীর আত্মহত্যা, তারপর অতি প্রিয় একটি আত্মীয়ের আত্মহত্যা—এই দুটি অপমৃত্যু যে-দুঃখের স্বাক্ষর এঁকে গিয়েছিলো সমস্ত জীবনেও তা নিশ্চিহ্ন হ'লো না। যে-কবিতা লিখে সান্টিআগোর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন তাও মৃত্যুর উদ্দেশে তিনটি সনেট। যৌবনে যখন আলোকে সংগীতে আনন্দে জীবনের উচ্ছলতাকে মনে হয় অফুরন্ত, তখন থেকেই মৃত্যুর ধ্যানে তিনি আবিষ্ট। তারই মধ্যে শিখার মতো জলছে শিশুদের সম্বন্ধে তাঁর বিশাল ভালোবাসা, শিশু-শিক্ষকের মহিমার চৈতন্য। তিনি অবিবাহিত; নিঃসন্তান নারীর অবরুদ্ধ বেদনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন, কোনো-একজন সমালোচকের মতে এই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আমাদের দেশে নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে একটা পুতুল পুজো প্রচলিত আছে, যে-পুতুলপুজো সম্প্রতি 'স্টালিন প্রাইজে'ও সংক্রমিত হয়েছে। যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন তাঁরই শ্রেষ্ঠতা আমরা অনেকেই অন্ধের মতো মেনে নেই; টমাস হার্ডিকে ফেলে মাতামাতি করি সিনক্লেআর লুইসকে নিয়ে। এ-কথা মানতেই হবে যে এ-পুরস্কার কখনো-কখনো অযোগ্যের কাছেও গেছে, যার ফলে এর সাহিত্যিক মূল্যে কিঞ্চিৎ ম্লানতা এসেছে। তার উপর এ-রকম একটি সূক্ষ্ম

সংশয়ও মনকে দংশন করে যে সম্প্রতি এই পুরস্কার একটি রাজনৈতিক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ-কোনো সময়ে বিশেষ-কোনো দেশের প্রীতি অর্জন করবার উদ্দেশ্যে। তবে গেব্রিএলা মিস্ত্রাল সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেলো তাতে মনে হয় তিনি একজন সত্যিকার কবি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনার যোগ্য, এবং নোবেল প্রাইজ উপলক্ষ্যে তিনি যে আজ বৃহৎ বিশ্বের দৃষ্টিগোচর হলেন, পুরস্কারের আসল মূল্য এইখানে।

সমালোচনা

নষ্টচাঁদ, অজিত দত্ত। দেড় টাকা।

আট বছর পরে অজিতবাবুর নতুন কবিতার বই বার হোলো। পনেরো বছরে এই তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। অজিতবাবুর কবিতা ভালোবাসেন এবং প্রকাশিত গ্রন্থে কি সাময়িকীর পৃষ্ঠায় তাঁর কবিতা দেখবার জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করেন এমন পাঠকসংখ্যা বিরল নয় বলেই আমার বিশ্বাস। সত্যিকারের ভালো কবিতা পড়তে পাওয়ার মতো সৌভাগ্য অতি অল্পই আছে এবং অজিতবাবুর কবিতা পড়ার সময়ে নিজেকে আমার সেই দুর্লভ সৌভাগ্যবানদের একজন বলে মনে হয়।

যে-কোনো কবির কবিতাসমষ্টিকে—অবশ্য কবি তাঁর কাব্যের অঙ্গীকার যথাযথ পালন করেছেন ব'লে যদি বিশ্বাস করি—প্রকৃত অর্থে তাঁর জীবনী বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের সর্বজনপরিচিত ক্ষণিকার মিষ্টি বিদ্রূপটুকু সত্ত্বেও কাব্যই কবির জীবনী। নষ্টচাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে কুসুমের মাস, পাতালকন্যা পড়তে পড়তে এই কথাটাই আবার আমার মতো হোলো : কুসুমের মাস থেকে নষ্টচাঁদ। যৌবনের প্রথম প্রেমের নিবিড় কোমল উষ্ণতা, 'নিঃঝুম নিশীথ' 'বাগানের পুকুরের ঘাট', রূপকথার পাতালকন্যার কিম্বা 'শালতালতমাল হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়াম্লান দেশ' থেকে সাম্প্রতিক কলকাতার বিবর্ণ দুপুর! দীর্ঘ মনোপথ বেয়ে একটি নিঃসঙ্গ কবির মানস-ভ্রমণ। চোখে তাঁর কাব্যের মায়াকাচ। সাম্প্রতিক জীবনের বিদ্রূপ নষ্টচাঁদ, অথবা 'রোস্ট কি কাবাব হ'য়ে বিহঙ্গ জন্মেরে ধন্য করে' যেই বুনোহাঁস তার দিকে তাকিয়েও সেই মায়াকাচ তাঁর চোখ থেকে খ'সে পড়েনি। এইটেই আশ্চর্য্য এবং কাব্যপাঠকের পক্ষে কতো যে তৃপ্তিকর তা সাময়িক কাব্যের শূন্যপ্রায় হৈমন্তী মাঠ বেয়ে যাঁরা চলাচল করেন তাঁরাই অনুভব করবেন।

কবি অজিত দত্তের মতো নিঃসঙ্গচিত্ত কবিও খুব কমই আছে। স্বভাবতই তিনি আড়ালপ্রিয় কবি। সার্থক প্রেমের কবিতারচয়িতারাই যা হ'য়ে থাকেন। আর একটি হৃদয়ের নিবিড় উষ্ণ উপস্থিতি এতকাল যেন সেই নির্জনতা ভ'রে ছিল।

কুসুমের মাস, পাতালকন্যার কবি তো সেই দ্বৈত নিঃসঙ্গতার কবি। নষ্টচাঁদের কবি প্রকৃত অর্থেই নিঃসঙ্গ। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়

তুমি পাশে থাকো রূপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন—
গৃহিণী সচিব শিষ্যা এবং—এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জানতে চাই না, জানলে রোজগার হবে ক্ষীণ
চাঁদ তো উপোসে মরে না ; কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে।

বিদ্রূপের সুরও নষ্টচাঁদে প্রথম এতো বেশী ক'রে দেখা গেল। আসলে নষ্টচাঁদের অধিক সংখ্যক কবিতাই স্বপ্নভঙ্গ-কবির বিদ্রূপের কবিতা। বেদনার্দ্র ব'লেই বিদ্রূপ কাব্যের এলাকা অতিক্রম করেনি। বরং কখনো-কখনো সাম্প্রতিক জীবনের গভীর অপূরণীয় ক্ষতির কথা স্মরণ ক'রে তাঁর সুর করুণায় ভরে উঠেছে।

কোন প্রভাতের পাখীর গানে কবে
হারিয়ে যাবে আজকে দিনের আর্ত হাহাকার
শরৎ আবার মেলবে ডানা ফুলমেঘে ধবধবে
আমার হৃদয় ফিরবে না তো আর।

নষ্টচাঁদের বিদ্রূপের সুরলাগা এই কবিতাগুলো পড়তে পড়েত আমার কখনো কখনো ক্ষণিকার অনেক কবিতার কথা মনে হোলো। ছন্দের সেই সহজ এবং আশ্চর্য্য দখল, ভাষা ব্যবহারের সেই মৌখিক অথচ চতুর ভঙ্গী। স্মরণযোগ্যতা যদি কাব্যের সার্থকতার একটি প্রকৃত নিদর্শন হয়—(যে কথা আমি নিজে বিশ্বাস করি) তাহ'লে নষ্টচাঁদের মধ্যে এমন সার্থক পংক্তির সংখ্যা অনেক।

গ্রন্থপরিচিতিতে দেখছি লেখা আছে—'এই বইয়ের সবগুলি কবিতা যুদ্ধের মধ্যে লেখা। পাঠককে একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি।' একটা যুদ্ধের অপরিমেয় ক্ষতির মধ্যে একটি ভালো কবিতার বই। কেউই খুসী না হ'য়ে পারেন না। তাঁর অপরাজেয় কবি-মন কিছুতেই হার মানবে না, বিদ্রূপসত্ত্বেও নষ্টচাঁদ পড়ে এ-প্রত্যয় দৃঢ় হোলো।

স্বাক্ষর, গোপাল ভৌমিক। এক টাকা।

সম্ভবত সাহিত্যের অন্য কোন মহলের যশঃপ্রার্থীদের প্রথম প্রকাশের দায়িত্ব প্রথম কবিতার বই প্রকাশের মতো গুরুতর নয়। কবিতার পাঠকসংখ্যা সর্বকালে সর্বদেশেই সীমাবদ্ধ। আর সাম্প্রতিক কবিদের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন

তাঁদের সংখ্যা তো বোধ করি আঙুলে গুনেই বলা যায়। বিদেশেই হালকবিদের রচনা কালের কবরে জারিত হ'য়ে ক্লাসিক হ'য়ে না-উঠলে পাঠকসাধারণের দৃষ্টি-গোচর হয় না। কবিতার প্রথম প্রকাশ তাই এতটা উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন যাতে আমাদের এই মানসিক নির্জীবতা একটা মধুর আনন্দের আঘাতে কেঁপে ওঠে। সত্যিই তো, ক'খানা প্রথম প্রকাশিত কবির বই পড়ে আমাদের আরো কৌতূহল জাগে যে—আহা, এই কবির লেখা আরো কবে পড়তে পাবো? এ-সব কথা মনে রেখেই গোপাল ভৌমিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বাক্ষর' পড়লুম। এবং স্বীকার করি ভালো লাগলো। প্রথম দিককার কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধেই একথা বেশি প্রযোজ্য। 'বিস্ময়', 'চুল', 'স্মরণী', 'হাজার বছর পরে', 'মহানগরী' আমার কাছে এই কবিতাগুলিই এ বইয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হলো। গদ্যছন্দে লিখিত 'স্মরণী' তো উজ্জ্বল একটি স্মরণীয় কবিতা। গাঢ় বেদনাছোঁয়া একফোঁটা চোখের জলের মতো এই কবিতাকণা। সবটুকু তুলে দিলুম।

আমার চোখের সামনে
কালো রাত্রি নামল ;
বিদায়কামী ম্লান আলো—
আর ধূসর নরম গোধুলি।
আকাশের ওপারে দেখা দিল দুটো তারা
নিঃসঙ্গ একাকী :
একটি লজ্জায় নতমুখী
আর একটি বর্বর বিকাশের আনন্দে উজ্জ্বল।
তোমাকে মনে পড়ে গেল ;
কতদূরে তুমি রাণী ?

যদিও সামাজিক বেদনাবোধ এবং ভাবী সমাজের সুস্থতার বিশ্বাসই অধিক সংখ্যক কবিতার উপজীব্য তবু ব্যাক্তিগত হৃদয়াবেগের কবিতা কটিই আমার কাছে বেশি ভালো মনে হোল। বেদনা বা যে কোন হৃদয়ানুভূতিই তীক্ষ্ণতায় বিদীর্ণ না হলে কাব্যরূপ পায় না। সামাজিক বেদনাবোধ সম্বন্ধেও তাই। কতো কতো সামাজিক চেতনার কবিতায় কাব্য যে সার্থক হয় না আমার মনে হয় যে যৌথ বেদনাবোধ কবির চিত্তকে অনুরূপ আলোড়িত করে না বলেই। 'আমার দুঃখ আমার বেদনা'— আমার বলেই তার প্রকাশও সহজ এবং স্বাভাবিক। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় সামাজিক চেতনার কবিতায় আমি সেই অনিবার্য্য আবেগের সুর পাই না। স্বাক্ষরের কবিতাগুলি উদ্দেশ্য করে বললেও একথা সাধারণভাবে বিবেচ্য। ব্যক্তিগত আবেগের আরো অনেক সুন্দর কবিতা গোপালবাবু লিখবেন বলে উৎসুক থাকবো।

নরেশ গুহ

নবীনচন্দ্র সেন

কোনো লেখকের পক্ষে 'ক্লাসিক' ব'লে গণ্য হওয়া সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সে-বিষয়ে মনস্থির করা শক্ত। কেননা সেই লেখকই 'ক্লাসিক' যাঁর মৃত্যুর পরে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, যিনি নিরুপদ্রবে গ্রন্থাগারের মঞ্চ-সমাহিত, জীবন্ত আঙুলের স্পর্শে যাঁর পীত পত্রাবলীতে প্রাণসঞ্চার হয় না, আতপ্ত অধরের অনুরক্ত উচ্চারণ যাঁর বাণীকে হিল্লোলিত করে না, যিনি স্বীকৃত, ঐতিহাসিকের কুক্ষিগত, এবং বিস্মৃত। আমাদের দেশে এই স্মরণহীনতার প্রবলতা যেন কিছু বেশি: মৌশুমি হাওয়ার সময়ে যেমন অবিরল অর্ঘ্যবারিবর্ষণে আমরা অকৃপণ, ঋতুবদলের দিনে আমাদের বিস্মরণের আকাশও তেমনি নির্বীজ। কবি নবীনচন্দ্র সেন এককালে বহু পাঠকের চিত্তে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিলেন; আজকের দিনের পাঠক তাঁর নাম মাত্র জানে, হয়তো তাঁর কয়েক খানা কাব্যগ্রন্থেরও নাম কারো-কারো জানা আছে। এর একটা কারণ হয়তো এই যে আজকের দিনে মহাকাব্যের আসন নিয়েছে উপন্যাস; সেই স্বল্প-গল্পের যুগে নবীনচন্দ্রের কাব্য পাঠকের যে-আগ্রহটি পূরণ করতো, সে-আগ্রহের খাদ্য আজ অবিশ্রান্ত জুগিয়ে যাচ্ছে ভূরিপরিমাণ গল্পসল্প। যুগে-যুগে সাহিত্য-কলার আদর্শের পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাই ব'লে পূর্বযুগের সাহিত্যের আন্তরিক মূল্যের বিকৃতি ঘটে না; সে-মূল্য প্রথম উচ্ছ্বাসের দিনে যেটুকু ছিলো পরবর্তী প্রত্যাখ্যানের দিনেও সেটুকুই থাকে। সে-মূল্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা বিশেষজ্ঞের কাজ, এবং সে-জন্য বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সাহিত্য-ক্ষেত্রের একটি স্মৃতিসঞ্চারী মঙ্গলাচরণ—একে আমরা সর্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করি। এ-উপলক্ষ্যে সাহিত্যজগতে নবীনচন্দ্রের নবীন জন্ম যদি হয়, যদি এ-যুগের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে আমরা নূতন ক'রে যাচাই ক'রে তাঁর সত্য মূল্য নিরূপণের পথে অগ্রসর হই, 'তাহ'লেই এ-অনুষ্ঠান সার্থক হ'তে পারে।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হ'লো। এই সংখ্যায় আছে পত্রপুট, শ্যামলী, পরিত্রাণ, গল্পগুচ্ছ, রাশিয়ার চিঠি, মানুষের ধর্ম। গ্রন্থপরিচয় সুপ্রচুর।

'লিপিকা'র নূতন সংস্করণে নূতন একটি রচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, 'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হ'লো।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় নূতন সংযোজনা 'সংস্কৃত সাহিত্যের কথা'। লেখক শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী।

প্রকাশক—বুদ্ধদেব বসু ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডরি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস্ লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] আষাঢ়, ১৩৫৩ [ক্রমিক সংখ্যা ৫০

'শেষের কবিতা'র লাবণ্য

['শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যর প্রতি অবিচার করেছেন কিনা, এ নিয়ে কিছুদিন আগে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা-কেন্দ্রে একটি আলোচনা হয়েছিলো। আলোচনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসু। সময়াভাবে দুটি প্রবন্ধের একটিও সম্পূর্ণ পড়া সম্ভব হয়নি; রেডিওতে যাঁরা কান পেতেছিলেন তাঁরা খুব সম্ভব নিরাশ হয়েছিলেন। অথচ বিষয়টি বিশেষভাবে ও বিশদরূপে আলোচনার যোগ্য—প্রশ্নটি অবশ্য এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ কি লাবণ্যর প্রতি অবিচার করেছেন, প্রশ্নটি বরং এই যে শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেরই প্রতি অবিচার করেছেন কিনা। এখানে উপরি-উক্ত প্রবন্ধ দুটি পাশাপাশি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'লো; তার মানে অবশ্য এ নয় যে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে। তবে কতগুলি সুসম্পৃক্ত প্রশ্নের প্রবর্তনা করা হ'লো এখানে, তা অবলম্বন ক'রে বিস্তৃততর আলোচনা ভবিষ্যতে হ'তে পারে। —সম্পাদক।]

১

আমি তো বলি রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের প্রতি অবিচার করেন নি। বোধ হয় সুবিচার অবিচার কোনোটাই করেন নি। কেননা লেখকের কাজ বিচার করা নয়, প্রকাশ করা। লাবণ্য অতি উজ্জ্বল সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের কাছে—আমরা তার লাবণ্যময়ী স্থির মননশীল গম্ভীর প্রকৃতির পরিচয় পেলাম, সব মিলে তার চারিত্রের মধ্যে একটি নিগূঢ় সঙ্গতিই যেন আগাগোড়া লক্ষ্য করেছি।

জানি, অবিচার করা হয়েছে বললে এই কথাই বলা হয় যে লাবণ্যের

স্বভাব দ্বিধা-বিখণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে, সঙ্গতি রক্ষা হয়নি। গল্পের প্রথমাংশে তার যে সুসঙ্গত পূর্ণরূপ দেখেছি, শেষ দিকে যেন তার সঙ্গে তেমন সামঞ্জস্য দেখতে পাই না। অনেকে বলবেন অমন আশ্চর্য শান্ত প্রফুল্ল প্রেমোজ্জ্বল তার রূপ গল্পের দ্রুত পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে কেমন অকারণ অন্য মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। এখানে আমি বলতে চাই, লাবণ্যের মূর্তি বদ্‌লেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু ঘটনাও যে বদ্‌লেছে। ঘটনার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে লাবণ্যের চরিত্রের অবনতি ঘটেনি, পরিণতিই ঘটেছে। আমার বক্তব্য এই যে, যে-বদলটা লাবণ্যের চরিত্রে দেখতে পাই, তার হঠাৎ কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগের যে আকস্মিক কঠিন বিকাশ প্রেমের ভরা-স্বপ্নের মধ্যে অমন দুর্নিবার হয়ে উঠল, তার কারণ সন্ধান করতে হলে বাহিয়ের ঘটনা এবং লাবণ্যের প্রকৃত স্বভাব দুয়েরই পরিচয় পেতে হবে। লাবণ্য যখন গল্পে দেখা দিল তার পূর্বেই সে অনেক দুঃখ অনেক দাহের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে শেষে বরদাবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে; অধ্যাপনার কাজে শান্ত ভাবে তার ঔৎসুক্যহীন জীবন সমান ছন্দে বয়ে চলছিল। হৃদয়ের নিভৃতে তার ঢাকা ছিল শোভনলালের সঙ্গে অসমাপ্ত বন্ধুত্বের একটি কাহিনী; সেই কাহিনীর স্মৃতি বেদনাময় কিন্তু সেই বেদনা তার নিজের দিক থেকে প্রেমের বেদনা নয়, যে তাকে ভালোবেসেছিল তার প্রতি ঠিক ব্যবহার করে নি বা করা সম্ভব হয় নি সেই জন্যে বেদনা। এমন সময় লাবণ্যের সমস্ত জীবন আলোড়িত ক'রে দেখা দিল অমিত রায়, সাড়া দিল তার সর্বস্ব চেতনা, প্রেমের সূর্য উঠল হৃদয়ে। এই প্রেম ধ্রুব সত্যের আলোয় আলোকিত, কিন্তু হায়রে, সেই আলোককে গৃহদীপ ক'রে বিবাহিত সংসারে জালিয়ে রাখবার উপায় লাবণ্য দেখতে পেল না—বরং এই কথাই সে হৃদয়মনের চরম আনন্দের সমস্ত আচ্ছন্নতাকে অতিক্রম ক'রেই বুঝতে পারল যে অমিত রায় ঘরে বাঁধা পড়বার ছেলে নয়, আলো জ্বালিয়ে চলে যাওয়াই তার স্বভাব। আগে ছিল তার সিসি, লিসি, লিলি গাঙ্গুলি—সবাইকে নিয়ে সে খানিকটা

খেলেছে, মানসমূর্তি গড়েছে, নিজেকে নানাজনের চোখে নানা রঙা ক'রে জেনেছে, জানিয়েছে। অমিত রায়ের পক্ষেও লাবণ্য পরম এবং চরম আবির্ভাব, তারই সঙ্গে তার আনন্তিক প্রেমের যোগ, কিন্তু লাবণ্যকে ভালোবেসে সে নিজেকেই আরো বেশি ক'রে পেয়েছে, সেইটেই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা। লাবণ্যের দিক থেকে সংসারের কথা ভাববার তার সময় কোথায়—নিজেকে ফেনিয়ে ঝাড়িয়ে কথার ঢেউ তুলে বার-বার পাত্র ভ'রে-ভ'রে লাবণ্যের কাছে আত্মদান করাতেই তার আত্মতৃপ্তি। অনেক আর্টিস্টেরই স্বভাব এই, কিন্তু যারা আর্টিস্ট হয়েও আর্টিস্টের চেয়ে বড়ো, অর্থাৎ যাঁরা মহান্ চরিত্রবান পুরুষ তাঁরা আর্টকে স্বমহিমায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত ক'রেও জীবনের বিবিধ দায়িত্বের মধ্যেই আর্টকে সঙ্গত করেছেন। যে-কোনো আর্টিস্টের পক্ষে এই দুই দায়িত্ব—সংসারের প্রতি দায়িত্ব এবং আর্টের প্রতি দায়িত্ব—একই সঙ্গে পূর্ণ ক'রে চলা কঠিন। অমিত রায়ের পক্ষে তা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। প্রথম থেকেই সে-কথা আমরা বুঝতে পারি। সে হল সৌখীন আর্টিস্টের পর্যায়ী, তার পক্ষে কথা বলা এবং ছন্দে বেঁধে কথা লেখাই অফুরন্ত ব্যসনের মতো, এই নেশাই তার বড়ো নেশা। লাবণ্য তার জীবনে এল, অমিত উচ্ছলতাকে লাবণ্যের পরিমিত বন্ধনে বাঁধবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু অমিতকে বাঁধবার শক্তি তারও নেই সে কথা লাবণ্য বুঝেছিল—বিবাহের মধ্য দিয়ে অমিতর অশান্ত জীবনকে সে বাঁধতে পারলে ধন্য, কিন্তু মিলনের অতি-সান্নিধ্যে, প্রাত্যহিক পরিচিতির মধ্যে দিয়ে অমিতকে দুরূহ শক্তি সে দিতে পারবে সে ভরসা লাবণ্যের ছিল না। নিবিড়তম ভালোবাসার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই প্রেমময়ী নারী এই মহান্ সত্যকে দেখতে পেলে যা সাধারণ ভালোবাসার চোখে দেখা সম্ভবপর হত না। বিদায়ের মুহূর্তে নয়, প্রেমের ভরা জোয়ারের মধ্যেই তাই লাবণ্য একদিন বলে উঠেছিল—

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা

বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের ; সাহিত্যে সাহিত্যে তোমার বিহার, আমার কাছেও সেই জন্যেই তুমি এসেছ।"

এর উত্তরে অমিত রায় ঠিক কিছু বলতে পারল না, কিন্তু জানালো যে পূর্বে তার স্বভাব যেমন ছিল তেমন তো আর নেই—লাবণ্যের ভালোবাসাই তাকে বদ্‌লিয়েছে। অর্থাৎ ঘরে বাঁধা থেকেই অমিতর স্বভাব তার জীবনের মূল ক্ষ্যাপামিগুলোকে বজায় রাখবে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত অমিতর কথায় পাওয়া গেল। লাবণ্যের চোখের পাতা ভিজে এল—কিন্তু অমিতকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে বলেই লাবণ্য তাকে চিনেছিল, সে ভুলতে পারলো না যে অমিতর জীবন নিত্য নূতনের সন্ধানী, কেবলই বাসা ভেঙে-ভেঙে পথে উত্তীর্ণ হওয়াই তার ধর্ম। অমিতকে প্রাণান্তিক ভালোবাসে বলেই লাবণ্য চাইল যেন সে অমিতর বন্ধন না হয় ; মুক্তির সঙ্গিনী হয়ে দূরে থাকা সেও তার ভালো। এ কথাও ঠিক যে বাসা-ভাঙার খেলা কোনো মেয়েই খেলতে প্রস্তুত নয়। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু লাবণ্য ব্যতিক্রম নয়, সে পূরোপূরি সাধারণ মেয়ে রূপেই অসামান্য। লাবণ্য, যাকে অমন ক'রে চিরদিনের মতো ভালোবেসেছে তার সঙ্গে ঘর বেঁধে আবার কি ঘর ভাঙা যায়? তার চেয়ে ঘর বাঁধবার আগেই কঠিনতম সত্যকেই প্রেমের শক্তি দিয়ে যেন মানি। বরঞ্চ লাবণ্যের কাছ থেকে বিরহের বেদনা পেলে অমিত যে-সংসারেই থাকুক এক জায়গা থেকে তার জীবনে ত্যাগের শক্তি, সংসারধর্ম পালনের শক্তি জাগবে। কেটি-কে বিবাহ ক'রে অমিত দুই দিক থেকে আপন চরিত্রকে বেঁধে তোলবার সুবিধা পেল—প্রথমত মানুষ গড়বার সুখ, যা তার প্রধান সুখ, আর্টিস্টমাত্রেরই যেটা অন্যতম সুখ, কেটি-কে নিয়ে তার চর্চা অমিত করতে পারবে। লাবণ্যকে নিয়ে সেই চর্চা হতে পারত না, কেননা লাবণ্য যে গড়া-মানুষ, পূর্ণ-স্বভাবা সুলক্ষণা মেয়ে,—তাকে নিয়ে গড়বার সাধ্য নয় অমিত-র,

বিধাতা আগেই তাকে পূর্ণ ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন। Miss কেটি-কে শ্রীমতী কেতকী দেবী ক'রে তোলবার কাজে অমিত আপন সৃষ্টিশীলতার আনন্দ পাবে। দ্বিতীয় কথা এই যে লাবণ্য দূর থেকে অমিতকে আরো বেশি দেবে কাছে থাকার চেয়ে—অত আপন, একধর্মী, সমকক্ষ আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে ঘর করা অমিতর পক্ষে কঠিনতর হত। সমকক্ষতার দাবি মেটাবার মতো যথার্থ বড়ো দরের আর্টিস্ট এবং পৌরুষচারিত্র অমিতর ছিল না—সেটা তার পক্ষে ততটাই অসম্ভব হত যেমন অসম্ভব হত রোমান্টিক যুগের উচ্ছলস্বভাবী কবিদের পক্ষে বা প্যারিসের প্রতিভা-সম্পন্ন অথচ ছন্নছাড়া ভবঘুরে স্বভাববিশিষ্ট আর্টিস্টের পক্ষে।

এ সব কথা বলে বোঝানো যায় না, কিন্তু বোঝা যায়—তাই রবীন্দ্রনাথ তর্কের মধ্যে না গিয়ে কাব্যের চরম ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিলেন। লাবণ্যের শেষ কবিতার মধ্যে সব কথাই বলা হয়েছে। যা ঘটনায় অতি প্রকট, অতি নিদারুণ হয়ে দেখা দিতই, তার অনিবার্যতা দূর থেকেই প্রেমের দিব্য দৃষ্টিতে লাবণ্য পূর্ব হতেই দেখতে পেল,—যে-মিলন সংসারে পূর্ণ হবার নয় তাকে সে সংসারে টেনে এনে তিলে-তিলে মরবার সুযোগ না দিয়ে নিজের শক্তিতে দূরে চলে গেল।

স্বীকার করি যে লাবণ্য, অমিত, দুজনেই সংসারের মাটির ঘরে প্রাত্যাহিক সান্নিধ্যের মধ্যেই মিলনের ধ্রুবলোক গড়বার শক্তি দেখাতে পারলে তাদের আরো চারিত্রশক্তি প্রকাশ হত। কিন্তু সে শক্তি অমিতর ছিলই না, লাবণ্যের মধ্যেও কোথায় একটু দুর্বলতা ছিল। শৈশব হতে সংসারে বার-বার আঘাত খেয়ে এবং শোভনলালের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবার স্মৃতির কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে তার আত্মপ্রত্যয়ের অতটা শক্তি ছিল না। এমনিতেই কোমলস্বভাবা নারীর পক্ষে ত্যাগ করা সহজ, যদি সেই ত্যাগের দ্বারা প্রেমাস্পদের অধিকতর মঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে, নিজের দাবিকে জোর ক'রে প্রকাশ করা তাদের পক্ষে ততটা স্বাভাবিক নয়। প্রমাণ হল, লাবণ্য কঠিন নয়, আসলে সে দুর্বল ; দূরে চলে গিয়ে সে তার প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ের কোমলতাকেই প্রকাশ করল।

ঘটনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ "শেষের কবিতা"র বিরহের অনিবার্যতাকে দেখাতে চেষ্টা করেননি, যদিও লাবণ্য-অমিতর বিবাহিত সংসারের মধ্যে যে ঘটনার বাধাও আছে, তার ইঙ্গিত ঐ গল্পে পাওয়া যায়। কিন্তু বাধা যেখানে প্রধানত স্বভাবের মূলে নিহিত সেখানে বাহিরের বাধাকে স্পষ্ট ক'রে দেখালে লাবণ্য-অমিতর মনোগত নিগূঢ়তম কাহিনীকে আচ্ছন্ন করা হত। অমিত-র মতো আর্টিস্ট শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেতে পারে চরম ত্যাগের বেদনায় - মিলনের সহজতার ভিতরও ত্যাগের আনন্দের সাধনা জাগিয়ে রাখা তার সাধ্যের অতীত। লাবণ্যের হাতে দিয়ে বিধাতা সেই চরম দান অমিতর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন—কিন্তু লাবণ্যের পক্ষে এই দানের দূত হয়ে আসা এবং বিদায় নেওয়া কি সহজ? তবু এত বড়ো মাধুর্যশক্তি লাবণ্যেরই সাধ্য, তার হৃদয়-জ্বলা আগুন দিয়ে সে বাঁধন-ছাড়া আর্টিস্টকে বন্ধনমোচনের আনন্দ দিল, হয়তো সংসারের দায়িত্ব নেবার শক্তিও দিল প্রেমাস্পদকে। শুধু তাই নয়, যে-নির্দোষ পুরুষটির প্রতি অবিচার করেছিলো সেই শোভনলালের ঘরে গৃহলক্ষ্মী হয়ে পুণ্যপ্রদীপ জ্বালাবার ব্রত সে নিল—যথার্থই সেবার এবং স্নেহের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য।

লাবণ্যকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত খুব বড়ো করে দেখিয়েছেন, তার বাহিরের আচরণ বুঝতে ভুল হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় সেই আচরণের মূলে স্বভাবের পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে। আমার কেবল আশ্চর্য লাগে যে অমিত এবং লাবণ্য দুজনেই রবীন্দ্রনাথের মতো কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন, তাদের রচিত কবিতা এতই উৎকৃষ্ট যে বই থেকে বার করে নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যবহারই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এ-কথা Shakespeare সম্বন্ধেও খাটে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা রচনায় নয়, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও তাঁর চরিত্রদের যে-প্রকাশশক্তি দেন তা একভাবে স্বাভাবিক না হলেও, বিশেষ-এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ শিল্পে তার সার্থকতা পাওয়া যায়।

অমিয় চক্রবর্তী

২

আমি কিছুতেই এ-কথা মনে না-ক'রে পারি না যে শেষের কবিতা কাব্য হিশেবে অপূর্ব, কিন্তু গল্প হিশেবে দুর্বল। বইখানার শোচনীয় পরিসমাপ্তিই তার কারণ। শোচনীয় কথাটা ভেবে-চিন্তেই বসালাম: অমিত-লাবণ্যর আশ্চর্য সুন্দর উজ্জ্বল প্রেম যখন আকাশের অভিসারে আপন আলোক-পুঞ্জকে বিকীর্ণ করেছিলো, তখন কি আমরা স্বপ্নেও মনে করতে পেরেছিলাম যে এই জ্যোতির্লেখা আসলে বাললোভন হাউইবাজি মাত্র? আর শেষ পর্যন্ত তা-ই যখন দেখা গেলো, যখন প্রেমের স্বপ্নরচনা থেকে জীবনরচনা হ'লো না, অনুরাগের সমস্ত আলো, সমস্ত উত্তাপ মধ্যপথে রঙিন কথার কুয়াশা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো, সেই ব্যর্থতার চেয়ে শোচনীয় আর কী। শেষের কবিতার শেষের কবিতাটি অপরূপ, কিন্তু গল্পটি শেষের কাছাকাছি এসে একেবারে এলিয়ে পড়লো, ঐ কবিতাও বাঁচাতে পারলো না তাকে।

আমি অবশ্য এ-কথা বলি না যে যেহেতু দু'জন মানুষ পরস্পরকে ভালোবেসেছে সেজন্য বিয়ে তাদের হ'তেই হবে, নয়তো গল্প শেষ হবে না। অমিতর সঙ্গে কেটির এবং লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের বিয়ে দিয়ে এই গল্পেরই সুন্দর পরিসমাপ্তি হ'তে পারে—হ'তে পারতো—তাও আমি স্বীকার করি। এ-কথাও সত্য যে এই সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথের মনে আকস্মিকভাবে অসতর্ক মুহূর্তে আসেনি—প্রথম থেকেই যে এটি তাঁর লক্ষ্য ছিলো গল্পের ভিতরেই তার আভাস আছে। কিন্তু এই গল্পের সুসম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ করতে হ'লে যতখানি বিস্তার, যতখানি বাস্তবিকতা, যতখানি ঘটনাবিন্যাস প্রয়োজন, শেষের কবিতায় তার কিছুই নেই। দু'জন দু'জনকে ভালোবাসলো, কিন্তু বিয়ে করলো অন্য দু'জনকে—এমন দু'জন, যাদের সঙ্গে পূর্বযুগে তাদের পরিচয় ছিলো, এমন একরকমের পরিচয়, যাকে প্রণয় বললে ভুল হয় না—এই গল্প দাবি করে রক্তেমাংসে পরিপূর্ণ বাস্তবিক রূপ। কিন্তু শেষের

কবিতা আগাগোড়াই কাব্য, যোগমায়া থেকে যতিশঙ্কর পর্যন্ত সকলেই মোটামুটি অমিতর মতো কথা বলে; কাব্যে, কাব্যের আলোচনায়, বাক্যের ইন্দ্রজালে সমস্ত বইটি আচ্ছন্ন, সেই পুষ্পভারে গল্পের বল্লরীটি চাপা পড়ছে প্রায়, এখানে-ওখানে একটুখানি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। তাতে আপত্তির কিছু নেই; শেষের কবিতা গল্প না কাব্য না কাব্য-কাহিনী তা নিয়ে তর্ক করবো না—না-হয় এ-কথাই বলবো যে এ-বইয়ে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন নতুন একটি রূপকল্প—নতুন একটি form—পুরোনো নামের লেবেলে যাকে ঠিক চেনা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে রূপের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংগতিরক্ষা হয়নি, বইয়ের আরম্ভ আর বইয়ের শেষ দুটো যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীও সে-কথা স্বীকার করেন, তবে তিনি বলতে চান যে ও-রকম না-হ'য়ে উপায় ছিলো না, চরিত্রগুলির মধ্যেই ছিলো এই সমাপ্তির অনিবার্যতা। তা হয়তো ছিলো, কিন্তু এই কাব্যোন্মাদ কাহিনীতে তা যথাযথরূপে উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারেনি, পাঠককে বিশ্বাস করাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ যে এ-রকম হ'তেই হবে। কেন পারেননি সে-কথা পূর্বেই বলেছি। যদি গল্পটি বাস্তবের আর-একটু সমীপবর্তী হ'তো, যদি শোভনলাল আর কেতকী রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকতো প্রথম থেকেই, আর এই চারজনের দ্বন্দ্ব সংঘাত দুঃখ আনন্দ ফুটিয়ে তোলা হ'তো বক্তৃতায় নয়, কবিতায় নয়, ঘটনার এবং আলাপের বিন্যাসে, তাহ'লে এই পরিশেষের অনিবার্যতা স্বতঃসিদ্ধ হ'তো। কিন্তু ও-রকম ক'রে লেখা হ'লে শেষের কবিতার এই রূপটি আর থাকতো না, তাকে হ'তে হ'তো রীতিমতো একটি উপন্যাস। আসলে হয়েছে কী, শেষের কবিতা এতই রূপবান যে তার সঙ্গে কাহিনীর কোনোরকম জটিলতাকে যেন মেলানো যায় না; কাব্যের আলো এখানে এমনভাবে পড়েছে যে বইটি বাস্তব থেকে একটু যেন দূরে স'রে আছে—যেমন গীতময় উচ্ছ্বাসে আরম্ভ হয়েছে তেমনি অখণ্ডভাবে চ'লে এসে একটি চরম সংগীতধ্বনিতে শেষ হ'লেই আমাদের মনের পূর্ণতম পরিতৃপ্তি

হ'তো। অমিত-লাবণ্যর বিয়ে হ'লেও চলতো, বিয়ে না-হ'লেও চলতো—কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাদের মিলন, আর তা-ই নিয়ে তত্ত্বের অবতারণা, তা যেন কিছুতেই সহ্য করা যায় না। দু'জন ভালোবাসলো, তারপর তাদের মিলন হ'লো কিংবা হ'লো না—এইরকম একটি সরল কাহিনী অবলম্বন করলে শেষের কবিতা কচ ও দেবযানীর মতো একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যের গৌরব পেতো—হ'লোই বা অংশত গদ্যে। এ-ধরনের রচনায় সত্যকে পেতে হ'লে বাস্তবের পথ দিয়ে যেতে হয় না—বাস্তবটা এখানে অবান্তর, তাই বাস্তবটাই অবাস্তব। শেষের কবিতার শেষের অংশে এই বাস্তব আকস্মিকরূপে আবির্ভূত হ'য়ে সর্বনাশ করেছে—নষ্ট হয়েছে কাব্যের পূর্ণতা, গল্প হিশেবেও বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

অমিয়বাবু এই কথার উপরেই জোর দিয়েছেন যে অমিত রায় আর্টিস্ট—বোহিমিয়ান আর্টিস্ট—আর লাবণ্যও বোহিমিয়ান না-হ'লেও মন তার আর্টিস্টের, আর দাম্পত্যক্ষেত্রে দু'জন আর্টিস্টের মিলন বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়। এ-প্রসঙ্গে অনেক কথাই এসে পড়ে, আপাতত সবচেয়ে আশ্চর্য এই কথাটা না-ব'লে পারছি না যে অমিত রায়কে একবারও আমার শিল্পী ব'লে মনে হয়নি, বোহিমিয়ান তো নয়ই। অমিতর মুখে যে-কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন তা যদি সত্যিই তার লেখা হ'তো তাহ'লে অন্য মানুষই হ'তো সে। কবিচরিত্রের উদ্দামতা কি আত্মবিস্মৃতি কোনোটাই তার নেই। আর বোহিমিয়ান? বোহিমিয়ান ভাবটা তো দারিদ্র্যের শিল্প-রূপ, আর অমিত রায় যে অক্সফোর্ডের পালিশ করা ব্যারিস্টর, সে-কথা সে-নিজেও ভুলতে পারেনি, আমরাও পারি না। অমিতকে আমার লাগে কলকাতার উচ্চ-সমাজের শৌখিন পুরুষের প্রতিমূর্তি; কোনো-কিছুতেই গভীরভাবে নিবিষ্ট হ'তে পারে না সে, শব্দতত্ত্বের বই পড়ে জানবার জন্য নয়, জানাবার জন্য, শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রাখে লোককে তাক লাগাবে ব'লে, যা বিশ্বাস করে তা-ই বলে না, যা চমক লাগাবে তা-ই বলে, সামাজিক রীতি-অনুসারে একটু-একটু মধুর ব্যবহার করে সব মেয়ের সঙ্গেই। তার চরিত্রে গাম্ভীর্য

নেই, তন্ময়তা নেই, যতই সে কবিতা বলুক আর কবিত্বময় উপমা আনুক, কবির স্বভাব তার নয়। অথচ একেবারে অগভীরও তাকে বলা যায় না, দলের লোক থেকে সে স্বতন্ত্র ; এলামেল-করা মুখের মেয়ে আর ঘোড়দৌড়ের পরিভাষায় কৃতবিদ্য পুরুষ সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না তাকে, তার মন অন্য-কিছু চায়। আর সেই অন্য-কিছু যখন লাবণ্যয় মূর্তি নিয়ে তার সামনে এলো, সে তো ভুল করলো না, ঠিক চিনে নিলো। যোগমায়া অবশ্য প্রথমেই বলেছিলেন—'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনও তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হ'য়ে না দাঁড়ায়।' তারপর কেটিকেও দেখলাম, শোভনলালকেও বুঝলাম—কিন্তু মন থেকে কিছুতেই এ-প্রশ্ন যায় না যে এই যদি হবে, তাহ'লে কেন এতক্ষণ ধ'রে এত কবিত্ব, এত আনন্দ, সমস্ত রচনাটাই কেন বা। যদি কেটিকে বিয়ে করা হ'তো অমিতর দুঃখবরণ, তার চপলতার প্রায়শ্চিত্ত, তাহ'লে না-হয় বুঝতাম, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদে যতিশঙ্করের কাছে যে-সব তত্ত্বকথা সে বলছে—কেতকী রইলো ঘড়ায় তোলা জল আর লাবণ্য রইলো সাঁতার দেবার দিঘি—এ-সব নিতান্তই কাঁচা মনের কথা। কুড়ি বছরের ছেলে যতিশঙ্করও জিগেস করেছে, 'কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?' এর উত্তরে অমিত যা-কিছু বলছে তার যদি কোনো অর্থ হয় তা তো এই যে ভালোবাসা দৈহিক সান্নিধ্যের উত্তাপে জুঁইফুলের মতোই শুকিয়ে যায়।' এ-রকম কথা ষোলো-সতেরো বছরের প্রত্যেক ছেলেই ভাবে ; কিন্তু এ কি আশা করা যায় বিদগ্ধ বয়স্ক অমিত রায়ের কাছে? অমিত নিজেই নিজের কথা বিশ্বাস করে কিনা কে জানে—হয়তো সমস্তটাই তার আত্ম-প্রবঞ্চনা—লাবণ্যকে ত্যাগ করবার পর তার কথাকেও সে-রকম জোর আর নেই, সে-রকম জৌলুশ নেই। শেষ পরিচ্ছেদে তার সমস্ত কথাই কেমন এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, খানিকটা পরস্পর-বিরোধী। শেষ পর্যন্ত কী-রকম একটা সন্দেহ জাগে যে সে কখনো ভালোইবাসেনি—না লাবণ্যকে, না কেতকীকে, না

অন্য-কোনো মেয়েকে। এই সন্দেহ শেষের কবিতার পক্ষে মারাত্মক।

একটা কথা উঠতে পারে এই যে রবীন্দ্রনাথ অমিত-লাবণ্যর প্রেমকে মুক্তি দিয়েছেন বিরহের অসীমে, মিলনের সীমানার মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখেননি। এ-কথা যথার্থ ব'লে গ্রহণ করতে পারতাম যদি বইটি সমাপ্ত হ'তো নির্মম বিচ্ছেদ, কারো সঙ্গেই কারো মিলন না হ'তো। কিন্তু এ-কথাও কি বিশ্বাস করতে হবে যে নৈনিতালের সরোবরে কেটিকে নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে জলের ছলছলানির শব্দে অমিত শুনছিলো বিরহের সুর, আর লাবণ্য তার শোভনলালের মধ্যে যে-নীড় রচনা করেছিলো তা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিলো বিরহের হাওয়ায়? এ ছাড়াও অবশ্য কথা আছে। বিরহ কি শুধু বিরহেই, মিলনেও কি নয়, মিলনেই কি নয়? মিলনের মধ্যে যে-বিরহ পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ততম কাছে পেয়েও যে-পাওয়া শেষ হয় না, ভালোবাসার নিগূঢ়তম সত্য নিহিত আছে তারই মধ্যে। শুধু দৈহিক বিচ্ছেদই তো বিরহ নয়—কণ্ঠাশ্লেষে আবদ্ধ থেকেও বিরহের জোয়ার এসে দু'জনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এই কথাই মেঘদূতের কথা, এই কথাই বৈষ্ণব কবিতার। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কথাও এই, কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষের কবিতার নয়।

বুদ্ধদেব বসু

দুই তীর

অমিয় চক্রবর্তী

অনাত্মীয় সিঁড়ি ওঠা।
দুপাশের দেয়ালে কোটিবার আমি নেই।
হাটে দোকানে ঘরে দোরে সভায়
সহরে গাঁয়ে পাড়ায় যারা আছে
কারো কাছে ছিলেম না, নেই, থাকব না।
যারা আপন
তাদের কাছে ক-ঝলকের প্রাণন?
তবু সংসারের এই আমি
—ঐটুকুতেই নিঃসীমা।
পৃথিবীতে আমার সর্বত্র, বারে বারে, বহু অনস্তিত্ব।

ব'য়ে যাব
ব'য়ে যাক জলের ধারা
যেমন বইছে, বয়েছিল,
আমার উপর দিয়ে, ভিতর দিয়ে, নীচ দিয়ে, পাশ দিয়ে
ডুবিয়ে, তলিয়ে, ছলছলিয়ে ঢেউ।

২

তারপর জলের ওধারে পৌঁছই
পৃথিবীমানুষভূমিকাহীন।
আরো আমিবিহীন।
—কেবল একটি মর্ত্য সংস্কারের বিন্দু।

সেই বিন্দুতে আছ তুমি আমাকে নাম ধ'রে ডাকলে কবে,
মার ঘরে বসে খেলেছি কোন ছেলেবেলায়,
বাগানের রোদ্দুরে দৌড়িয়ে আপন বাগান আপন হোলো,
পৃথিবীকে জানবার চেয়ে তাকে আশ্চর্য হয়ে দেখা,
মানুষকে পাওয়ার চেয়েও মানুষকে জানা,
কত প্রাণের ছিল কাজ
—সব মিলে বিন্দু।

বয়ে যাক
বয়ে যাক জলের ধারা
যেমন বইছে, বইবে, বয়েছিল
আমার উপর দিয়ে ভিতর দিয়ে নীচ দিয়ে
যা হচ্ছে হওয়াচ্ছে ছলছল তরঙ্গ
কোনো তীর না রেখেই, সমুদ্র তোমার॥

মর্ত্যের লক্ষ অনস্তির মধ্যে সত্তার সেতু,
শুভ্র বিলুপ্তির পারে রেখা।
যদি স্মৃতি-শেষে হয় স্মৃতিহীন সংস্কার,
তাতেই রইবে সংসার।
যদি সেই বিন্দু মিলোয়
অযুত কোটি বিন্দুর সমুদ্রে সমগ্রসত্ত অভাব্য
তাই হোক।

মনগহনী

হেমচন্দ্র বাগচী

বনে আর ইটমাঠকোঠার মধ্যে
থাকতেন মধুপিসিমা।
আর তেঁতুল ফুলে ভরা
নিমনিষিন্দের বনে
পোড়ো ভিটে
তিত্‌কি নালিমের ক্ষেতে
থাকতেন আর একজন।

পথে যেতে যেতে
যেন বাঁশি শুনি
কোন সে দিনের বাঁশি।
আর কুমড়ো বনে
বাগ বাগিচার ধারে
কাঁকুড় ক্ষেতে
আর এমনি যেতে যেতে পেতে পেতে
চলেছি।···
চলা আর গান গাওয়া···
এখন নালিমের ক্ষেতের রাঙাকর্ত্তামার কথা।
ভিজে ঠাণ্ডা তামাকপোড়ার গন্ধে ভরা
মাঠকোঠা ঘরে থাকতেন রাঙাকর্ত্তামা।
তাঁর ওখানে পড়তাম চণ্ডীদাসের পদাবলী,
জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

বকুলবনের পথে
সেদিনের বাঁশি বাজে।
রাঙাকর্ত্তামার ঘরে
কী যেন গন্ধ ভরে,
কী যেন আলো আসে
সিক্ত দিনের মনকুসুমের
সুরভিত নিঃশ্বাসে।
বকুলবনের মধ্য দিয়ে
রাধা যাবেন গোপন অভিসারে
কুশ নদীর ধারে।
নন্দ বললেন শ্রীরাধাকে
'গহনী মনগহনী থেকে
শ্রীকৃষ্ণকে আনো
তাঁকে জানো।
বনে-বনে ঘুরে-ঘুরে দূরে-দূরে
যেন হারিয়ে ফেলো না আপনাকে।'

শুধু সুর বর্ণ শুধু নাহি আলিম্পন।
আলোকতরঙ্গে যেন কিসের কম্পন॥
বিষাদিনী বনবধূ কী যে করে খেলা।
অনন্ত রহস্য শুধু একেলা বিকেলা॥

মুড়াগাছা স্টেশনের পাশে উত্তরে যেতে বামদিকে
একটা বাড়ি দেখেছিলাম ছোটতে
তাতে কত লোকজন আর ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে,

সামনেটা ফুলের বাগান
বাতাবি নেবুফুলের গাছ,
কামিনীফুলের গাছ
আর মেহেদির ঝোপ।
আর একটি ছোট সাদা গেট
সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংবা সকালে ট্রেনে যেতে-যেতে
বাড়িটি বেশ লাগত দেখতে।
অনেক দিন পর আবার সেই পথ দিয়ে যাই,
দেখি বাড়িটি নেই, ভেঙে চুরে গেছে।
লোকজন নেই, গেট ভাঙা ।
গরু-ছাগল ঢুকে বাগান নষ্ট ক'রে দিয়েছে,
রেলিং পড়েছে ভেঙে।
ট্রেনে যেতে-যেতে মনে হয়, কোথায় গেল তারা
যারা এখানে ছিল ?

উদাস প্রান্তর ধূ-ধূ—
ঘন অন্ধকারে
ট্রেনে যেতে-যেতে বাঁ দিকে তাকালে
আর-একটা রক্তাভ ভাঙা ধাড়ি
তার উপরটা যেন গম্বুজাকার।
নির্জ্জন অন্ধকারে কিসের যেন ভয়।
হয়ত প্রেতলোকবাসিনীরা তার মধ্যে ঘুরছে
মাঝে-মাঝে তাদের দীর্ঘশ্বাস বন-বনানীকে কাঁপিয়ে তুলছে যেন।
মনে হয় এক নিঃসীম মহাসুদূরতা গঙ্গা-জলাঙ্গীর
বালুতটকিনারে গিয়ে মিশেছে।

আলোকিত দালানে রক্তকমল ধূপগুগ্‌গুল,
কুশাসনে পুরুত পুজোয় বসেছেন,
মন্ত্রোচ্চারণে মহাকালীর আরতি হচ্ছে।
…বলির জন্যে কাঁপছে ছাগশিশু !
উৎসর্গ হ'য়ে যাওয়ার পর
শাণিত খড়্গ দেখানো হচ্ছে তাকে…
তারপর শোনা গেল ছাগশিশু মুক্তি পেয়েছে।

নদী গিয়েছে বেঁকে উত্তরে উজানী,
দিগন্তের গুঞ্জিত অন্তভাষায়
অস্ফুট দূর জন্মপূর্ব্বস্মরণের মত।

মৃত্তিকার স্তর ভেদি' হে মহাস্থবির,
দেখা দিলে জীবজীর্ণ মনঃপ্রান্তভাগে
বনপ্রান্তে অবসান-কীর্ত্তি জীবনের—
নিরুদ্দেশ বনানীর গুঞ্জভাষাসম
কী যেন কহিতে চায়, কী যেন হারায় !

…কাল
কত জীবন !

প্রার্থনা

নরেশ গুহ

গান দাও।
হে আকাশ, হে ধরণী ;
হে বেদনাতুর
শীতের বনের বায়ু,
—পথহারা একতারা সুর ;
রাত্রির শেষের তারা;
ক্ষীণ আয়ু,
হে অশ্রুবরণী ;
বসন্তব্যাকুল শাখা
সর্বপত্রহারা ;
গান দাও। গান দাও।

সে-গান ভুলেছি কোনদিন।
রিক্ত প্রান্তরের এই কাঁটাঘাস, বিসর্পিল বন
ভুলালো কখন
সবুজ ভোরের আর সন্ধ্যার কাকলি।
কত সুর, ছন্দ, ছবি, বেদনার বাণী সে সকলি
হোল লীন
কবে একদিন।

নিশালোকে পরিচ্ছন্ন তবু আজো প্রশান্ত আকাশ।
তবে কেন প্রতি পদে বেদনায় পোড়া কালো ঘাস
শীত শেষ যদিও বনের ?

কে গো তুমি আমার মনের
শীতরিক্ত উপবনে আনিবে প্রথম
ফাল্‌গুনের হাওয়ার গরম।

বসন্তের প্রথম কুঁড়ির
লজ্জিত চাহনিটুকু ; আমার শরীর
আবার স্বাদের সুরা
পাত্রে তার করে নেবে পুরা।

আমারে ডুবাও জলে, হাওয়ায় শুকাও।
তবু গান দাও।
ঝঞ্ঝা হানো, হানো বজ্র, দাও দাবদাহ।
মৌসুম প্রবাহ
আমাকে ভাসাক।
আমার মনের যতো কল্প-কল্প রাত
ছিন্ন হ'য়ে যাক।

আমার সকলি ভাঙো, আমারে কাঁদাও
তারপর বুকে তুলে নাও।
গান দাও।
গান দাও।

অসিতপর্ণা

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ের মাপে
তাল ফেলে-ফেলে চলা
জানি না কখন মোর হবে
সমাপন।

কৈশোর দিনের ছন্দ টেনেছি যৌবনে,
যৌবন জপের তালে রুদ্রাক্ষের মতো
কালের কর্কশ হাতে ঘুরে
ঘুরে চলে।
অন্তরাল হতে অন্তরালে
নিমীল নয়নতারা
কার মুগ্ধ চোখের ছায়ায়
কেঁপে কেঁপে লুকোচুরি খেলে।
সমুদ্রের ঢেউ
আর
পাহাড়ের কঠোর কাঠামো
সেও যেন কাঁপে তালে-তালে
কালের কর্কশ হাতে
সৃষ্টির জোয়ালে।

সিত সম মৃত্তিকার স্তূপে
চুপে-চুপে
রূপায়িত হয় যদি
অপেক্ষিত সীতার ইশারা

সুপ্ত অভিস্যন্দে সেও অতল
অধরা।

তবু তো নিভৃত গুহা
সুপ্ত অন্তরাল
মূর্ত হবে বয়স্ক ব্যাধিতে।
শোণিত চপল মায়া
নীলার্ত আভায় রবে অচঞ্চল কায়া;
বেহিসাবী জীবনের হবে অবসান
নিয়মিত কালের হিসাবে।
তারি মাপে মাপে
অপেক্ষিত পথ
শুধু চলা।

উপাখ্যান

অরুণাচল বসু

আমাকে ডেকেছে এক পাখি,
শরতের শেষ রাত্রে ডেকেছে একাকী
সে-পাখির শুনি কণ্ঠস্বর,
হৃদয়সমুদ্রে ওঠে থরথর বেদনার ঝড়।
শালের বনের ফাঁকে দ্বিতীয়ার চাঁদের আলোকে
সে-পাখি একান্তে বুঝি
নিঃশেষিত করে যায় অতীতের স্মরণের পুঁজি।
প্রত্যহের সূর্যতেজে নীরবে বিশুষ্ক হয় অমরার সুধা
সে-পাখি মিটায় তাই আজ রাত্রে শেষ স্বপ্ন-ক্ষুধা।

নিঃশব্দে শিশির ঝরে,
হেমন্তের ধান যবে তোমাদের ঘরে
বসন্তের গান গাওয়া হবে সেই ফসলের সুরে,
তখন আমার পাখী উড়ে যাবে দূরে—বহুদূরে।
প্রান্তরের অন্তহীন রুক্ষ মাঠে-মাঠে
রাত্রি-শেষে ভেঙে যাওয়া গ্রামান্তের হাটে
ফেলে-ফেলে রুগ্ন ছায়া হেলে-যাওয়া চাঁদের মতন
আমার প্রপঞ্চ-পাখি পার হবে আলেকের বন।
অন্ধকারে পক্ষ তার ঝ'রে যাবে দিনের সম্মুখে
স্বপ্ন তার ক্ষয়ে যাবে, রয়ে যাবে বুকে।

তাই আজ শেষ রাত্রে পাখি ডাকে নক্ষত্রের নীড়ে
অপূর্ণ কামনাগুলি ভিড় করে পূর্ণতার কল্পনার তীরে।
আজ রাত্রে পাখি ডাকে, পাখি গায় শেষ স্বপ্ন-গান;
আমার স্মৃতির তটে জলের অক্ষরে লেখে
বিলুপ্তির কোনো উপাখ্যান।

ব্যর্থতা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হ'তে সাধ জাগে, মনে হয় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ,
চাষার ছেলের হাতে এসে যেতো হঠাৎ আজ।
তাহ'লে না হয় আকাশবিহার হ'তো সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে-যেতে ছুঁয়ে যেতো কপোল;
জনারণ্যে কি রাজকন্যার নেইকো ঠাঁই?
কাস্তেখানাকে বাগিয়ে আজকে ভাবছি তাই।

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালোবাসতে আছে?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত-কিরণ।
হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে আমায় নিয়েছো ডেকে
হেমন্তে পাকা ফসল সামনে, তবু দিলে ডাক;
তোমাকে মুক্ত করবো, আজকে ধান কাটা থাক।

রাজপুত্রের মতন যদিও নেই কৃপাণ,
তবু মনে আশা, তাই কাস্তেতে দিচ্ছি শান,
হে রাজকুমারী, আমাদের ঘরে আসতে তোমার
মন চাইবে তো? হবে কষ্টের সমুদ্র পার?

দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালঙ্ক-খাট,
আমাদের শুধু পর্ণ-কুটির, ফাঁকা ক্ষেত-মাঠ;
সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ,
রাজার ঝিয়ারী! এখানে নিদ্রাহীন বারো মাস।

এখানে দিন ও রাত্রি পরিশ্রমেই কাটে
সূর্য এখানে দ্রুত ওঠে, নামে দেরিতে পাটে।
হে রাজকন্যা, চলো যাই, আজ এলাম পাশে,
পক্ষীরাজের অভাবে পা দেবো কোমল ঘাসে।
হে রাজকন্যা সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান?
হে রাজকন্যা, ঘুম ভাঙলো না? সোনার কাঠি
কোথা থেকে পাবো, আমরা নিঃস্ব, ক্ষেতেই খাটি।
সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের সোনা,
তাতে কি হবে না? তবে তো বৃথাই অনুশোচনা॥

আশা

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার ও দেহ আমার এ দেহ যেন দু দ্বীপ
সংসারতাপ নীল অম্বুধি সুদুস্তর।
ও দ্বীপে যখন মৌসুমী নামে কুঞ্জে নীপ
এ দ্বীপে তখন সূর্যকিরণ সুপ্রখর।
এ দ্বীপে যখন নব ফাগুনের লাগে পরশ।
ও দ্বীপে তখন শীতের তুষার জড়তাভার,
দু' দ্বীপে দু' পাখী মিলনপিয়াসী কাটে বরষ
একই সময়ের সুযোগ দোঁহার মিলে না আর।
তবু আশা জাগে নব রূপে পুন হারানো দিন
একদিন এসে মিলন ঘটাতে হবে হাজির,
দু দ্বীপের বনে ফুল ফোটা শুরু এককালীন
একটি লগনে অবসর হবে দুই পাখীর।
নবীন উষায় দুটি পাখী ছিল এক সামিল
মাঝে ব্যবধান, দীর্ঘ সে হোক, স্থায়ী ত নয়,
উড়ে যাবে যবে সংসারভার নিঠুর চিল
একটি ছায়ায় মিলবে দু পাখী সুনিশ্চয়।

কোনো সৈনিককে

সলিল আচার্য

শোনো হে সৈনিক
বস্তুময় পৃথিবীকে নেয় ছিঁড়ে নিক
　বণিকের সাঙাত সঙীন,
নিভে যাক পৃথিবীর শেষ আলো শিখা,
　কালো যবনিকা
নামুক ধরণী 'পরে বিষবাষ্পময়—
　তবুও রহিবে কবি একান্ত নির্ভয়;
শ্মশানের ভস্মে শুয়ে নবীনের বরণসংগীতে
　ধূমল আকাশে তবু করিবে রঙীন।

প্রশ্ন

সুধাংশু রায়

কোন দূর মায়ালোক হ'তে
স্বর্গভ্রষ্ট সুরশিশুগুলি
ছুটে আসে ধরণীর বুকে
মৃত্তিকার প্রেমে আত্মহারা।
ওরা হাসে, ওরা গান গায়,
ছোট ছোট দুঃখ নিয়ে কাঁদে ;
তারপর সে প্রেমের ঋণ
মৃত্যু দিয়ে শুধি একদিন,
অপূর্ণ পিপাসা নিয়ে
মৃত্তিকার কবরে ঘুমায়,
কী আশায়, ওরা কি তা জানে ?

প্রেম-পাথর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জমানো পাথর স্মৃতি তোমার
এ-ভাঙা বক্ষে শয্যাগত ;
দিনে দিনে বাড়ে বুকের ভার—
অসহনীয় সে অসাড় ক্ষত।

মনে হয় যদি আসে কেহ
দেখবে সে চোখে অবশ রাত—
বিছানায় শোওয়া আকাশ যেন ;
অথবা জীবন, মরণাহত।

অসহায় মোর ললাটে লেখা।
স্মৃতির পশরা কত যে ভার ;—
তুমি বদলিয়ে হয়েছো স্মৃতি।...
প্রেম আমার, অন্ধকার।

ভুল

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আকাশের তলায় পৃথিবীখানি
মনে হয় যদি একটি পাখীর মত
সবুজ নরম পালক ফুলিয়ে তুলে
নিঝুম দুপুর-রৌদ্রে নিদ্রারত ;

আজ সাগরের তটের উপরে বসে
মনে হয় যদি ও-বিপুল নীল জল
আমারি ক্ষেতের নীরস উষর বুকে
আনে শ্রাবণের প্লাবনে পাহাড়ী ঢল ;

আজ শরতের সোনার আলোয় ভুলে
মনে হয় যদি জীবনে রঙের মেলা,
অনেক প্রাচীন পাতানো গৃহস্থালী
নির্মম হাতে বৃথাই ছিঁড়িয়া ফেলা ;

এ ভুল আমার ক্ষণিক আলোর ভুল
বন্ধু, তোমরা ভাঙিয়া দিও না কেউ।
অনেক স্বপন ভেঙেছে যেমন ক'রে
একেও তেমনি ভাঙুক কালের ঢেউ।

পৃথিবীকে

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

দিন শেষ হয়ে গেল,
শ্রান্ত সন্ধ্যা মাঠের উপর।
দূরে বিলে কালো জল,
দূরান্তের বিবর্ণ আকাশ
হাঁসের, বকের রংএ
কেমন অদ্ভুত!
আঁধারের হিমস্পর্শে সঙ্কুচিত গ্রাম,
যেন জনহীন।
কোথাও আজান নাই
মন্দিরের শঙ্খ বাজে নাই
বসেনি পাড়ার পাশে
মুখর আসর
মাঘের প্রাচুর্য্য ভরা নাচে আর গানে।
খুরি ভরা পচাইয়ের নরম নেশায়
মাতেনি তরল রক্ত
কঠিন বুকের;
মাদল মলের শব্দে দোলেনি শরীর।
সঙ্কুচিত সারাগ্রাম নিঃস্পন্দ নিথর।

২

কেন এই স্তব্ধ গ্রাম
ইতস্তত অন্ধকার মাঠে,
উৎসববিহীন পল্লী সন্ধ্যার ছায়ায়
হে পৃথিবী, প্রশ্ন করি।
হে বিপুল, বিরাট, পৃথিবী—
তোমার ভাণ্ডার দেখি দিকে দিকে ছুঁয়েছে আকাশ;
খচিত অঞ্চল তব সমুদ্রের জলের উপর
ছড়ায় পণ্যের দ্যুতি
রিনিঝিনি সোনার নূপুর
বেজে যায় নগরের উৎসব সভায়,
বিদ্যুতের আলো পড়ে,
ক্ষণে-ক্ষণে কমলার দীপ্তি ঝলকায়।

৩

তবু কেন হে পৃথিবী,
হে বিপুল বিরাট পৃথিবী,
নিষ্ঠুর কৃপণ,
গ্রামে গ্রামে অন্ধকারে
বাড়াইছ লজ্জাহীন হাত;
চাপিছ অসংখ্য কণ্ঠ লোলুপ মুঠায়
তিলে তিলে গ্রামীনের শুষিছ রুধির,
হে পৃথিবী, হে পৃথিবী।

৪

প্রশ্ন মোর তোমার ও-উদার আকাশে
অঙ্কিত জিজ্ঞাসাচিহ্ন
সপ্তর্ষির জ্বলন্ত তারায় ;
সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্যে চায় কুণ্ঠাহীন তোমার উত্তর।
কেন সে লুণ্ঠিত গ্রাম, ঝলমল সোনার নগর,
এক হাতে দান তব
অন্য হাতে নির্মম পীড়ন
হে পৃথিবী, বলো, বলো,
কথা বলো, হে বিরাট, নিষ্ঠুর, ভীষণ।
অন্যথায় অকলঙ্ক তোমার আকাশে
রহিল আমার প্রশ্ন অম্লান লেখনে ;
যখনি তাকাবে তুমি সাতটি ব্যাকুল তারা
প্রতিরাত সারারাত চাহিবে উত্তর।

চক্রবাক

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কুমারী রাত্রির গর্ভে রন্ধ্রহীন অলজ্জ তিমিরে
হিরণ্ময় সমারোহে অবলুপ্ত হ'লো মহাকাল।
পশ্চিমের চিতাভস্মে জাদুকরী সন্ধ্যার শিশিরে
কতো কারুশিল্পময় দিনান্তের অক্লান্ত কঙ্কাল
জ্বলে জ্বলে নিভে গেলো—রেখে গেলো নিস্তব্ধ আকাশে
বিরহের মতো এক পরিব্যাপ্ত অন্ধ অতলতা।
হে ব্যাকুল চক্রবাক ! কামনার শোণিম উচ্ছ্বাসে
তোমার আগ্রহ দিয়ে সেখানে রাঙাও সোমলতা।

দিগন্তের অক্ষপথে পক্ষের স্পন্দনধ্বনি শুনি।
কুয়াশায় বাষ্পাচ্ছন্ন উপত্যকা, পাহাড়ের বুক :
সময়ের শব নিয়ে জাগে যেন লোলুপ শকুনি !
বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় স্নাত তৃণস্তরে নৈঃশব্দ্য নামুক।
স্বর্গের অমৃত লাগি শূন্যে শুধু উদ্দাম বিধুর
পাখার ক্রন্দনে থাক সচকিত নিঃসঙ্গ সুদূর।

ভীরু

সত্যেন্দ্র সরকার

তোমার নগ্ন বুক
মুক্ত শাণিত উজ্জ্বল তলোয়ার,
চক্ষে তোমার সূর্যের শিখা জ্বলে।
সহিতে পারি না আমি প্রত্যহের বিবর্ণ অভ্যাসে,
নির্জনে ডাকি তাই স্বপ্নের সোনালি আশ্বাসে।

নিরাশাবাদী

মু ভান

অনেকদিন আগে ঝাপসা-আঁধারে বুদ্ধ-মন্দির নিঃসহতায় পূর্ণ ছিল,
চোখ-ঝল্‌সানো ধুনোদানীতে আগুনের ফুলকি অনেক আগেই নিবেছে,
আমাদের কাছে সংসার হচ্ছে খানিকটা শুকনো নীরস পাঁক,
তবু তাতেই গড়েছে রত্নাসনের ওই মূর্তি, আর ওর চোখে
এখনও চমক, ধৈর্য আর কাপুরুষতার আভা,
ও ত্রিকালজ্ঞ, ও জানে ভূত, ভবিষ্যত।

আর এরা সব পাপিষ্ঠ,
ইতিহাসের এরাই পুরুষ আর স্ত্রী ; অসংখ্য ভুলের পাহাড় গ'ড়ে তোলে,
যারা ভূমিষ্ঠ হয়ে উৎসর্গ করে তেজ, বীর্য্য,
শেষে তারাই কাঁদে, বিদায় নিয়ে চ'লে যায়।

রাজনৈতিকেরা মিথ্যে চেঁচিয়ে চলে "আমরা মুক্তি চাই"।
যে মানুষ সকলের জীবন নষ্ট করে চ'লে গেল মেরুদেশে,
সেও দু হাত তুলে শুদ্ধ-মৃত্যু-ভাগ্যাকাশের কাছে জানায়
"আমায় তাপ দাও, কেন তাপ দেবে না ?
আমি ধ্যানে অপেক্ষা করছি তোমার সেই মহাপ্রেম !
সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও : এই সব হট্টগোল, রাগ, আছে ঘেমো রক্ত,
সংসারের ধুলো ! তবু দেখো আমার শরীর কী-রকম শুদ্ধ নির্মল ?

"কিন্তু বরফ-প্রবাহের ঘূর্ণি-স্রোতে জমে যায়,
প্রতি পলে আমার দিকে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে, প্রতিটি ক্ষণ চলে যায়,
মৃত্যু থেকে বাঁচতে সে পারে না, পারে না আমাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ;
ওরা আমাকে সান্ত্বনা দেয় ! আমাকে শুনিয়ে যায়

"আমার নিজের ভয় করে সুখের সময়,
আর আমার আনন্দ হয় ভয়ের সময়,
আমাকে জানতে দাও আমি সত্যি মরেছি না বেঁচে আছি ?
দূর দিগন্তে রোজ সূর্য কেন ঘোরে।"

চীনা থেকে অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম প্রেমের কবিতা

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১

সহসা গভীর অন্ধকারকে মন্থিত করল
অরণ্যের আর্তনাদ
আকাশে বজ্রের গর্জন আর বিদ্যুতের ভ্রূকুটি।
দেবদারুর কাণ্ডে কাণ্ডে
সর্বনাশা আগুন উঠল জ্বলে,
আর্ত ক্রন্দসীর রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতা।
ভয় করে, ভয় করে,
ক্লান্ত চোখে ঘুম নেই,
স্মরণের বিভ্রান্তিতে কার মুখ অবলুপ্ত,
মত্ত মেঘের মতো কার কৃষ্ণ চিকুর,
আচ্ছন্ন অন্তরে
তড়িতের চকিত প্রহার।

তার পরে বৃষ্টি
কান্নার সান্ত্বনার মতো,—
তারো পরে উচ্ছল আকাশ-গঙ্গায়
চন্দ্র তারকার নব অবগাহন,—
ঝড়ের 'পরে শান্তি।

২

তুমি নেই, তুমি নেই।
দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্থানুতে আমি আঁকা,—
কানে আসে
অপার বিচ্ছেদসমুদ্রের নিষ্ঠুর আলোড়ন

পরপারে
স্বপ্নমায়াবিনীর অদ্ভূত স্বর্গরাজ্যের উৎসুক চক্রবাল।

সেখানে নিবিড় চোখের পল্লবমায়ায়
মুক্ত কেশের শান্ত বুকের ছায়ায়
কী অনির্বচনীয় অমৃতের আশা কাঁপে,
কী বিশাল উদার মুক্তির ইসারা থরোথরো।
কিন্তু নিষ্ঠুর সমুদ্রে ইস্পাতের তীক্ষ্ণতা,
কৃতঘ্ন কলরোলে
বিভ্রান্ত বাসনার অট্ট হাহাকার।
তুমি নেই, তুমি নেই।

৩

প্রত্যূষের প্রশান্তি এল ভৈরবীর উদাস আশীর্বাদে।
মূর্ছার পরে মুক্তি নামল বুকে
অদৃশ্য উড়ন্ত পাখীর সোনার পালকের মতো।
প্রাণের অর্ধমুক্ত বাতায়নে
চকিত আনন্দের ঝলক লাগে,
মুক্ত প্রেমের পথ-চাওয়ার গানে জাগে
পূর্ণতার পদ্ম-উন্মীলন।
নব বসন্তের রোমাঞ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়
উদ্‌ঘোষিত বাণী :
তুমি আছ, আমি আছি।

তুমি আছ, আমি আছি।
আর কথা নয়, কান্না নয়,
নয় নিশ্চেতন মূর্ছা বিচ্ছেদের মুমূর্ষু হতাশায়।
শুধু
জ্বলন্ত সূর্যের নির্লজ্জ অনবগুণ্ঠনে
পদ্ম-উন্মীলন।
শুধু আত্ম-সম্প্রদান
রক্তের তরঙ্গ-জোয়ারে।
তুমি আছ, আমি আছি
বাসনার বলিষ্ঠ অঙ্গীকারে।

বহুধা

আরতি রায়

অগম সাধনা, ক্ষুরধার পথ, দুর্বা হয়েছে ছাই ;
আশীর্বাদের পথ বেয়ে নামে নির্মম অভিশাপ।
চার পয়সার বনেদী নেশায়, ধোঁয়া-ধোঁয়া প্রোগ্রাম ;
পত্রিকা দেয় বিশ্বের ছোঁয়া, বেঁচে থাকা যেন জল।
কণ্ঠের সুরে মিষ্টি আমেজ, চেনা-চেনা যেন লাগে ;
মিসেস পালিত, মুক্তার দুল, আলোছায়া ঝিকিমিকি।
সর্দ্দার পোড়ো, চুনমাখা ভুলো, পার্বতী হেসে খুন ;
"আর কত দূর পৌঁছে যাব কি ?" "কে যায় নতুন বৌ ?"
বইয়ে পড়া আর পড়া যায় বইয়ে কাহিনী-এমনতর,
চার পয়সার বনেদী নেশায় ধুয়ে মুছে একাকার।
ধোঁয়া ধোঁয়া যেন হিমেল ঋতুর পাহাড়ে সহর কোনো,
খর বৈশাখী তপ্ত দুপুর বেজে ওঠে মনিব্যাগে।

গ্রীক ভাস্কর রেখায় রেখায় কঠিন শিল্প হানে,
ঔদ্ধত্যের কিনারায় এসে, কাঁপে প্রাণ থরোথরো ;
শান্-দেওয়া কথা, ছুরী খরধার, ইস্পাত ঝলসায়,
খণ্ডিত, তবু অখণ্ড যেন পুরাতন মরীচিকা।

ইডিপাস কোথা চলছে গ্রীসের পথে,
বিন্দু বিন্দু শোণিত চোখের কোণে,
নিঃশেষ ক্ষমা কঠিন শাস্তি এ্যাপোলো স্বর্গে তবু।
পিচ গলে গেছে, কাপড়ের জুতো, কত আর দাম তার,
ঠেলাগাড়ী ঠেলে ও কটা পয়সা মেলা কি এতই ভার ?

"হতভাগা দেশ মূর্খ নেহাৎ, বুদ্ধির চাষ নেই,
এ দেশের দেখো কিচ্ছু হবে না-দো-কাপ আইসক্রীম।"
কেন লিখেছেন এ-সব গল্প, কে চায় এমন লেখা ?
স্টাণ্ট তো জানেন ? গল্পের শেষে তা না হোলে সব মাটি !
কবিতা কী হবে ? মোস্ট হোপলেস, কে আর ও-সব পড়ে ?
কড়া-কড়া কথা, রেফটেফ দিয়ে তবু সে চলনসই।
ইলেকট্রা তবু সমাধির পাশে, তীব্র চাহনি দিয়ে,
দেখে নির্বাক সত্যি কি তাই ? প্রতিশোধ কতদূর ?
জননী তবুও পিতৃহন্ত্রী, শাস্তি বলো কী তার ?
কোরো না শঙ্কা, নির্মম হও, হানো ছুরী খরধার।
দূরদিগন্তে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ছায়া আসে ম্লান হ'য়ে,
প্রতিশোধ তবু—সান্ত্বনা নেই, মায়ের করুণ আঁখি।
যুক্তির পথে শান্তি মেলে কি ? তীব্র বহ্নিশিখা—
অরিস্টিসের তপ্ত কণ্ঠে, ফোটে না দুখের ভাষা।

কঠিন দুঃখ, দাবাগ্নি শিখা ভাঙা কেব্বিনের কোণে ;
অস্তিনেতির শেষ সীমানায়, পৃথিবীর পরিচয় ?
মিছিল চলেছে ছাঁ-পোষা প্রাণের সাহারার খেয়াতরী
করুণায় ঝরে দু ফোঁটা অশ্রু, ডাকবে না কেউ কাছে।
জ্বলে যেতে দাও ক্ষীণ ওয়েসিস, টলে টলে কেন পড়ো
মাথা ঠিক রাখো, সোজা পায়ে চলো, চলো দিনরাত চলো।
রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন গান, "এখনো সময় নয়"।
পূর্বগগনে অরুণোদয়ের এখনো অনেক বাকী।
সূর্য উঠেছে অথবা ওঠেনি কে দেখে মেলিয়া চোখ,
চার পয়সার বনেদী নেশার ধোঁয়ায় অন্ধকার।

নীল চোখ

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়,
অন্ধকারে
ঘরের আকাশে মনে পড়ে
তোমার ঘুমন্ত নীল চোখ
কোমল রোমশ কালো শীতল পাতার
ছায়াঘন নীল অন্ধকার।

শিয়রে জানালা বেয়ে
বিচ্ছুরিত আলো ঘরে এলো,
আলোকরশ্মির বর্শা যেন
কুয়াশার আশ্চর্য সেনানী।
বাহিরে আকাশ কালো,
হিমে-ছোঁয়া এই অন্ধকার,
জানালার অস্পষ্ট কোণের আরো দূরে
উজ্জ্বল বিজলী আলো
যেন শুভ্র কুয়াশার একটি ঝালরে
মূর্ছিত আলোক রেখা।
ঘরের আকাশে মনে পড়ে
তোমার ঘুমন্ত নীল চোখ।

একটি হারানো ছবি

বরুণ দেব

নাছোড় কলম পিষি, এইখানে জীবন নাকাল।
সাম্‌নে লেজার খোলা, মাথার উপরে পাখা ঘোরে ;
একসার ধূলো ওড়ে, নিয়মমাফিক।
কোনোখানে মেঘ তবু জমে ওঠে ঠিক—
আর কোনো মনের কিনারে।
সে মন, সে মেঘ নেই,—এইখানে জীবন নাকাল
কোনো এক পাহাড়ের, আকাশের স্মৃতির আঁচল চেপে ধরে।

সাঁওতালী ছোট গ্রামে রাত নেমে এলো :
সাদা চাঁদ, মহুয়ার ছায়া কাঁপে হঠাৎ হাওয়ায় ;
একটি বিষণ্ণ নদী, আকাশ সেখানে ঝুঁকে থাকে ;
রাত্রির ট্রেন চলে, ছেঁড়াখোঁড়া মনের খেয়াল এলোমেলো।
জ্যোৎস্নায় ধূলোর ঝড় ওড়ে ;
সেইখানে মাঠেরা ঘুমায়।
সে মন, সে মাঠ নেই,—এইখানে জীবন নাকাল—
কোনো দূর পাহারের আকাশের স্মৃতির আঁচল চেপে ধরে।

অবতামসী, আবার রাত্রি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যাগত পৃথিবীর পৃথু পেনাম্ব্রায়
কপিলা সন্ধ্যার দূত উলঙ্গ অবধূত
কালিতে ছোপানো তার নিশান ওড়ায়।
অন্তঃসত্ত্ব হৃদয়ের ভয়ভ্রূণগুলি
কী যেন আতঙ্কে জাগে, করে ঠেলাঠেলি
গ্রসিস্নু হাজার হাত
হাজার ভ্রূকুটী পাত নিঃশব্দে ছড়ায়
সেই মঞ্চে এসে শেষে মৌনতার তীর ঘেঁষে রাত্রি দাঁড়ায়,
রাত্রি নামে, সেই সব পাত্রপাত্রী নিয়ে
দেখি সেই অভিনয় নিঃসঙ্গ দৃষ্টির দীপ দিয়ে—

ঘুমের বোর্‌খা-পরা অনেক অগাধ রাত
মিলায়েছে হাতে হাত
প্রেতমসী-প্রতাকার পাদপীঠতলে...
শব্দহীন শোভাযাত্রা চলে।
সঙ্কেত-শঙ্কিত সেই অবাঙ্ময় রাতের মিছিল
জিহ্মিত পথ বেয়ে চলে ধেয়ে দুর্বার তমোস্রোতে মুহূর্ত পিচ্ছিল

জাগৃতির তীরভূমি অতিক্রমি তন্দ্রার প্রান্তর পারে
আফিম নেশায় ভোর ঘুমে-ঘোর বনানীর ধারে

দেখেছি সে অন্ধ মূক উপছায়া তলে
হাতে হাত রাত সব চলে—
মেঘেলার মত মাথা অদৃশ্য শূন্যলোকে তুলে
পঙ্গু দৃষ্টি যেথা বারবার ব্যর্থ হয়, মরে পথ ভুলে ;
দেহগুলি অন্ধকার, পা যাদের মিশ্‌মিশে কালো—
সেই সব কালো রাত—
চেতনার ক্ষীণ বর্তিকায় যারা খালি দেখায় ধারালো
ঘুমের অজ্ঞাত তীরে কোন্ মহানিষ্ক্রমণের ইসারা
দিয়ে যায় সে সব নিশারা।
সে সব রাতের ছাপ চুপচাপ শুয়ে গেছে এই বিছানায়
কামনা প্রদাহ-ভরা তপ্ত অশ্রু শর্বরীর শবরী শয্যায়
সে সব রাত্রির দাগ, ছাপ, ছায়া, তাদের স্বাক্ষর
প্রস্তিরে পুঞ্জিত হ'ল অন্ধকারে ক'রে দিল জীবন্ত মুখর ;
অনিমীল প্রতীক্ষার অধীর লজ্জায়
বাসকসজ্জার সাজি বাসরের পলিত শয্যায়
ধূলিভারে পাণ্ডু হ'য়ে যায়।

অনেক অনেক ভোরে অভিসার দূরে গেছে সরে
অরোরার রথ এসে শিশির ছিটায়ে গেছে মাঠে গাছে ঘাসে
প্রথম আলের ঘায়ে প্রতি ভোরে মরে যায় যামিনীর সর্বশেষ যাম
বর্ণহীন অন্তরীক্ষে কেঁপে কেঁপে বেজে যায় মেম্‌নন্‌-এর গান
সে এক স্বতন্ত্র আমি ভুলে যেতে যে চেয়েছে নিত্য রাত আসে
বন্য বন্যা বুকে বয়ে বনানীর বীভৎস আবাসে
প্রেমিক রাহুর মত অনাহূত—তবুও অমোঘ রাত আসে !
প্রাণের আলোকলতা প্রিয় রাত্রিবিগমের অরুণিম বাহুর আশ্বাসে
খোঁজে কোথা নিয়ে রূপ, গান-গন্ধ, বর্ণ-ছন্দ ভোর ভেসে আসে !

এই মতো দেখেছি তো রক্ত-ঝরা রজনীর উল্ব-ছেঁড়া ধন
মৃতবৎস স্বপ্নের পর্য্যুষিত পুঁজি অগণন
মৌন যত প্রহরের গৌণ তবু প্রিয় প্রহসন
লালনের বৃতি ভেঙে মন থেকে সেই সব স্মৃতির সঞ্চয়
দিনের দর্পিত দস্যু সে সম্বল নিত্য কেড়ে লয়।
রাত তবু আসে ফের ভ'রে দিতে স্বপ্নের স্মৃতির ভাণ্ডার
পৃথিবীর মরা-পিঠ বেয়ে ছেয়ে দেখি চেয়ে—
আবার এসেছে রাত, রাতের পাহাড়!
ঋতুস্নাতা কুমারীর শুচি বেশ-বাসে
সন্ধ্যা পুন কন্যা হ'য়ে আসে—
অস্থি হ'তে জন্ম নিয়ে সেই চির-পুরাতনী গতার্তবার—
আবার আসে যে রাত, রাতের পাহাড়—
অনেক অগাধ রাত—আবার, আবার!

প্রতিবিম্ব

বুদ্ধদেব বসু

১

কীটসের ডাক এসেছিলো ছাব্বিশে ;
মূর্ত কবিতা শেলি
স্পেৎসিয়া উপসাগরের ঢেউয়ে মিশে
করলো যেদিন কেলি,
সেদিন কি আর বায়রন তাঁর
তিক্ত দীর্ঘশ্বাসে
ভেবেছিলেন যে তাঁকেও অচিরে
নেমে যেতে হবে অনামী তিমিরে
বন্ধুর পাশে, ঘাসে।

শেলি, বায়রন, কীটসের দিকে
তাকায়ে আত্মহারা,
আমিও ভেবেছি দশটি-বারোটি
অমর কবিতা লিখে
যেন যেতে পারি মর্ত্যজীবন
চব্বিশে ক'রে সারা।

কিন্তু তখন, বলা বাহুল্য,
বয়স সতেরো ছিলো,
তাই মনে হ'তো, যদি দেহপুরী
মৃত্যুর হাতে আজো যায় চুরি,
তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী
কমবে না এক তিলও।

মনে হ'তো যেন নিছক বাঁচায়
আছে তার সান্ত্বনা,
যে-উন্মত্ত স্বপ্ন আমার
রক্তের রস, বক্ষের হাড়,
হৃৎপিণ্ডের উদ্দামতায়
হৃদয়ের ব্যঞ্জনা।

২

যেখানে কখনো আসেননি বায়রন
পৌঁচেছি আজ প্রাক্-চল্লিশে এসে,
প্রতিবিম্বের সন্ধানে তাই মন
এগোয় না আর শেলির সোনালি দেশে।
আজ বার-বার মনে পড়ে বার-বার
সেই সত্তর সিঁড়ি
আঁকাবাঁকা খাড়া ধাপে-ধাপে উঠে যার
ইএটস পেলেন দেখা
শিখরচূড়ার স্বেচ্ছানুচারিতার,
মত্ত, মহান, একা।

আর বার-বার মনে আসে বার-বার
সে-আকুল আশি বছরের কারুকলা,
মায়াবী আঙুল যার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে
অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনুকে
করেছে এমন মধুর, ভীষণ
রূপের আলোকে স্নাত,

যে দেখেছে সে-ই ভেবেছে, স্বর্গ
তবে কি নিঃস্ব দেহেরই অর্ঘ্য,
এ কি মুমূর্ষু মানুষ, অথবা
দেবতা সদ্যোজাত।

৩

যদিও দেহের শুকায়ে আসছে মজ্জা,
বিদ্রূপে ধিক্কারে
দিনে-দিনে আরো আমাকেই দেবে লজ্জা,
তবু দিনে-দিনে মনে-মনে আরো ভাবি
দৈব দয়ায় কিছু যদি থাকে দাবি,
তবে যেন আমি বাঁচি
একশো বছর, অন্তত কাছাকাছি,
দিনে-দিনে যাতে আরো হ'তে পারি
সান্ত্বনাহীন স্বপ্ন আমারি,
হৃৎপিণ্ডের হৃদয়পদ্মে
চিরন্তনের শয্যা।

যা হবার তা যে হবেই, আমার
ধৈর্যেরে এই কথা
শিখায়ে-শিখায়ে মেনে নেবে মন
তাপহারা দেহে স্মৃতিমন্থন,
সেবক শোণিতকণার কঠিন
বধির অবাধ্যতা।

বুক-ফাটা বোবা সর্বনাশেরে
হাসি-ঠাট্টার ছলে
ছড়ায়ে উড়ায়ে দেবো অজস্র
বাজে কথা ব'লে-ব'লে।
কেননা যখন আমার অধর আর
অন্য অধরে আনবে না ইচ্ছার
মূর্ছিত সজলতা,
পারবে না আর স্পর্শের উচ্ছ্বাসে
নারীর শরীরে বাঁধতে রুদ্ধশ্বাসে
যখন ক্ষয়িত বাহুর নিষ্ফলতা :
হয়তো তখনি আমি
জাগতে পারবো মুক্ত মহান রঙ্গে
উত্তাল রাত সখা কৃষ্ণের সঙ্গে ;
তারপর ভোরবেলা
দেখবো, অবোধ উর্বশী তার
করুণ চিকণ বক্ষোচূড়ার
চিত্রবিলাসী স্বচ্ছ সলিলে
আনমনে করে খেলা।

বৈশাখী পূর্ণিমা

বুদ্ধদেব বসু

এবার বৈশাখ কেন ব্যর্থ হ'লো, গর্বিত ঋতুর
পূর্ণিমার লগ্নে কেন হেমন্তের কান্নার ম্লানতা
নেমে এলো অশ্রু-আঁকা জ্যোছনা হ'য়ে-তুমি কি জানো তা,
হে আর্দ্র, হে সংগোপন, হে অব্যক্ত-ঘনিষ্ঠ-সুদূর,
হে হৃদয়, আমার হৃদয়! অন্ধকারে আচ্ছন্ন আতুর
তোমার যে-ইচ্ছা আজো মায়া-মৃগ-দিগন্তে আনতা,
পার্থিবের মানচিত্রে যে-প্রতিজ্ঞা আজো অমানিতা,
তারই রুদ্ধ নিশ্বাসে কি গ্রীষ্ম কৃশ, বিষণ্ণ, বিধুর!

কী শীর্ণ, করুণ, ক্লান্ত রাত্রি আজ! কী শূন্য আকাশ!
একটিও তারা নেই ; কুয়াশার নাস্তিক প্রভাবে
অভিন্ন আঁধার আলো, অবিশেষ হতাশা আশ্বাস।
. . . তবু তুমি আছো, চাঁদ! সর্বহারা, গর্বিত স্বভাবে
রূপের সাহস নিয়ে তবু এই রাত্রে দাও দেখা!—
আমারি হৃদয় তুমি! তাই একা, তাই একা…একা!

সমালোচনা

চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চম খণ্ড। বিশ্বভারতী, তিন টাকা।

এ-পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দু' ধরনের চিঠি সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে: (১) পত্রাকারে প্রবন্ধ, ভ্রমণ বা আত্মজীবনী—য়ুরোপবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী, এই সবগুলিই এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত, সাময়িক পত্রে এ-যাবৎ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য যে-কোনো চিঠিও তা-ই; (২) ঘরোয়া চিঠি—এই শ্রেণীতে পড়ে নিকটতম আত্মীয়দের লেখা পত্রাবলী, চিঠিপত্রের প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত। কিন্তু এই পঞ্চম খণ্ডটি এ-দুয়ের কোনো শ্রেণীতেই ঠিক পড়ে না, সেদিক থেকে রবীন্দ্র-পত্রধারায় এর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এ-খণ্ডের একখানা চিঠি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা, একখানা তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে, চারখানা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—এ-ক'খানা শুধু সংখ্যায় স্বল্প নয়, আকারেও ক্ষুদ্র, এবং আন্তরিক বিষয়েও খুব বেশি উৎসাহজনক নয়। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড প্রধানত—বলতে গেলে সমগ্রত—প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা পত্রাবলীর সংগ্রহ—সংগ্রহ না-ব'লে সংকলন বলা উচিত, কেননা ইন্দিরা দেবীকে লেখা অনেকগুলি চিঠি বহু পূর্বেই ছিন্নপত্রে প্রকাশিত হয়, এবং সেই সময়কার আরো কিছু চিঠি আপাতত বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, প্রকাশক জানিয়েছেন সেগুলিও ছিন্নপত্রের পরবর্তী সংস্করণে গ্রথিত হবে। এ-বইয়ে আছে বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখা উত্তর-রবীন্দ্রের পত্রাবলী (১৯১৩—১৯৪১), আর জামাতা-বন্ধুকে লেখা চিঠি ১৮৯০-এ আরম্ভ হ'য়ে শেষ হয়েছে ১৩৪৭-এ অর্থাৎ ১৯৪০-এ। দু'জনকে লেখা মোট পত্রসংখ্যা ২১৮। এঁরা দু'জনেও আত্মীয়, নিকট আত্মীয়, কিন্তু পরিবারভুক্ত নন, এবং আপন যোগ্যতায় দু'জনেই আত্মীয়তার গণ্ডি ছাড়িয়ে মর্যাদা পেয়েছিলেন বন্ধুর, সহকর্মীর, সমধর্মীর—এক হিশেবে সেটা আত্মীয়তার চাইতে বড়ো, কিংবা সেটাই সত্যকার আত্মীয়তা। এ-চিঠিগুলিতে তাই ঘরোয়া সুর ঠিক লাগেনি, অথচ অন্তরঙ্গতা আছে, ব্যক্তিত্বতার স্পর্শ আছে, এমন নয় যে খামের উপর যে-কোনো লোকের নাম লিখে দিলে ঠিকানা ভুল হ'তো না। সাহিত্যের কথা স্বভাবতই খুব বেশি, কবির সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিঠি এ-খণ্ডে পাওয়া যাবে, তার উপর ব্রাহ্মসমাজ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও এমন কয়েকটি চিঠি আছে,

যা গভীরতম দ্যোতনাময়। সবুজপত্রের সময়কার চিঠিগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান; এ-কথা স্পষ্ট হ'লো যে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের শুধু যে প্রধান লেখক ছিলেন, তা নয়, ঐ পত্রিকার পরিচালনাতেও তাঁর সক্রিয়তা ছিলো অক্লান্ত।

পড়তে-পড়তে মনে হ'লো এই চিঠিগুলি টীকাবহুল হ'লে ভালো হ'তো। উল্লেখের অভাবে অনেক ঠাট্টা মাঠে মারা গেছে, এবং কোনো-কোনো মন্তব্য কী উপলক্ষ্যে কাকে লক্ষ্য ক'রে বলা, সে-বিষয়ে কৌতূহল পাঠকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সংগত। এইরকম কয়েকটি বাক্য চয়ন ক'রে দিই:

(১) 'তপতীর বীজ মরবার পূর্ব্বেই দাবী আসছে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্য। আমার বিক্রমের আমলের প্রেয়সী এইখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবছি আর এক মূর্তিতে তাঁরই সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে রাখতে দোষ কী।'

[ই. দেবীকে—নং ২৯]

(২) 'তোর অন্তঃশীলার বিচার লেখাটি প'ড়ে খুব ভালো লাগল।··· এই সংখ্যার চিত্রালিতেই কোনো তত্ত্বজ্ঞানী কোনো নভেলের যে সমালোচনা করেছেন, সেই লেখার আবিলতার সঙ্গে তোর রচনার দীপ্তির তুলনা করলে সেই পণ্ডিতের প্রতি কৃপা জেগে ওঠে মনে।'

[ই. দেবীকে—নং ৬২]

অন্তঃশীলা কি ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস? চিত্রালি নামে কোনো পত্রিকা কি কখনো ছিলো? 'পণ্ডিত'টি কে, এবং তাঁর সমালোচিত উপন্যাসই বা কী?

(৩) 'তোমার সঙ্গে যোগিনীর মিটমাট হ'য়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য্য বলতে হবে।' (প্র. চৌ.-কে, নং ২) কে এই যোগিনী, এবং ব্যাপারটা কী?

(৪) 'Bashkirtsiff-এর Journal আমিও পড়ছি—' [প্র. চৌ.কে, নং ৬] বইখানার একটু পরিচয় প্রয়োজন।

(৫) 'আজ প্রবোধের চিঠিতে একটা খবর পেলুম তার কোন অর্থ বুঝতে পারলুম না—সে লিখেছে "তোমাকে গালি দিবার জন্য রাজসাহীতে যে ছাত্রসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহা এখানে Indian Daily News পত্রে পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।" ব্যাপারটা কি বল দেখি?' [প্র. চৌ.কে নং ১১] সত্যি, ব্যাপারটা কী?

(৬) 'বক্তৃতার খবরটা পেয়েচ দেখছি।' [প্র. চৌ.কে, নং ১৩] কোন বক্তৃতা ?

(৭) 'কালিঘাটে হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত "গোবর গণেশের গবেষণা" বলে একখানা বই পাঠিয়েছেন—আমার ত পড়ে ভাল লাগল।' [প্র. চৌ.কে নং ৩৯] এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যথোচিত বিবরণ অপরিহার্য বললেও দোষ হয় না।

(৮) প্র. চৌ.কে লেখা ৪৩ নং চিঠিতে জানা গেলো যে তাঁর অনুরোধ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের দু' একটি কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করেছিলেন। এ-তর্জমা কেন করা হয়েছিলো, কোথাও প্রকাশিত হয়েছিলো কি ?

(৯) 'যদি প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর কিছু থাকে [সবুজপত্রে] দিয়ে দিয়ো।' [প্র. চৌ.কে, নং ৪৭] কে ?

(১০) 'আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখতে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখার উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজপত্রে লেখাও আমার আর চলচে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে।' [প্র. চৌ.কে, নং ৬৮] এই অংশ নিরতিশয় রহস্যময়: শরৎচন্দ্র নিজে কি কখনো কোনো কাগজ বের করেছিলেন ?

(১১) 'গল্পটি কিন্তু তুমি আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ—ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েছে। [প্র. চৌ.কে, সংখ্যা ৭০] কোন গল্প ? 'ছোট গল্প' ?

(১২) 'তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ—ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত।' [প্র. চৌ.কে, সংখ্যা ৭২] কোন গল্প ?

(১৩) '—বিবি আমাকে বাসুদেব ভট্টাচার্যের যে বই পাঠিয়েছে, সেটা পড়বার মত অবকাশ যমের দেউরিতে গিয়েও মিলবে না। ও লোকটা বুজরুগ—ওর লেখা কখনো খাঁটি হতেই পারে না।' [প্র. চৌ.কে, সংখ্যা ৭৫] এই বাসুদেব ভট্টাচার্য কে, এবং তিনি কী বই লিখেছিলেন, তা না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি পাবে না এমন পাঠক নিশ্চয়ই বিরল নয়।

আরো অনেক ছোটোখাটো কথা আছে, একটু টীকা থাকলেই যা আলোকিত হ'য়ে ওঠে। বিস্তৃত বিবরণ জানবার ইচ্ছা শুধুই অলস কৌতূহলপ্রসূত নয়;

খবরগুলি তুচ্ছ শুধু আপাতদৃষ্টিতে; গভীরভাবে দেখতে গেলে, এই রকম ছোটো-ছোটো টুকরো খবরের সাহায্যেই ইতিহাসের কলেবর সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। অপর পক্ষের অবগত ব'লে চিঠিতে যা-কিছু উহ্য আছে, সেই সবই সম্পাদকীয় টীকার সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত, নয়তো চিঠিগুলিতে ফাঁক থেকে যায় অনেক। যে-সব চিঠি নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, কিংবা বিশুদ্ধ প্রবন্ধও নয়, সেগুলি রীতিমতো সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন, পাশ্চাত্য অর্থে সম্পাদিত, বিশ্ববিদ্যালয়িক অর্থে। গোড়াতে প্রমথ চৌধুরীর একটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধ, এবং পরিশেষে যথাযথ টীকা থাকলে ইতিহাসের দিক থেকে এ-বইখানা অনেক বেশি মূল্যবান হ'তো, চিঠিগুলির আন্তরিক ও সাহিত্যিক সম্পদের সঙ্গে সে হ'তো মণিকাঞ্চন সংযোগ।

বু. ব.

কাব্য-মালঞ্চ : আব্দুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত।

নূর লাইব্রেরী ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা;

পৃ ৫২ ।৶০+২০৮, মূল্য পাঁচ টাকা।

মলাট দেখেই মনে হবে, একখানি কবিতা-সংগ্রহ, পাতা ওল্টালে বোঝা যাবে অনুমান সত্য; আরেকটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সবগুলি কবিতার লেখকই মুসলমান, এবং প্রথম ধাক্কায় আপনি আশ্চর্য হবেন এ-কথা ভেবে যে একটা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনে এতগুলো ভালো কবিতাই পাওয়া গেল যা দিয়ে একখানা দু'শো পাতার কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করা সম্ভব হলো ?

কিন্তু এত বড় সুখবর এ-বই সত্যি নয়। এ-সংগ্রহে যথেচ্ছ আহরণের প্রশ্রয় নেই; বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে যে-সব বাঙালী মুসলমান কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের লেখার একটি মোটামুটি সংকলন। নির্বাচনের অবকাশ তাই সামান্য এবং বইখানা ঐতিহাসিকের কাছে ঔৎসুক্যকর হ'লেও কাব্যগৌরবের অধিকারী হ'তে পারেনি। বলা বাহুল্য, মুসলমান কবি ব'লে একটা বিশিষ্ট কবি-পরিচয় স্বীকৃত হ'তে পারে না, কবিতা হিন্দুই লিখুন আর মুসলমানই লিখুন, পুরুষই লিখুন আর মহিলাই লিখুন, বিচারটা বিদগ্ধমহলে একই আদর্শে হবে। নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্যে কোনো হেড-এগজামিনারের হাতে grace-এর বন্দোবস্ত নেই, তেমন আশা করাও অন্যায়। নির্বাচন নিতান্তই যৌথ, আর দুঃখের বিষয় সীট রিজার্ভেশনও চলে না।

এক হিসেবে তাই—এবং সেটাই অবশ্য আসল হিসেব—এ-বই অসার্থক। তা-ও বুঝতাম, যা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি, যদি এই বইয়ের উদ্দেশ্য হ'তো, ভালো কবিদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান, তাঁদের রচনা একত্র ক'রে কাব্যামোদীকে উপহার দেওয়া। সম্প্রদায়ের দিক থেকে সে-ধরনের একখানা সংকলন মুসলমানদের গৌরবের বস্তু হ'তো, এবং সাহিত্যিকের সমাদরণীয়। কিন্তু সে-রকম বিচার উপস্থিত গ্রন্থে একেবারেই অনুপস্থিত; কবিতা-নামের অযোগ্য বহু রচনা এই সংগ্রহে অবলীলাক্রমে স্থান পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের একটা বৈশিষ্ট্য যদি স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় (যদিও সে-বৈশিষ্ট অদ্যাবধি অস্ফুট), তবু কোন কাব্যরসিক মুসলমান চাইবেন, সেই প্রতিভার প্রচার ও পরিচয়ের জন্যে সংকলিত হয় 'আদর্শ বাঙালী' (১৭৭ পৃ) 'ঈদ' (১৫৯-৬০ পৃ) অথবা 'আসা-যাওয়া'-র (১৬৩ পৃ) মত রচনা ?

পুতুল-পারা কান্তা সাথে
সুখে ব'সে নিরালাতে
প্রাণ ভ'রে তার চুমু দান
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥

এই বীভৎসতাও কি ছাপার অক্ষরে সহ্য করতে হবে ?

যে-সব কবির রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশেষ নেই। আশা করা যেতে পারে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ রচনাই সংগৃহীত হয়েছে। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথা বলা চলে না। ইচ্ছে করলেই তাঁর কয়েকটি ভালো কবিতা বাছাই করা যেতো। সন্দেহ হয়, মুসলমান কবি নামের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্যে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্‌' 'ইসলামী গান' এবং 'ঈদের চাঁদ'কে স্থান দিতে হয়েছে। নজরুল ইসলাম কি এর চাইতে ভালো কবিতা লেখেন নি? 'আবদুল কাদিরের বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত 'বন্ধন' এ-বইয়ে না ছাপানোই উচিত ছিল। কবিতা হিসেবে নজরুল ইসলামের মানরক্ষা ওতে হয় না।

বইখানির প্রথম একশো পাতায় কবিতা নেই। শেষার্ধে কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'অযোধ্যা' 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'স্বপ্নাগতা', 'সাত সাগরের মাঝি', 'হে ভারত' সুখপাঠ্য রচনা। অন্যতম সম্পাদক রেজাউল করীম বলেছেন:

সঙ্কলিত কবিতা গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে "শিল্পের জন্য শিল্প" এই নীতিকে মুসলমান কবিগণ বহুলাংশে

মানিয়া চলিয়াছেন। এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বোধ ও কাব্য-চেতনা তাঁহাদিগকে অহরহ প্রেরণা দিয়াছে। ··· এই সঙ্কলনে এমন সব কবিতার সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহা আপনার আনন্দে, আপনার বেগে আপনি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও কৃত্রিমতা নাই, কষ্টকল্পনা নাই, সহজ চলার ছন্দে কোনো বাধা নাই। কবিতাগুলি যেন একটা স্বাভাবিক আবেগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। (পৃঃ ১৵০)

এই উক্তির সমর্থক কোনো কবিতা এই সংকলনে নেই। সত্যি বলতে কি, ভূমিকায় এত বড় একটা অত্যুক্তি না করলেই ভালো হ'তো। আবদুল কাদির তাঁর দীর্ঘতর ভূমিকার শেষ দিকে স্বীকার করেছেন:

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌ হইতে ফররুখ আহমদ পর্যন্ত আমাদের যে কাব্য সাহিত্য, তাহাতে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেশী নাই। (পৃঃ ৫০)

সত্য কথা। আর সে-কথাটি বইখানা ছাপা হ'য়ে যাবার পর ভূমিকা লিখতে ব'সে একেবারে শেষ করবার উপক্রমে মনে না হ'য়ে আগে মনে হলেই কি ভালো হ'তো না ?

আর-একটা প্রশ্ন এই, কবিদের নামগুলিতে ইংরাজি হরফ যোজনা করে' এমন বিকৃত করা হয়েছে কেন? এ. জেড্‌. নূর আহ্‌মদ কিম্বা মিসেস্‌ আর. এস্‌. হোসেন অত্যন্ত শ্রুতিকটু, চোখেও বিশ্রী লাগে। এঁদের পুরো নাম দিলেই শোভন হ'তো।

পরিমল রায়

নতুন দিন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্বাশা, আট আনা।
দিগন্ত, মৃণালকান্তি দাশ। দুই টাকা।
একটি ফুলের গুচ্ছ, প্রজেশকুমার রায়। ছ আনা।

কবিতার কোনো বাঁধা বিষয় নেই। সকল কিছু নিয়েই কবিতা রচিত হ'তে পারে এবং সার্থক হতে পারে যদি কবির মন সত্যি তাতে সাড়া দেয়, আর তার প্রকাশ হয় সুন্দর। স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশের মুক্তিকামনা, গ্লানি, ব্যর্থতা, বেদনাবোধ সকল দেশেই কবিচিত্তে প্রেরণা দিয়েছে। কারো কণ্ঠে সেই বেদনার বাণী বজ্রের মতো বেজে উঠেছে; শ্রদ্ধার অঞ্জলি এনেছেন কেউ মুক্তিব্রতের ধ্বজাধারীদের স্মরণে।

পরাধীন জাতির পক্ষে এ-কথা, সত্যতর কেননা তার বেদনা অতি প্রত্যক্ষ বেদনা। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথে আমরা এই প্রেরণার পরিণতি দেখেছি। আধুনিক কবিরা সেই ঐতিহ্যকেই বহন ক'রে চলেছেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীপ্লাবী যুদ্ধ হয়ে গেল। প্রাচীন সমাজের ভিৎ উঠলো ট'লে। অধীন দেশের স্বাধিকারের স্বপ্ন স্বপ্নমাত্রই আর মনে হয় না। তারও রাতের গাছের ডালে ভোরের পাখী গান গায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের ক্ষুদ্র কবিতার বই 'নতুন দিন' তারই এক প্রীতিকর নমুনা। আগামী-কালের দিকে তাকিয়ে ১৯৪২-এর পরবর্তী ভারতবর্ষের জমিতে দাঁড়িয়ে শহিদ-বেদীতে একমুঠো স্মরণের ফুল।

একটু সময় দিও, হৃদয়ের খানিক সময়
তাদের সে ছায়ার উপর
ছায়া হয়ে গেছে যারা তোমাদের ছায়া দেবে ব'লে।

তাদের উদ্দেশ্যে কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি 'নতুন দিন'। কী ক'রে সেই ভোর আসবে তা অবশ্য কবি জানেন না। হয়তো জানতে চানও না। যদিও শ্রমিকদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে। আর বিশ্বাস আছে যে

এ চোখ আবারও হবে কুমারীর চোখের আকাশ
স্বপ্নের পাখীর ঝাঁকে
সে আকাশে উড়ে যাবে সহস্র পাখায়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ইঙ্গিতগাঢ় ব্যঞ্জনাময় কবি। জনপ্রিয় কবিতার হাল্কা উচ্ছ্বাসের সুর তাই এ-সকল কবিতায় লাগেনি। স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার এই দীর্ঘায়ত সাধনার পশ্চাতে বেদনার অশ্রুশোণিতসিক্ত যে-ভূমিকা, তাকেই তাঁর কবি মন স্পর্শ করেছে। আপাতসরল ভাষাব্যবহারের যে-মিস্টিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা পরিচিত তাও এখানে মুদ্রাদোষে পতিত হয়নি। বারে-বারেই তিনি আকাশ, সমুদ্র, ছায়া, রৌদ্র, সূর্য্য, নদী, পৌষফাগুনের বন প্রভৃতি পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাহায্যে যে-ব্যঞ্জনা দিয়েছেন পাঠককে তা স্পর্শ করবে। অল্প কথার আঁচড়ে সুন্দর অনেক রেখাচিত্র ফুটেছে। সভ্যতার ভিৎ গড়ে যে-শ্রমিক তার কথা বলেছেন—

পৌষের মাটি হয়ে পৃথিবীর হাতে বার বার
দিয়েছে ফাল্গুন উপহার।
আকীর্ণ তোমার হাড়ে সময়ের সমুদ্রের তীরে
স্তূপাকার শুভ্র স্মৃতি সমুদ্রের পাখীর মতন।

সুন্দর দুটি ছবি। যুদ্ধোত্তর কাব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে 'নতুন দিন' ক্ষুদ্র হ'লেও উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মৃণালকান্তি দাশ এবং প্রজেশকুমার রায় দুজনেই বৃহত্তর বাংলার সীমান্ত শ্রীহট্টের কবি। শ্রীহট্টের একাধিক বাঙালী কবির সঙ্গে আধুনিক কাব্যপাঠক নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। এঁদের সত্যি কোনো সাহিত্যিক উপদল শ্রীহট্টে আছে কিনা জানি না। কিন্তু প্রথমাবধিই এঁরা এমন একটি শান্তমধুর সুর কাব্যে বাজিয়েছেন যা বিশেষ ক'রে তাঁদেরই। এঁরা সকলেই অল্পাধিক প্রকৃতির কবি। এবং সে প্রকৃতি—কী বলব ?—আসামের বললে ঠিক হয় না—দিগন্ত-জোড়া ছুটির প্রকৃতি, যাকে কবির মনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যের বিচিত্র অর্কেস্ট্রা থেকে সে-সুর চিনে নেওয়া যায়।

লেবেল দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করাটা কিছু নয়। কিন্তু 'দিগন্ত' পড়ে মনে হোল মৃণালকান্তিবাবু বিশেষভাবেই শান্ত প্রকৃতির কবি, ছুটির কবি। 'বিবর্ণ'—যে-কবিতা দিয়ে তিনি এ-গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন—এবং ঐ কবিতার সুর আর যে-যে কবিতায় আছে, আমার একটুও ভালো লাগেনি। আধুনিক সমাজের জীর্ণতায় সংক্রামক নিরাশা এবং অতঃপর কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধ্রুবতায় বিশ্বাস—আমার মনে হোল মৃণালবাবুর মতো নিভৃত-কণ্ঠ কবির লেখায় এ-সুর স্বাভাবিক নয়। কাব্যপাঠের উপভোগের তরফ থেকেই বলছি। সত্যি কথা বলতে কী, বিবর্ণ জীবনের কবি তিনি নন। চোখ তাঁর ছবি দেখার চোখ এবং সে-ছবি শান্ত, সুন্দর, বিচিত্র রঙে রঙিন। স্তিমিত ছায়ায় শাদা হাঁস, শিশিরের শব্দ, ভিজে ঘাস, জলসিঁড়ি, শাদা শরবন—এই পৃথিবীর কবি মৃণালকান্তি দাশ। সেখানে চিনিচাঁপা ফুলে নীল মৌমাছি ফেরে, মিহি হাওয়ায় মাতে দূর মাঠের তালবন, কাঁচাসোনা-রোদে ধানমাঠ ছেয়ে যায়, ডোবায় গা ডুবিয়ে থাকে মহিষ।—

খোলা জানালায় একা-একা আছি চেয়ে :
দূর হ'তে দেয় ছুটির আকাশ খানি
নিরালা দুপুরে নির্জ্জন হাতছানি।

বনছায়া ঘননীল স্তব্ধ শালবন,
—আঁকাবাঁকা রাঙামাটি পথ,
একটানা ঝিঁঝিঁদের সুর,
পিপুলের শান্ত ছায়া,
ঝিমানো দুপুর।

এই হচ্ছে মৃণালকান্তিবাবুর কাব্যের স্বাভাবিক সুর। তাঁর প্রকৃতির কবিতাগুলি আমার সত্যি ভালো লাগলো।

একটু আপত্তি আছে। ঐ দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে কবিতার বই আরম্ভ না-করলেই কি ভালো হোতো না? বিশেষত 'যকৃতের বিকৃতি,' যুদ্ধের বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতা প্রভৃতি সংবাদ যেখানে স্থান পেয়েছে? 'খোলে দাও রহস্যের দ্বার', নিশ্চয়ই ছাপার ভুল?

প্রজেশকুমার রায়ের 'একটি ফুলের গুচ্ছ' কোনো বিবাহের প্রীতি-উপহার উপলক্ষ্যে রচিত একগুচ্ছ ক্ষুদ্র কবিতা। শুভদৃষ্টি, আংটি বদল, বাসর, প্রথমরাত্রি ইত্যাদি বিবাহোত্তর ঘটনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তিনি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেছেন। সাধারণ বিবাহের প্রীতি-উপহারে যে-ধরনের কানাখোঁড়া পদ্য অভ্যাগতদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় তাতে অতিথির কাব্যরুচির প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পাও থাকে না। প্রজেশবাবুর হাতে সেই জিনিষই প্রীতিকর রূপ নিয়েছে। লিরিকের স্বচ্ছন্দ সুরটি সকল কবিতায় লাগেনি, কিন্তু একাধিক কবিতা আছে যা কাব্য-পাঠকের ভালোই লাগবে।

এই ছোটো কবিতা সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে হয়। ছোটো হ'লেই গল্প যেমন ছোটোগল্প হয় না ক্ষুদ্র কবিতাও তাই। ক্ষুদ্র কবিতার চেহারাও আলাদা, স্বাদও। পরিধি ক্ষুদ্র বলেই কবির দায়িত্ব আরো বেশী। ছন্দে ভাষায় সুরে মিলে চার পংক্তির একটি কবিতাকণা চিরস্মরণীয় হ'তে পারে। আবার সামান্য ত্রুটির জন্য একেবারে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি। এ-বইয়ের অনেক কবিতাতেই ছন্দে ভাষায় এমন একটা ঢিলেঢোলা ভাব আছে যা ক্ষতিকর হয়েছে। মিনিএচর ছবি-আঁকিয়েদের যে-দক্ষতা, ক্ষুদ্র কবিতায় সেই দক্ষতার প্রয়োজন, সেই অব্যর্থ তুলির টান।

Modern Tendencies in English Literature,
Dr. Amiya Chakravarty.

কোন পথে চলেছে ইংরেজি কাব্যের ধারা?—চসার ল্যাংল্যাণ্ড প্রমুখ পূর্ব রেনেসাঁর কবিগুরুদের সঙ্গে আমাদের পাঠকসাধারণের যাদের পরিচয় নেই তাদের কাছেও শেক্সপিয়র, মিলটন, ডান, ড্রাইডেনএর প্রতিভাপুষ্ট ইংরেজি কাব্যের উদার বিস্তৃত ধারা দীর্ঘকালের পটভূমিতে আনন্দিত মনে অনুসরণ করা দুরূহ নয়।

নদীর মতোই কাব্যের স্রোতও কখনো দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন এক তালে এক গতিতে বয় না। তারও প্রতি বাঁকে বিস্ময় আর চমক। এবং মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে শেক্সপিয়র থেকে প্রাক-আধুনিক কবিকুল পর্যন্ত এই যে বিস্তৃত কালসীমা এরও মধ্যে সাহিত্যরীতির এবং সাহিত্যিক মূল্যের যুগান্তকারী পরিবর্তন একাধিকবার ঘটেছে। তাহ'লেও ইংরেজি কাব্যপ্রেমিক প্রাক-আধুনিক কিম্বা প্রাক-বিংশ-শতকী কবিদের কাব্য মোটামুটিভাবে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা নিয়েই অনুসরণ করতে পারেন।

প্রথম আঘাত পেলেন তাঁরা এই আধুনিক কবির দরোজায়। একজন সুযোগ্য পথপ্রদর্শক না পেলে, কিম্বা নিজেই বলিষ্ঠ পথিকৃৎ না হ'লে আধুনিক কবির অপরিচিত দরোজার কাঠে মাথা ঠুকে যাবেই। আধুনিক কবিশিরোমণি এলিঅট এবং আধুনিকতর স্পেণ্ডর, ডে লুইস, অডেনের কাব্যপ্রবেশের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ক'রে দিয়ে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সাম্প্রতিক-কাব্য-অনুসন্ধিৎসুর কৃতজ্ঞতা লাভ করলেন।

কবি সমাজ-সচেতন হবেন—এই একটা দ্ব্যর্থক দাবী আজকাল অনেক মহলেই খুব পরিচিত। সমাজ-সচেতন বলতে আমরা কী বুঝবো? কবি কি তবে সমাজ সংস্কারের স্টীম রোলারের ড্রাইভার? অথচ যেহেতু কবিও সামাজিক জীব, সেই সমাজের সুখে দুঃখে জড়িয়ে নিয়ে তাঁরও জীবন, অতএব নিশ্চয়ই উদাসীন নৈরাজ্যিক স্বপ্নে মগ্ন থাকতে তিনি পারেন না। য়েট্‌স্‌এর কাব্য-সাধনার উপর একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এ-প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। উত্তরজীবনের য়েট্‌স্ কি সমাজ-সচেতন কবি নন? অথচ তিনি কি স্বপ্নবিরহিত বাস্তব-বিলাসী কবি ছিলেন তাঁর জীবনের কোনো কালে?

কবি চিরকালই স্বপ্নদর্শী। তবে সে-স্বপ্ন মনোলীন মানস সরোবরের অলৌকিক নীলপদ্মের স্বপ্ন নয়। তা পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন। বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির অন্তর্লীন যে প্রাণের ঐক্য, কবির ধ্যানে তার সহজ উপলব্ধি হয়। ইতিমধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের এই একই আবিষ্কার যুগান্তের সূচনা করলো। মহাযুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়ে গেল সমাজের ভিৎকে আগাগোড়া। ছন্দোময় পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন যে-সব কবির চোখে অতএব তাঁরা বিভ্রান্ত হলেন। তাই এলিঅটের সুরে গভীর নৈরাজ্যিক হতাশা। এবং এই একই কারণে অডেন, ডে লুইস্, স্পেণ্ডরের কণ্ঠে কখনো সমাজ-সমালোচনা, কখনো সামাজিক হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার বিধান।

অতএব সত্যসুন্দরের যে-সাধনা প্রাক-আধুনিক কবির কাব্যে আমাদের অন্তরঙ্গ লাগতো সেই একই সাধনার অন্তর্লীন ধারা আধুনিক অসমতল সমাজের কাব্যেও বয়ে চলেছে। তবে আধুনিক সমাজের কথা স্মরণ রাখলে এঁদের কাব্য যে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠ হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী নিজে আধুনিক সার্থক কবি। এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁর গভীর অধ্যয়নের কথা আমরা সকলেই জানি। এদিকে পথনির্দেশের তাই তাঁর যোগ্য অধিকার। তাঁর এই নাতিদীর্ঘ ইংরেজি কাব্যালোচনার পুস্তক, বিশেষত ভারতীয় ছাত্রমহলে, আদর পাবে সন্দেহ নেই।

নরেশ গুহ

রবীন্দ্রনাথের নূতন সংস্করণ

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন-ভিন্ন গ্রন্থেরও নূতন সংস্করণ বিশ্বভারতী কর্তৃক নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি শুধুই পুনর্মুদ্রণ নয়, প্রকৃত অর্থে সংস্করণ; পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত এবং গ্রন্থপরিচয় সংবলিত। বুদ্ধির সঙ্গে শ্রম, এবং শ্রমের সঙ্গে প্রেম সংযুক্ত হয়েছে এদের সম্পাদনায়, বিষয়ের বা ভাবের ঐক্য অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন গ্রন্থে রচনাগুলির নতুন ক'রে বিতরণ, পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মুদ্রিত পাঠের সংশোধন, সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার সংযোজন—বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এই সবগুলি বিষয়েই পূর্ণমাত্রায় অবহিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে সোনার তরীর একটি কবিতায় একটি ভীতিপ্রদ মুদ্রাকরপ্রমাদ বহু বৎসর ধ'রে প্রচলিত হ'য়ে আসছিলো, অথচ কারুরই চোখে পড়েনি, রবীন্দ্রনাথেরও না—

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি' জীর্ণ জরা,

এই পংক্তির প্রকৃত পাঠ যে

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরিজীর্ণ জরা,

এ-কথা সাম্প্রতিক রচনাবলী-সংস্করণে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। লিপিকার নতুন সংস্করণে একটি নতুন রচনা সংযোজিত হয়েছে ('কবিতা'র গত চৈত্র সংখ্যায় সেটি আমরা তুলে দিয়েছিলাম), এই সুন্দর রচনাটি এতকাল যে মাসিকপত্রের পাতায় চাপা প'ড়ে ছিলো এটাই আশ্চর্য। সম্প্রতি পাঁচখানা নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো : 'শিক্ষা,' (প্রথম খণ্ড)

'সাহিত্য,' 'উৎসর্গ,' 'প্রহাসিনী,' 'রক্ত-করবী'। 'শিক্ষা'র বর্তমান সংস্করণ বহুল পরিমাণে পরিবর্ধিত; বস্তুত, শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন ভ'রে যত প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই সবই এখানে একত্রিত হয়েছে, এর পরে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে কবিকর্তৃক শিক্ষার ব্যবহারিক আলোচনা-সমূহ। 'সাহিত্য'ও তিনটি নূতন প্রবন্ধে এবং গ্রন্থপরিচয়ে সম্পূর্ণতর। নতুন কবিতা স্থান পেয়েছে উৎসর্গে প্রহাসিনীতে, রক্তকরবীর গ্রন্থপরিচয়ে কবিরচিত ব্যাখ্যা গ্রথিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে সবগুলি বইয়ের ছাপা-কাগজ আশানুরূপ নয়, এবং দুর্দিন সৎকর্মের বাধা নয় ব'লে এমন আশা করতে দোষ নেই যে ভবিষ্যতের সংস্করণগুলি দৃশ্যত ও স্পর্শত আরো সুখকর হবে।

প্রাপ্ত

বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : নীহাররঞ্জন রায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী ॥০।
ন্যায়-দর্শন : সুখময় ভট্টাচার্য। " " বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী ॥০
আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অবসান : রমাপতি বসু। শ্রীহর্ষ, ছ' আনা।
চিরন্তন বিপ্লব রমাপতি বসু। শ্রীহর্ষ, ছ' আনা।

বিদেশী সাহিত্য

এডওআর্ড টমসন

মানুষের উপকার করতে বদ্ধপরিকর ব্রিটিশ মিশনারির মতো আর কেউ নয়; এ-জন্য অসীম দুঃখ বরণ করেছেন তাঁরা। ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত সকল ভূখণ্ডে, বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীতে, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসারে অনগ্রসর জাতিদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁদের দুর্বার প্রয়াস ইতিহাসের এক আশ্চর্য অধ্যায়। ত্যাগে ও বীরত্বে, মহত্ত্বে ও দুঃসাহসে তাঁদের সমকক্ষ যে-কোনো কালেই বিরল। তবু উপকৃত জাতিসমূহের কৃতজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করতে পারেননি, বিষুবরেখার প্রান্তবর্তী উত্তাপ সহ্য ক'রেও যাদের জন্য আপ্রাণ শ্রম করেছেন, তারা ফিরিয়ে দিয়েছে বিদ্রূপ, এমনকি বিদ্বেষ। তার কারণ মানুষের উপকার করা সহজ নয়। অধমেরই উপকারের প্রয়োজন, অথচ সে যে অধম এ-কথা যদি উপকারী ভুলতে না পারে, কিংবা তাকে বুঝতে দেয়, তাহ'লে কল্যাণকর্মের সম্ভাবনা উচ্ছিন্ন হয় সমূলে। পতিতের উন্নয়ন সাধন করতে হ'লে প্রথমেই চাই পতিতের সঙ্গে একাত্মবোধ, সেটা অত্যন্তই দুঃসাধ্য। খৃষ্টান মিশনারিরা সেটা পারেননি, যে-সভ্যতার তাঁরা প্রতিভূ তার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁদের ছিলো উগ্র সচেতনতা, উপকারের উদ্দেশ্যে অত্যাচার করতেও তাই তাঁদের বাধেনি—আর এই কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের ত্যাগ ও মহত্ত্ব, বীরত্ব ও দুঃসাহস।

অথচ একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তা-ই বা বলি কেমন ক'রে। আমাদের দেশের কথা যদি ভাবি, তাহ'লে মানতেই হয় যে মিশনারিরা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্মরণীয়তার মায়ালোকে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন। বাংলা গদ্যের সূত্রধর শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কথা কি ভোলবার! আধুনিক কালে এণ্ড্রুজ ভারতীয় মহাপুরুষেরই মর্যাদা পেলেন, তিনিও

তো মিশনারি। আরো-একজন ইংরেজ পাদ্রি তাঁর সৌজন্যে, নম্রতায়, তাঁর সংস্কৃতিবান চিত্তের সম্পদে আমাদের দেশের সঙ্গে তাঁর দেশের সম্বন্ধকে নিষ্কণ্টক করবার চেষ্টা করেছিলেন—তিনি এডওআর্ড টমসন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এডওআর্ড টমসনের নাম কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়া অনিবার্য। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ হ'য়ে প্রথমে তিনি এ-দেশে আসেন। রাজকীয় রক্তিমা তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেনি, কলুষিত করেনি তাঁর মানবিক মূল্যবোধ; তাই এ-দেশকে তিনি দেখতে, বুঝতে ও খানিকটা ভালোবাসতে শিখেছিলেন। বাংলা শিখেছিলেন ভালোই, এতদূর ভালো যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন মূলের উপর নির্ভর ক'রেই। যদিও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন মাঝে-মাঝে, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছদ্মনামে বিরুদ্ধ সমালোচনা লিখেছিলেন ("আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখাই সমালোচন!"), তবু সে-গ্রন্থ নিঃসংশয়ে মূল্যবান, কোনো-কোনো বিষয়ে রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে কাটিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি, তারপর অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে অবশিষ্ট জীবন অক্সফোর্ডেই কাটিয়েছিলেন। উত্তরজীবনে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থাপনের ইতিহাস ছিলো তাঁর প্রধান চিন্তনীয় ও আলোচ্য: এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের যে-স্বরূপ তিনি লোকচক্ষে প্রকাশিত করেছিলেন তা চিরাচরিত ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিরোধী এবং সত্যের সপক্ষে। নিরপেক্ষতা, সত্যের প্রতি আসক্তি, তথ্যের যাথার্থ্যনির্ণয়ের জন্য পরিশ্রম, সর্বোপরি স্বজাতির কলঙ্কপ্রকাশে ভয়শূন্যতা—ইতিহাসের আলোচনায় এই দুর্লভ গুণাবলীর পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন; ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের সত্যকার ইতিহাস রচনার বহুবিলম্বিত কাজটি তাঁর চেষ্টায় খানিকটা এগিয়ে রইলো।

এ ছাড়া কয়েকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন (ভারতীয় জীবন নিয়ে নয়—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !), এবং সমস্ত কাজের সঙ্গে-সঙ্গে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ। মাঝে-মাঝে বেড়াতে এসেছেন এ-দেশে, একবার একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হ'য়ে আসেন, এবং এ-দেশ থেকে সেই পত্রিকায় প্রেরিত তাঁর পত্রাবলী পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। সে-বইয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু সপ্রমাদ সংবাদ ছিলো। এই সময়েই তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি Oxford Book of Bengali Verse প্রকাশে রাজি করাতে; রাজি নাকি ওঁরা হয়েওছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে (না কি প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশকে ?) ভার দেয়া হয়েছিলো সম্পাদনার, একবার টমসনের একটি চিঠিতে জেনেছিলাম অক্সফোর্ডের কোন 'cloth-headed professor' ব্যাপারটার উপর চেপে ব'সে আছেন —সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। ১৯৪০এ রবীন্দ্রনাথকে যে অক্সফোর্ডের সম্মান-পদবী দেয়া হ'লো, তার পিছনেও টমসনের চেষ্টা ছিলো; রটেনস্টাইনের আত্মজীবনীতে পড়েছি যে টমসন একবার তাঁকে বলেছিলেন বা লিখেছিলেন, 'He (মানে, রবীন্দ্রনাথ) cares for that sort of thing—the Oxford or Cambridge variety'—প'ড়ে আহত হয়েছি, লজ্জিতও হয়েছি, এবং এ-কথা ভেবেই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছি যে টমসনের উদ্দেশ্য ছিলো ভালোই, আমরা পদানত ব'লে সবটাতেই খোঁচা লাগে।

১৯৩৬-এর ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের Times Literary Supplement-এর অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে টমসন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্য, সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন—বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুব সম্ভব এটিই তাঁর শেষ রচনা। প্রবন্ধটির নাম 'A Land Made for Poetry : New India's Hopes and Fears'। খানিকটা ঐতিহাসিক ভূমিকা, মধুসূদন,

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ—তার পরেই প্রবন্ধটি একেবারে সমসাময়িক প্রসঙ্গে চ'লে এসেছিলো। 'বীথিকা' (সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের সব-শেষের বই), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়', 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা—এ-গুলিই ছিলো আলোচ্য। তার খানিকটা অংশ অনুবাদ ক'রে দিয়ে এ-আলোচনা শেষ করি :

···সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা আগেই বলেছি। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে'র সম্পাদক তিনি। তাঁর কবিতা স্বদেশবাসীর কাছে নিরতিশয় দুর্বোধ, বিচারের ভার তাঁদের হাতেই থাক। ছন্দের দিক থেকে বহুল পরীক্ষা তিনি করেছেন—বহুপূর্বে মাইকেল-প্রবর্তিত প্রত্নপন্থী সনেট থেকে আরম্ভ ক'রে অসমপংক্তিক কবিতা—কিন্তু যে-কোনো ছন্দেই লিখুন, তাঁর রচনা সর্বদাই ঘনবিন্যস্ত, ভাষা সংস্কৃতানুগ ও ধ্বনিগম্ভীর। নির্বস্তুক চিন্তা তাঁর কবিতার বিষয়, উৎপ্রেক্ষা অসাধারণ মাত্রায় অল্প, আর তা যখন থাকে, আরো শক্তিশালী ক'রে তোলে সেই নির্জনতার মহিমাকে, যা তাঁর শেষ বইটিতে আদ্যোপান্ত পরিব্যাপ্ত। বইটির নাম 'অর্কেস্ট্রা'। এই ইংরেজি নামে বোধহয় এই ইঙ্গিতই প্রচ্ছন্ন আছে যে এমন জটিল সংগীতসম্পদের তিনি সন্ধানী, বাংলায় যা স্বভাবসিদ্ধ নয়।

'পরিচয়' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যসমালোচনা স্পষ্টত আধুনিক বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হ'লো। শ্রীযুক্ত দত্ত নিজে একজন নির্মল ও বলীয়ান গদ্যলেখক, তাঁর সম্পাদনায় 'পরিচয়' ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যে অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করেছে —রুচিতে ও বুদ্ধিতে, ব্যাপ্তিতে ও উদারতায়। * * * সম্প্রতি 'পরিচয়ে'র একটি জুড়ি-পত্রিকা হয়েছে, 'কবিতা,' শুধু কবিতার জন্য। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা সমান বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেরিয়েছে; যে-সব গতানুগতিক পদ্য এখনো লেখা হচ্ছে ভূরিপরিমাণে, যে-সব অসংখ্য বই 'ফুলহার', 'মুক্তামালা' বা (আরো সংক্ষেপে) শুধু 'মা' নাম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তা থেকে তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। প্রথম কবিতাটি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, উপন্যাসিক রূপে ইতিপূর্বেই তিনি সুপরিচিত। 'ইলেকট্রনের নৃত্য' বা জ্যামিতিক বিশ্বের সঙ্গে তিনি প্রতিতুলনা করছেন সেই সব বিচিত্র দৃশ্যের, সেই মায়ার, যার আকার নিয়ে বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়। আর-একটি কবিতা, তার লেখক শ্রীযুক্ত সমর সেন, শিরোনামে ধারণ করছে শ্রীযুক্ত এজরা পাউণ্ডের 'Amor Stands Upon You'. * এজরা

* চিহ্নিত দুটি অংশের পরে সমর সেনের দুটি কবিতার অনুবাদ ছিলো, তাও উদ্ধৃত ক'রে দেয়া হ'লো :

পাউণ্ড, টি. এস. এলিঅট, আরো একজনের নাম এই তরুণ হিন্দু কবিদের উপর ছায়া ফেলেছে—ডি. এইচ. লরেন্স। এঁদের প্রভাব যে সম্পূর্ণই মুক্তি এনেছে, তা কিন্তু নয়। 'পরিচয়'র কবিকুল অনুকরণের বহিরবয়বকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন—সেটা বিপজ্জনক—কৌশল ও মুদ্রাদোষ কুড়োচ্ছেন তাঁরা—শ্রীযুক্ত এলিঅটের মন্ত্রোচ্চারণের মতো পুনরুক্তির অভ্যাসে সংক্রমিত হচ্ছেন। কখনো-কখনো, নবীনের পাশে-পাশেই প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে পাই, যেমন শ্রীযুক্ত সেনের একটি কবিতায় লরেন্সের আবেগপ্রবল পার্থিব মন আর স্পর্ধিত রূপকরচনার সঙ্গে মিশেছে উষ্ণ তন্দ্রাতুর রাত্রির সৌগন্ধ্যসঞ্চয়। *

* * * *

বাংলাদেশ কবিতার দেশ। দ্বৈত তার সরলতা—একদিকে গঙ্গা, বিশাল, পুরাকীর্তিত, আর-একদিকে শালসমাচ্ছন্ন উচ্চভূমি। সীমাহীন দিগন্তের চেতনা বাঙালির মজ্জাগত, বাংলা কবিতায় 'দিগন্ত' কথাটি কখনোই দূরপরাহত নয়। দ্রুত সূর্যাস্তের জন্য প্রস্তুত যে-দেশের শ্বেত আকাশ, অবাধ সমতলের আর নদীপ্রান্তিক বালুবিস্তারের সেই লীলাভূমিতে 'দিগন্ত' কথাটি স্বতই যেন মনে জেগে ওঠে। ভোর চীৎকার ক'রে লাফ দিয়ে ওঠে আকাশে, আর সন্ধ্যা ঝাঁপ দিয়ে নামে অতলে। এরই লক্ষণসম্পন্ন রচনা শ্রীযুক্ত সেনের

স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে।

বাংলা ভাষাও কাব্যপ্রাণ। তার শব্দসম্পদ এখনো চ্যুত হয়নি আদিম জীবন থেকে, যে-জীবন তার সৃষ্টির উৎস—তার শব্দরাশি প্রায়ই প্রাকৃত ধ্বনির অনুকরণ এবং সর্বদাই গীতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময়। 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর আর-একজন কবি, বাংলার নব্য লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা কৃতী তাঁদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু এই শব্দের দ্যোতনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। তাঁর শব্দব্যবহারে কবিতায় যেন আলোর ঝলক লাগে, আর রঙের তীক্ষ্ণতা চমক দেয়।

(১) Where'er you go,
In stillness of some startled moment, know !
Your breath will catch, to hear, with sudden dread.,
Of Death the muffled undelaying tread !

Leaving my side, you hope to go—ah, where ?
Where'er you fare—
On Leda's shining breast, from Heaven's expanse,
Falls Jupiter's keen glance !

২) The Dark came like a beast of prey. The burning sky of the West reddened like an oleander blossom.

That darkness brought to the earth the scent of *ketaki* flowers, and to the eyes of some the languorous dreams of night. That darkness lit the trembling flame of desire in a girl's soft body.

দ্বিতীয় কবিতাটির প্রথম স্তবক মাত্র অনুবাদ করা হয়েছে।

'কবিতা'য় প্রকাশিত একটি কবিতাই এর উদাহরণ। চিল্কা হ্রদে সকালবেলায় আনন্দের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করতে গিয়ে সেই জলের আর আলোর আর ঢেউয়ের বিকম্পিত উজ্জলতাকেই যেন তিনি মূর্ত করেছেন এই ক'টি কথায়, 'চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।' কখনো-কখনো, তাঁর বন্ধুদের মতো, তিনিও অত্যন্ত বেশি বিদ্বত্তার বিপদ এড়াতে পারেন না, বিদ্বান বিশ্ববাসী হবার, বিশ্বের সাহিত্য ও উপকথা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জানবার বিপদ। 'কবিতা'র ৭ পৃষ্ঠায় এমন কয়েকটি পংক্তি আছে, যা প্রায় সেই স্বপ্ন-তন্দ্রিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হ'তে পারতো, যিনি মরেছেন অর্ধ-শতাব্দী আগে 'সন্ধ্যাসংগীত' 'প্রভাতসংগীত' লিখে; আর তারই পাশাপাশি পৃষ্ঠায় বাইবেলের সেই কাহিনীকে সুন্দর ক'রে গ্রহণ করা হয়েছে—ক্ষীয়মাণ বন্যার উপর রামধনুর আবির্ভাব। সেই সঙ্গে পাওয়া গেলো 'সবুজ সন্ধ্যাতারা'। ভারতীয় সূর্যাস্ত মনে আনবার চেষ্টা করলে পাঠক হয়তো ভাববেন যে সবুজ সন্ধ্যাতারা এসেছে আমাদের উত্তর-দেশের দীর্ঘায়ত সন্ধ্যা থেকে, কোলরিজের 'Dejection' ওড থেকে, যে-কবিতার প্রসঙ্গে বায়রন তাঁর প্রসিদ্ধ প্রশ্নটি করেছিলেন—'কেউ কি কখনো সবুজ আকাশ দেখেছে?'

বস্তুত, বর্তমান যুগ ও সর্বদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে এই কবিরা এতই সচেতন যে তাঁদের রচনায় প্রতিনিয়তই সন্ধানী, পান্থ ও পথিকৃৎ মনের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু এঁদের উদ্দেশে আমরা নিশ্চয়ই সে-কথা বলতে পারি, যে-কথা লোএল বলেছিলেন 'এনডিমিঅনে'র কীটসকে লক্ষ্য ক'রে: 'সুখী সেই তরুণ কবি, যাঁর রচনায় আছে উচ্ছলতার দোষ—সেই দোষই তাঁকে বাঁচাবে যদি সেই সঙ্গে থাকে রূপায়ণের ক্ষমতা। সে-ক্ষমতা থাকলে, আজ হোক, কাল হোক, উচ্ছলতার দোষ শোধিত হবেই।' এই কবিরা এমন-একটি আন্দোলনের প্রতিভূ, বাংলার চিন্তাকে যা নতুন রূপ দেবে, আর বাংলার ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয় চিন্তাকে।*

* টমসনের এই প্রবন্ধে তথ্যের ভুল কিছু ছিলো: 'পরিচয়' কখনোই দ্বৈমাসিক ছিলো না, বুদ্ধদেব বসুকে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীভুক্ত বললে ঠিক কথা বলা হয় না, এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতিও উপন্যাসে নয়, ছোটোগল্পে। তাছাড়া 'বন্যার উপরে ইন্দ্রধনু'তে বাইবেলের এবং 'সবুজ সন্ধ্যাতারা'য় কোলরিজের প্রভাব টমসনের কল্পনামাত্র, উভয়ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দৈবানুগত। কিন্তু এ-সব ত্রুটি মোটেও মারাত্মক নয়। মোটের উপর তাঁর আলোচনায় সৎবুদ্ধি, রসজ্ঞতা এবং বাংলার জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে। আজকাল শোনা যাচ্ছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা লেখবার উদ্যোগ করছেন অনেকেই—এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে কে কী বলেছেন তা তাঁরা জানতে চান—আশা করি এই উদ্ধৃতি তাঁদের পক্ষে ঔৎসুক্যকর হবে।

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি, এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র দ্বাদশ বর্ষ আগামী আশ্বিনে আরম্ভ হবে। দ্বাদশ বর্ষ থেকে 'কবিতা'র বার্ষিক মূল্য ধার্য হ'লো চার টাকা, বর্মায় চার টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা নগদ এক টাকা।

আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত হবে আশ্বিনের প্রথমেই। গ্রাহকদের অনুরোধ করছি আগামী **১৫ই ভাদ্রের মধ্যে** দ্বাদশ বর্ষের চাঁদা মনি-অর্ডরে পাঠিয়ে দিতে। যাঁরা গ্রাহক থাকতে আর ইচ্ছুক নন, তাঁরাও দয়া ক'রে ঐ তারিখের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা পাঠাবেন। মনি-অর্ডর কূপনে কিংবা নিষেধাজ্ঞায় নাম-ঠিকানার সঙ্গে গ্রাহক নম্বর অবশ্য উল্লেখ করবেন—এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

যাঁরা আগামী বর্ষে নূতন গ্রাহক হবেন, তাঁরা মনি-অর্ডর কূপনে "নূতন গ্রাহক" কথাটি উল্লেখ করবেন।

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যাঁদের চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে না, তাঁদের সকলকেই আশ্বিন সংখ্যা ভি. পি.তে পাঠানো হবে। ভি. পি. যাতে প্রত্যাখ্যাত না হয়, সে-বিষয়ে গ্রাহকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

ইতিমধ্যে কারো ঠিকানার বদল হ'লে দয়া ক'রে অবিলম্বে জানাবেন—তাতে গ্রাহকরা আমাদের সাহায্য করবেন, এবং নিজেদেরও।

এ-বছর 'কবিতা' নিয়মিত প্রকাশ করতে আমরা পারিনি, তা নিয়ে গ্রাহকরা অভিযোগ করেছেন। শুধু অন্নবস্ত্রেরই নয়, দেশে মুদ্রাযন্ত্রেরও ঘোর অনটন উপস্থিত, বিলম্বিত প্রকাশের সেটাই কারণ। বস্তুত, নিজেদের 'প্রেস যাঁদের নেই, এমন প্রায় কোনো পত্রিকাই আজকাল নির্দিষ্ট তারিখে বেরতে পারছে না। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে যদি পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটে, বর্তমান সময়ের নানারকম অসুবিধার মধ্যে সেটাও ধ'রে নিতে গ্রাহকদের অনুরোধ জানাই।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক

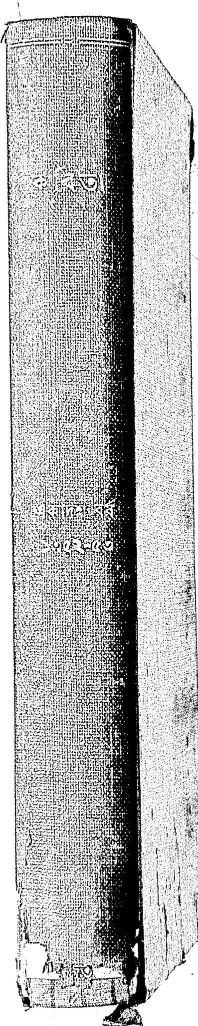
কবিতা
একাদশ বর্ষ
১৩৫২-৫৩